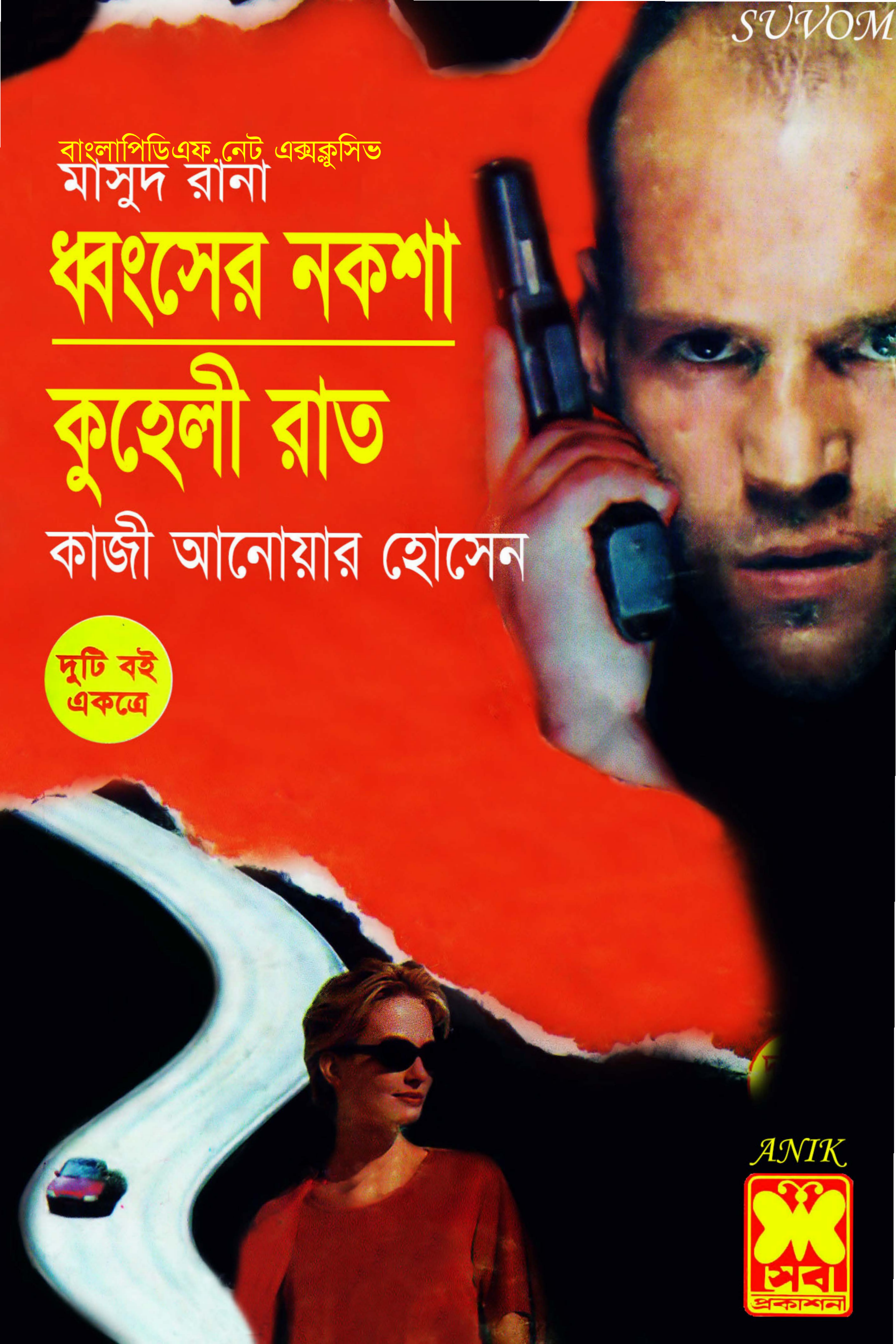

SUVOM
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
মাসুদ রানা
ধ্বংসের নকশা
কুহেলী রাত
কাজী আনোয়ার হোসেন
দুটি বই একত্রে
ANIK
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

ধ্বংসের নকশা

রজার সাইমুর ও আরগুয়েলোর মধ্যে এত ঘন ঘন মীটিঙ কেন? দুই লাইনের দুই তারকা কি ঘটাতে চায়? জানার জন্যে মাসুদ রানা উঁকি দিল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডির অন্দরমহলে—তারপর? জড়িয়ে পড়ল এক ভয়াবহ ঘটনাপ্রবাহে। বিজ্ঞানীর হুমকি শুনে থমকে গেল বিশ্ব—এখন একমাত্র রানাই পারে বাঁচাতে। কিন্তু ওকে বাঁচায় কে?

কুহেলী রাত

রক্ষকই ভক্ষক, এটা জানার পর মাসুদ রানার জন্যে ম্যাকাও হয়ে উঠল উত্তপ্ত তন্দুর। পালিয়ে কম্বোডিয়ার জলাভূমিতে চলে এল ও। শুরু থেকেই ঘরের শত্রু ডয়েস হয়ে উঠল মারাত্মক হুমকি। এখন রানা লিমাকে বাঁচাবে কিভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

ধ্বংসের নকশা

কুহেলি রাত

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7630-3
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ ২০০৪
প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল ০১১-৮৯৪০৫৩
জি পি ও বক্স ৮৫০
E-mail. sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭৮ ১৯০২০৩
Masud Rana
DHANGSHER NAKSHA
KUHELI RAAT
Two Thriller novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

তেতাল্লিশ টাকা



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩০/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪১/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৬৩/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-

RANA – 278, 299

ধ্বংসের নকশা
কুহেলী রাত

কাজী আনোয়ার হোসেন

১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)'	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
[illegible]-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-

২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৬৯-২৮৫	বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৪৭/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪২/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+[illegible]	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-

ধ্বংসের নকশা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

এক

হিথ্রো এয়ারপোর্ট, লন্ডন। ধীর, আত্মবিশ্বাসী পায়ে ওয়াশরুমে এসে ঢুকল এক লোক। হাতে একটা ছোট বাদামী সুটকেস। পাঁচ ফুট আট হবে সে, পেশীবহুল দেহ। পা ফেলে বেড়ালের মত নিঃশব্দে। হালকা নীল, অন্তর্ভেদী চোখ। সরু ভুরুজোড়া নাকের ওপরে প্রায় মিশে আছে পরস্পরের সাথে। খাড়া নাক। সোনালী চুল।

জিনস্ আর টি-শার্ট পরে আছে লোকটা, পায়ে সাদা মোজার সাথে নাইকি কেডস্। এয়ের লিঙ্গাসের একটু আগে ল্যান্ড করা ১৫৪ নম্বর ফ্লাইটের যাত্রী-এসেছে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন থেকে।

ভেতরে এসে একসার কিউবিকলের শেষ মাথার দিকে এগোল সে। ডাঙ্গারী পরা এক ক্লীনারকে পাশ কাটাল। ওয়াশরুমের টাইলড মেঝে পরিষ্কার করছে সে বড় এক স্কুইজী দিয়ে। আর কাউকে চোখে পড়ল না আগন্তুকের।

সোজা হেঁটে গিয়ে এক কিউবিকলে ঢুকল, ভেতর থেকে বোল্ট লাগিয়ে দিল। ল্যাভেটরি সীটের ওপর সুটকেসটা রেখে খুলল, একটা আয়না বের করল ভেতর থেকে, দরজায় কোট ঝোলানো হুকের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে ওতে নিজেকে দেখল। মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল আপনমনে।

তারপর দু'হাতের তর্জনী ও মধ্যমা সোজা রেখে সামান্য চাপ দিয়ে ভরে দিল চুলের রেখার নিচ দিয়ে, কপালের দু'পাশ থেকে। ঢুকে গেল আঙুল। আরেকটু চাপ পড়তে উঠে এল তার উইগ, বেরিয়ে পড়ল ক্রু-কাট দেয়া বাদামী রঙের আসল চুল। ওটা রেখে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে বাঁ ভুরুর বাইরের প্রান্ত ধরে আস্তে করে টান দিল। মৃদু চড়-চড় শব্দ করে উঠে এল নকল ভুরু। বেরিয়ে পড়ল তার বাদামী আসল ভুরু। চওড়া, আ-ছাঁটা।

এরপর সাদা আন্ডারশর্ট ছাড়া পরনের আর সব খুলে ফেলল সে। পেশাদারী দক্ষতার সাথে কাজ করছে এক মনে। এবং দ্রুত হাতে, ঘড়ির কাঁটার সাথে পাল্লা দিয়ে।

সুটকেস থেকে একটা ক্যানভাস করসেট বের করল লোকটা, কোমরে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল। দুটো কাজ হলো এতে–কোমর বেশ খানিকটা সরু হলো, এবং মনে হলো যেন উচ্চতাও সামান্য বাড়ল। পরেরটা অবশ্য একটু পরই প্রতিষ্ঠিত হলো। জিনস, টি-শার্ট ও মোজা সুটকেসে ভরে নতুন একজোড়া গাঢ় ধূসর মোজা পরল সে। চমৎকার ছাঁটের গ্রে লাইটওয়েট ট্রাউজার পরে পা গলিয়ে দিল কেডসের চাইতে দু'ইঞ্চি উঁচু সলিড হীলের একজোড়া কালো স্লিপ-অন শুর মধ্যে।

এরপর সাদা সিল্কের শার্ট পরল, গলায় বাঁধল পার্ল গ্রে টাই। নট্ ঠিকঠাক করে সুটকেস থেকে প্লাস্টিকের আয়তাকার একটা বক্স বের করল সে, তার ভেতর থেকে বের হলো একজোড়া জেট ব্ল্যাক কন্ট্যাক্ট লেন্স আর ফ্লুইড। মণির রঙ বদলে নকল দাড়ি-গোঁপ যত্নের সাথে জায়গামত জুড়ল সে। নকল হলেও আসল দাড়ি-গোঁপ দিয়েই তৈরি ওগুলো—ফ্লেক্সিবল্, অ্যাডহেসিভ লেটেক্স ফ্রেমের সাথে এমনই নিখুঁতভাবে জোড়া যে একেবারে কাছে থেকে দেখলেও বোঝার উপায় নেই আসল না নকল।

এবার দুই গালের মধ্যে ছোট দুই ফোম রাবার প্যাড গুঁজে দিল লোকটা। দেখতে আগের থেকে সামান্য ফোলা ফোলা হলো মুখ। ও দুটো না খোলা পর্যন্ত ড্রিঙ্ক করা বা খাওয়া, কোনটাই করতে পারবে না সে, তবে তাতে কিছু আসবে-যাবেও না। দু'চার ঘণ্টা না খেলে মানুষ মরে না। ট্রাউজারের ম্যাচিঙ জ্যাকেট বের করে পরল এবার লোকটা, আয়নার অচেনা প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসল।

বাকি কাজগুলো খুব দ্রুত সারল। এতক্ষণ সাথে যা যা ছিল, সব পাল্টে নগদ টাকা বোঝাই নতুন ওয়ালেট, পাসপোর্ট, ট্রাভেল ডকুমেন্টস, ট্রাভেলার্স চেক, রুমাল, খুচরো পয়সা এ-পকেটে ও-পকেটে ভরল। বাঁ হাতে পরল একটা গোল্ড ডিজিটাল ঘড়ি। এরপর একটা টাইট ফিটিং কভার বের করল সুটকেসের চেহারা পাল্টে ফেলার জন্যে। বালিশের গিলাফের মত জিনিসটা, পরাতেই বাদামী সুটকেস চকচকে কালো চেহারা পেল।

তারপর সর্বশেষ আইটেম—কেবল ডানহাতের জন্যে একটা স্কিন কালার পাস্টিক গ্লাভস, বের করে পরে নিল। জিনিসপত্র সব সুটকেসে ভরে বন্ধ করল ওটা। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিল কোথাও কিছু পড়ে থাকল কি না। মাথা ঝাঁকাল সন্তুষ্ট হয়ে—নেই।

সুটকেস বাঁ হাতে নিল লোকটা, ডান হাত ভরে দিল সিসটার্নের পিছনদিকে। আছে ওটা জায়গামতই। থাকবে যে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না, তাই এতক্ষণ চেক করে দেখার কথা একবারও ভাবেনি সে। অ্যাডহেসিভ টেপ দিয়ে আটকে রাখা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা বের করে কোটের সাইড পকেটে রাখল, ওটা একটা কোল্ট পাইথন—ছোট, সহজে বহনযোগ্য।

বেরিয়ে এল সে কিউবিকল্ থেকে। ক্লীনারের দিকে তাকাল—এই সময়ের মধ্যে অনেকেই এসেছে—বেরিয়ে গেছে, টের পেয়েছে সে, কিন্তু ওই লোক এখনও একই জায়গায়। ব্যাপারটা সে খেয়াল করল কি না বোঝা গেল না, পাশ কাটিয়ে আগের মতই দৃঢ়, আত্মবিশ্বাসী পায়ে বেরিয়ে গেল।

অমনি ব্যস্ত হয়ে উঠল 'ক্লীনার', স্কুইজী ফেলে বেরিয়ে এল ওয়াশরুম থেকে। লোকটাকে গজবিশেক সামনের এক বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে ছুটল। বাঁক ঘুরতে ডানেই একটা কাঁচঘেরা ফোন বুদ, ওর মধ্যে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে নাম্বার পাঞ্চ করতে শুরু করল—তার টার্গেট তখন আরেক বাঁক ঘুরে চলে যাচ্ছে ডিপারচার লাউঞ্জের দিকে।

ও প্রান্তে সাড়া পেয়ে কথা বলতে শুরু করল 'ক্লীনার', নজর নিচের দিকে।

কয়েকটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছে সে, এমনসময় বুদের দরজা খুলে গেল, ঘুরে তাকাল 'ক্লীনার', পরক্ষণে অন্তরাত্মা কেঁপে গেল চোখের সামনেই সাইলেন্সার পরানো একটা কোল্ট পাইথন দেখতে পেয়ে। সেই লোক! ফিরে এসেছে! হাসছে মিটিমিটি।

তার হাসি মুখ দেখতে দেখতে মারা গেল 'ক্লীনার'।

এর কয়েক মিনিট পর ট্যাক্সি নিয়ে কিংস ক্রস রেল স্টেশনের দিকে ছুটল লোকটা। অনেকটা পথ যেতে হবে।

দুই

বিসিআই, ঢাকা।

নিজের শানদার অফিসে বসে আছে মাসুদ রানা। চেহারা দেখে মনে হবে পেট কামড়াচ্ছে বুঝি। ত্যাড়া হয়ে আছে। মেজাজ খাট্টা। প্রায় দু'মাস হতে চলল হাতে কাজ নেই, বসে থেকে থেকে অভিযানপ্রিয় মনটা হাঁপিয়ে উঠেছে ওর। বন্ধ হয়ে আসছে দম অফিসের চার দেয়ালের মধ্যে আটকা থেকে। পালাই পালাই করছে।

সে পথও নেই। কাজ নেই বলে ছুটিতে যেতে চেয়েছিল, দেয়নি বুড়ো, প্রয়োজন হতে পারে বলে বসিয়ে রেখেছে। তাও কোনরকমে মানিয়ে নেয়া যেত যদি সহকর্মীরা কেউ থাকত, আর কিছু না হোক, আড্ডা তো মারা যেত। তারও উপায় নেই। ওরা সবাই দেশ-বিদেশে কাজে ব্যস্ত, একমাত্র ও বসে আছে অকাজে। কিচ্ছু করার নেই।

ছুটির দিনে বাসায় বসে বাগানের পরিচর্যা করা, এবং অফিসের দিনগুলোয় অফিসে বসে বসে খবরের কাগজ পড়া, এই করে কাটছে দিন। কিন্তু তাই বা কাঁহাতক! সব কিছুরই একটা সীমা থাকে। কাজ নেই, ছুটি দিতে অসুবিধে কি? এটাও নেই, ওটাও হবে না, এ কেমন কথা?

আজ আরেকবার ছুটির কথা বলে দেখতে হবে রাহাত খানকে, ভাবছে রানা, যা থাকে কপালে। এভাবে আর বসে থাকতে পারছে না ও। হাতের পত্রিকাটা বিরক্তির সাথে টেবিলের এক কোণে ছুঁড়ে মারল। এই হয়েছে আরেক যন্ত্রণা, প্রায় সবগুলো পত্রিকা আজকাল এমন নির্লজ্জের মত ক্ষমতাসীনদের সাথে গলা মেলাচ্ছে যে খবর পড়লে মনে হয় না ওসব খবর, মনে হয় সরকারী প্রেসনোট। প্রতিটি লাইনে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে পত্রিকাওয়ালারা, তাদের ধারণা, যা লেখা হয় তাই বিশ্বাস করে মানুষ। দেশ যে রসাতলে যাচ্ছে, কেউ টের পাচ্ছে না। সত্যি, সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ!

সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল ইন্টারকমে রাহাত খানের ভরাট গলা শুনে। 'রানা! ব্যস্ত?'

খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রশ্নটা শুনে মন দমে গেল। 'না, স্যার! হাতে কোন

কাজই নেই।'

'এসো তাহলে, কথা আছে।'

আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে পড়ে গেল ও, নীরব হয়ে যাওয়া ইন্টারকমের দিকে তাকিয়ে থাকল। অফিশিয়াল কিছু হলে তো এভাবে ডাকে না বুড়ো। আনঅফিশিয়াল কিছু? ওর বুদ্ধি-পরামর্শ ধার নিতে চাইছে? দেখা যাক, ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল। পুরু কার্পেট মোড়া করিডর ধরে বিসিআইয়ের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের ঝকঝকে পালিশ করা বন্ধ দরজার সামনে এসে থামল।

পেতলের চকচকে নবের দিকে তাকাতেই চিরকাল যেমন হয় এক ঝলক রক্ত ছল্‌কে উঠল বুকের মধ্যে। এই দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেই ব্যাপারটা ঘটে সব সময়। লম্বা করে দম নিয়ে নক্‌ করল ও।

'কাম ইন!' দরজার ওপরে ফিট করা স্পীকারে বৃদ্ধের আহ্বান সামান্য ধাতব শোনাল।

ঢুকে পড়ল রানা। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে পিঠ উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন রাহাত খান। দাঁত দিয়ে চুরুট কামড়ে ধরে আছেন হালকা করে, মুখ নিচু করে কিছু দেখছেন দু'হাতে টেবিলে ভর দিয়ে। কাছে গিয়ে দেখল রানা–দুটো ছবি, পাশাপাশি বিছিয়ে একবার এটায়, একবার ওটায় চোখ বুলাচ্ছেন। নজর তুলে ওকে বসতে বলে আরও কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি, তারপর হেলান দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

'হাতে কাজ নেই তাহলে...?'

'না, স্যার!' বৃদ্ধের প্রশ্ন পুরো শেষ হতে দিল না ও। 'কোন কাজ নেই। বসে বসে একেবারে...' থেমে গেল বৃদ্ধকে হাত তুলতে দেখে। 'এত কথা শুনতে চাইনি' ধরনের কিছু একটা বোঝাতে চাইলেন তিনি ইঙ্গিতে। সামনের একটা ছবি ঠেলে দিলেন ওর দিকে।

'একে চেনো কি না দেখো তো!'

এক পলক দেখেই মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আরগুয়েলো। প্যাট্রিক আরগুয়েলো। স্প্যানিশ, জন্ম মাদ্রিদে, '৬৮ সালে।'

'কি জানো এর সম্পর্কে?' প্রশংসা ফুটল বৃদ্ধের চেহারায়। যদিও রানা চোখ তোলামাত্র উবে গেল সে-ভাব।

'ইন্টারন্যাশনাল টেররিস্ট, স্যার,' বলে চলল ও। 'ইওরোপের বেশ কিছু দেশে ওয়ান্টেড। আমেরিকায় অফিশিয়ালী ওয়ান্টেড নয়, তবে ইওরোপের কয়েকটা দেশ অনুরোধ জানিয়ে রেখেছে, ওদেশে দেখা পেলেই যেন ধরা হয় একে। লোকটার পুরো নাম প্যাট্রিক অলিভিয়েরো আরগুয়েলো, বাপ স্প্যানিশ, মা ব্রিটিশ। প্রেস আর সাধারণ মানুষ তাকে আসল নামে জানে, তবে আমাদের মত সব সংস্থার কাছে সে "র‍্যাবিট" বলে পরিচিত।

'অনেকগুলো সন্ত্রাসী ঘটনার সঙ্গে জড়িত। প্রথম এর ওপর মানুষের নজর পড়ে '৭০ সালে, পর পর দুটো ব্রিটিশ বিমান হাইজ্যাক করে আরগুয়েলো। এক সময় রেড আর্মির সাথে কড়া দহরম-মহরম ছিল, তাদের হয়ে অতীতে বিশেষ

করে পশ্চিম জার্মানিতে অনেকগুলো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে লোকটা। বিলুপ্ত বাদের মেইনহফের সাথেও যোগাযোগ ছিল। সরাসরি কোন রাজনৈতিক অ্যাফিলিয়েশন নেই। বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে মাঝেমধ্যে অস্ত্রশস্ত্রও সাপ্লাই দেয় লোকটা।

'অসংখ্য খুনের অভিযোগ আছে এর বিরুদ্ধে। সবচেয়ে বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। বোমা তৈরি আর টেলি কমিউনিকে-শনস্ সিস্টেমের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে।'

'তার মানে নিজের ক্ষেত্রে মুন্সি, কি বলো?' নড়েচড়ে বসলেন রাহাত খান। 'যথেষ্ট রেপুটেড।'

'তা বলা যায়, স্যার।'

বাঁ কনুইয়ের কাছে রাখা বড় একটা বাদামী খাম খুললেন বৃদ্ধ, ভেতর থেকে আরগুয়েলোর আরও চারটে পোস্ট কার্ড সাইজ ছবি বের করলেন। 'এগুলো দেখো।'

দেখল মাসুদ রানা। প্রথমে মনে হলো চারটা চারজনের, কিন্তু একটু ভাল করে তাকাতে বুঝল একজনেরই। একেকটায় একেক ছদ্মবেশে আছে সে। প্রতিটি ছবির নিচে, ডানদিকে ছোট্ট একটা করে স্টিকার সাঁটা, বিভিন্ন তারিখ লেখা তাতে। এ বছরেরই। জানুয়ারি ৪ ও ২৩ তারিখ, ফেব্রুয়ারির ১২ ও ২৫ তারিখ লেখা আছে পরের চারটায়, প্রথমটায় লেখা গত মাসের একটা তারিখ–১৯ জুন। এটায় দাড়ি-গোঁপ লাগানো অবস্থায় আছে আরগুয়েলো।

নিখুঁত ছদ্মবেশ, ভাবল রানা। ও নিজেও ছদ্মবেশ ধারণে কম ওস্তাদ নয়, কোনটা সাধারণ, কোনটা অসাধারণ, বোঝে। বোঝে বলেই মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারল না। তারপর চোখে প্রশ্ন নিয়ে রাহাত খানের দিকে তাকাল।

'গত পাঁচ মাসে পাঁচবার দেখা গেছে একে হিথ্রো এয়ারপোর্টে,' বললেন তিনি। 'ডাবলিন হয়ে হিথ্রো এসেছে আরগুয়েলো। ছবি প্রত্যেকটা হিথ্রোয় তোলা।'

বিস্মিত হলো রানা। 'পাঁচ মাসে পাঁচবার দেখা গেছে অথচ অ্যারেস্ট করা হয়নি?'

'জানুয়ারিতে যখন প্রথমবার এর দেখা পেল সার্ভেইল্যান্স টীম, কেবল রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করার সময় পেয়েছিল, অপ্রস্তুত ছিল বলে ধরতে পারেনি। ফেরার পথে ধরবে বলে জাল পেতেছিল, তাও হলো না।'

'কেন?'

চুরুটে টান দিলেন রাহাত খান। 'হিথ্রো হয়ে যায়নি সে, কোন্ পথে গেছে জানা সম্ভব হয়নি।'

'তারপর?' ঝুঁকে বসল রানা।

'একই মাসে দ্বিতীয়বার যখন লন্ডন এল আরগুয়েলো, সার্ভেইল্যান্স টীম পিছু নিল। কিন্তু গ্ল্যাসগো পর্যন্ত গিয়ে আবার হারিয়ে ফেলে তাকে। তৃতীয়বার তার পিছু লাগার দায়িত্ব নিল ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস, জানতে পারল নর্থ-ওয়েস্ট

হাইল্যান্ডের মারকাল্ডি নামে এক গ্রামে গেছে লোকটা। শেষের দু'বার অনুসরণ করে শিওর হলো একই জায়গা তার গন্তব্য, প্রথম দু'দফা ওখানেই গিয়েছিল আরগুয়েলো। গিয়েছিল পর্যন্ত জানে বিএসএস, কিন্তু কোন পথে যে লোকটা বারবার ইংল্যান্ড ছেড়ে বেরিয়ে যায়, তা এখনও জানতে পারেনি।

'বিএসএসের দুই অফিসার লেগেছিল তার পিছনে, দু'জনকেই এবার খুন করেছে সে। একজনকে হিথ্রো এয়ারপোর্টে, অন্যজনকে কিংস ক্রস রেলস্টেশনে। গুলি করে মেরে রেখে গেছে।'

'আচ্ছা!' বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল ওর।

'গত এক মাসে মারকাল্ডির যেখানে আসা-যাওয়া করছে লোকটা, মানে, যে বাড়িতে, সেটার ওপর নজর রাখতে গিয়ে মারা গেছে আরও দুই বিএসএস এজেন্ট।' চুরুট নিভে গিয়েছিল, আবার ধরিয়ে নিলেন রাহাত খান।

'কে কে, স্যার?' প্রশ্ন করল ও।

বললেন তিনি, তারপর তাকিয়ে থাকলেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা রানার দিকে। জানেন, এদের সাথে কাজ করেছে ও, সবার সাথে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল রানার। ওর কষ্ট অনুমান করার চেষ্টা করলেন বৃদ্ধ।

'মারকাল্ডিতে কার কাছে যায় আরগুয়েলো?' অনেকক্ষণ পর প্রশ্ন করল রানা। 'কেন?'

'এর কাছে যায়,' সামনের দ্বিতীয় ছবিটা এগিয়ে দিলেন রাহাত খান। 'তবে কেন যে যায়, এখনও জানা সম্ভব হয়নি।'

আগ্রহের সাথে ছবিটা দেখল ও। এক বৃদ্ধের ছবি–ষাটের কম হবে না বয়স। চুল-দাড়ি-গোঁপ সব পেকে সাদা, চোখে কালো ফ্রেমের পুরু কাঁচের চশমা। চওড়া উঁচু কপাল। সব মিলিয়ে প্রতিভাবানদের মত চেহারা, হাজারজনের মধ্যেও সহজেই আলাদা করে চেনা যায়। বাঁ গাল সামান্য কুঁচকে আছে বৃদ্ধের, মনে হয় ব্যঙ্গের হাসি হাসছে বুঝি।

'এঁকে মনে হয় দেখেছি আগে,' নিচু গলায় আপনমনে বলল ও। 'চেহারা চেনা-চেনা লাগছে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। 'দেখেছ। খবরের কাগজে–ম্যাগাজিনে প্রচুর ছবি দেখেছ ভদ্রলোকের।'

'কে ইনি?'

'ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের সদস্য, ডক্টর রজার সাইমুর।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। 'চিনেছি।' পরক্ষণে চেহারা কুঁচকে উঠল। 'এঁর কাছে আরগুয়েলো কি এমন···' থেমে গেল ও প্রশ্ন অসমাপ্ত রেখে।

'কারণটা এখনও জানা যায়নি।'

'ভদ্রলোক শুনেছি স্কটল্যান্ডের অভিজাত সাইমুর পরিবারের শেষ বংশধর। জমিদার গোছের। বছর দুয়েক আগে ইস্তফা দিয়েছেন চাকরি থেকে।'

'প্রথম দুটো ঠিকই আছে, রানা, কিন্তু শেষেরটা উল্টো। এঁকে আসলে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। আরেক সেন্সে বলা যায় তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে চাকরি

থেকে।

বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। প্রশ্ন করল না। জানে, এখন নিজে থেকেই সব খুলে বলবেন তিনি। হলোও তাই। শেষ হয়ে আসা চুরুট অ্যাশট্রেতে ফেলে হেলান দিয়ে বসলেন বৃদ্ধ, শুরু করলেন, 'সাইমুর পরিবার স্কটল্যান্ডের অনেক পুরনো আর অভিজাত পরিবার। প্রায় তিনশো বছরের। এদের অফিশিয়াল উপাধি লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। পুরো মারকান্ডি গ্রাম এবং আশেপাশের হাজার হাজার একর জমির মালিক।

'ডক্টর রজার ব্যক্তিগতভাবেও অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানির ডিরেক্টর, রীতিমত বিলিয়নেয়ার। অক্সফোর্ডের নামকরা ছাত্র, প্রতিভাবানদের মধ্যেও সেরা প্রতিভাবান, এক্সট্রা অর্ডিনারি জিনিয়াস।'

থেমে একটু ভাবলেন মেজর জেনারেল, নাকের ডগা চুলকালেন। 'এর মত একজনের সাথে আরগুয়েলোর এমন কি নিয়ে এত গোপন যোগাযোগ চলছে, ভেবে খুব দুশ্চিন্তায় আছে বিএসএস,' বললেন তিনি।

'কিন্তু ডক্টর সাইমুরকে রিজাইন দিতে বাধ্য করা হলো কেন?' জানতে চাইল রানা। 'তাঁর অপরাধ কি, স্যার?'

'বিষয়টা একটু জটিল, রানা। বছর দুয়েক আগে ডক্টর রজার কমিশনের এক মীটিঙে ঘোষণা করল, সে নাকি পারমাণবিক বর্জ্য ডিসপোজালের শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ এক যন্ত্র তৈরি করতে আগ্রহী। ওটা তৈরি করা গেলে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো এখানে-সেখানে বর্জ্য ডাম্প করে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর জন্যে যে মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করছে, তা এড়ানো সম্ভব হবে। রিঅ্যাক্টর ধরনের কিছু একটা আর কি! দ্বিমুখী কাজ করবে ওটা, শক্তি উৎপাদন ও বর্জ্য নিরাপদে ধ্বংস করা, দুটোই। তবে এ জন্যে বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড প্রয়োজন।

'কমিশন তাঁর কাছে ডিজাইন চাইল। জমা দিল সে ডিজাইন। কিন্তু ওটা পরীক্ষা করে কমিশন মত দিল ওতে অনেক খুঁত আছে–চলবে না। অন্য সদস্যদের কেউ কেউ সরাসরি বলে বসল, বর্তমানে চালু বি. ডব্লিউ. আর বা পি. ডব্লিউ. আর সিস্টেমের চাইতে তারটা বরং বিপজ্জনক। ব্যস্, খেপে গেল মানুষটা। দাবি করল, ফান্ড দাও, আমি প্রমাণ করে দিচ্ছি তোমাদের ধারণা ভুল।

'কিন্তু দাবি করলেই তো আর সব হয় না! কমিশনের অন্য সদস্যরা কম বোঝে না ওসব, তাদের কেউই সমর্থন করছে না ডক্টর সাইমুরের দাবি, সেক্ষেত্রে কমিশন কি করতে পারে? তবু বিষয়টা নিয়ে ভোটাভুটির ব্যবস্থা করে ওরা, তাতেও দেখা গেল সব ভোট সাইমুরের বিপক্ষে পড়েছে। পক্ষে পড়েনি একটাও।'

'তাই বাধ্য হয়ে কমিশন রিজেক্ট করল তাঁর প্রস্তাব,' বলে উঠল রানা।

'ঠিক। রেগেমেগে একাকার কাণ্ড করল বিজ্ঞানী। তার ধারণা সবাই তার রেপুটেশনকে হিংসে করে, তাই কাজটা করতে দিল না। পরিস্থিতি এমন হলো যে কমিশন এক সময় ডক্টর সাইমুরকে রিজাইন করতে নির্দেশই দিয়ে বসল বাধ্য হয়ে, নইলে আর সব সদস্যরা একযোগে রিজাইন করবে বলে হুমকি দিয়ে বসে আছে।'

'তারপর?'

'রিজাইন দিল ডক্টর সাইমুর, লন্ডন ছেড়ে ঢুকল গিয়ে নিজের দুর্গে। তারপর বহুদিন খবর ছিল না, কি বুদ্ধি পাকিয়েছে ভেতরে বসে বসে, কে জানে? হঠাৎ করে আরগুয়েলোর তার ওখানে আসা-যাওয়া শুরু হলো। এসব দেখে বেশ চিন্তায় আছে বিএসএস। কি চলছে ওখানে, জানার কয়েকটা চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওদের। দুটো সন্দেহ জেগেছে ওদের এ নিয়ে। হয় ডক্টর সাইমুরের বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আরগুয়েলো বড় ধরনের কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে চলেছে, নয়তো বিজ্ঞানী নিজেই তার কোন অশুভ তৎপরতা সফল করতে তার সাহায্য চেয়েছে। পরেরটার সম্ভাবনাই বেশি।'

রাহাত খান আর কথা বলছেন না দেখে একটু পর প্রশ্ন করল ও, 'আমাকে কি করতে বলেন, স্যার?'

'ভাবছিলাম,' ডানদিকের জুলফি চুলকালেন তিনি। 'তোমার হাতে তো কোন কাজ নেই, ওদিকে বিএসএস চীফ লংফেলো এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য চেয়েছে, যদি সম্ভব হয় আর কি! তাই...' ইচ্ছে করেই থেমে গেলেন বৃদ্ধ।

'আমি যাব, স্যার,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ও। 'কবে যেতে হবে?'

'যেতে চাইলে আর দেরি কেন? আজই যাওয়া যায়।'

'তাই যাব, স্যার।'

ওর ভেতরের অস্থিরতা টের পেয়ে মনে মনে হাসলেন রাহাত খান। ও ঠিক আমার মত হয়েছে, ভাবলেন। তাঁরও এক সময় এই বয়স ছিল, যখন বিপদ আর রোমাঞ্চের গন্ধ নাকে গেলেই রক্তে বান ডাকত, প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে যেতেন তিনি পাঞ্জা লড়তে। মাসুদ রানাও তাই।

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও গিয়ে। সন্ধের পর ফ্লাইট। টিকেট আর কাগজপত্র পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি।'

'জ্বি, স্যার,' উঠে পড়ল ও।

'রানা!' গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন বৃদ্ধ।

'স্যার?'

'সতর্ক থেকো। খুব সতর্ক থেকো। বেপথে এক পা ফেললেই...' এবারও ইচ্ছে করে থেমে গেলেন।

'থাকব, স্যার!'

'লন্ডন পৌঁছে মারভিন লংফেলোর সাথে দেখা কোরো। ও তোমাকে ব্রীফ করবে বাকি সব। গুড লাক!'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ঠিক একই মুহূর্তে কয়েক হাজার মাইল দূরে আর একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। লন্ডনের প্রায় পাঁচশো মাইল উত্তরের এক দুর্গের গোপন দরজা ওটা, ভেতরে ঢুকল ছোটখাট এক মানুষ। চুল-দাড়ি-গোঁফ সব সাদা তার। প্রতিভাবানদের মত চেহারা।

তাকে দেখে ভেতরে বসা এক লোক উঠে দাঁড়াল সসম্মানে। বড় এক মিলিটারি ডেস্কের উল্টোদিকে পুরু গদিমোড়া চেয়ারে বসেছিল সে। প্যাট্রিক

অলিভিয়েরো আরগুয়েলো তার নাম। এই নিয়ে ছ'বার ঢুকল সে এ দেশে। আগের সফরের সময় কিছু সমস্যা হয়েছে, কয়েকটা খুন-টুন করতে হয়েছে তাকে, পরে আরও দু'জন মরেছে, তবে তা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই আরগুয়েলোর। তারপরও যে সে আবার ইংল্যান্ডে ঢুকতে পেরেছে, পৌঁছতে পেরেছে জায়গামত, তাতেই সন্তুষ্ট।

খুন-খারাবি, টিকটিকি পিছু লাগা, এসব কোন বিষয়ই নয় তার কাছে। পরোয়া করে না। ছোট ছোট পায়ে কাছে এসে ডান হাত বাড়িয়ে দিল বৃদ্ধ। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, প্যাট্রিক।' শেষ নামটা একটু বড় বলে তাকে সবসময় প্রথম নাম ধরে ডাকে সে।

'আমিও,' হেসে তার হাত ঝাঁকিয়ে দিল লোকটা। 'অনেকদিন হলো আপনার সাথে পরিচয়। কিন্তু আপনাকে কি বলে যে ডাকব, ভেবে ঠিক করতে পারিনি। লেয়ার্ড, নাকি...'

'ওয়ারলক নামটা পছন্দ হয়?' বলল পক্ককেশ। হাসল ফিক্ করে। 'আমার কিন্তু ভারি পছন্দ।'

'ঠিক বলেছেন,' সে-ও হাসল। 'একদম উপযুক্ত নাম। বেশ, আজ থেকে তাই ডাকব আপনাকে।'

ডেস্কের ওপাশে নিজের বিশাল সুইভেল চেয়ারে বসল বৃদ্ধ, পুরু কাঁচের ওপাশ থেকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে আগন্তুককে দেখল। ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছে, অনেকটা পাখির মত। ওটা তার অভ্যেস। 'এবার কোন সমস্যা?'

'নাহ্! আপনার চপার ঠিক সময়ে পৌঁছেছে। পিছনে কোন লেজও ছিল না এবার।'

'গুড,' আরেক দফা পাখি-নড করল সে। 'আশা করছি এটাই তোমার শেষ সফর হবে এখানে।'

হাসি দফায় দফায় মিলিয়ে গেল আরগুয়েলোর চেহারা থেকে। 'কিন্তু আমার পেমেন্টের ব্যাপারটা...'

'নিশ্চই নিশ্চই!' দ্রুত বলে উঠল বৃদ্ধ। 'ওটা তো আছেই। সে যাক, এবার দু'চারদিন থাকতে হচ্ছে তোমাকে। সমস্ত কিছু চূড়ান্ত করতে হবে।'

'তাতে অসুবিধে নেই। আমি তৈরি হয়েই এসেছি।'

একটা পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করতে লাগল পরমাণু বিজ্ঞানী। 'ইওরোপের খবর বলো, সব রেডি?'

'সব রেডি,' দৃঢ় আস্থার সঙ্গে বলল লোকটা।

'আমেরিকায়?'

'ওখানেও। আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে ওরা।'

গভীর দৃষ্টিতে তাকে দেখল বৃদ্ধ। 'কারও ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই তো তোমার, প্যাট্রিক?'

'প্রশ্নই আসে না!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'ওরা প্রত্যেকে আপনার স্বপ্ন সফল করতে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করবে, কিন্তু পিছপা হবে না। কেউ কেউ এখনই নিজেকে মৃত ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। ওরা কেবল একটাই নিশ্চয়তা চায়, কাজ

শেষে যে যার ন্যায্য পাওনা পাবে কি না। এছাড়া আর কোন সমস্যা আমি অন্তত দেখি না।'

'গুড!' বলে চিন্তায় ডুবে গেল বৃদ্ধ।

নিজের চারদিকে তাকাতে লাগল আরগুয়েলো। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার এসেছে সে এখানে, রীতিমত প্রেমে পড়ে গেছে রুমটার। ভেতরের বহু-মূল্যবান জিনিসপত্র যত দেখে, ততই লোভ জাগে।

রুমটা সাইমুর ক্যাসেলের আন্ডারগ্রাউন্ডে, বিরাট–প্রায় বাস্কেটবল মাঠের মত। সিলিঙ যথেষ্ট উঁচুতে। দুই দেয়াল সিলিঙ সমান উঁচু বুক শেলফের আড়ালে পড়ে আছে। শেলফ বোঝাই মোটা মোটা দামী সমস্ত বই। বেশিরভাগই বিজ্ঞানের। ফিশিং আর হান্টিঙের ওপরেও আছে কিছু।

রজার সাইমুরের ঠিক পিছনেই আছে আরেকটা গ্লাস কেবিনেট। এটা একটু ছোট। ভেতরে রয়েছে আক্ষরিক অর্থেই অমূল্য সমস্ত অ্যান্টিক অস্ত্রশস্ত্র। খাঁটি রুপোর তৈরি একজোড়া ফ্লিন্ট-লক পিস্তল, এক সেট আমেরিকান কেন্টাকি হ্যান্ড গান, মাদার অভ পার্ল ও সোনার তৈরি ফ্রেঞ্চ হুইল-লক, একজোড়া কাটলাস পিস্তল, ছয়টা রিভলভিং ব্যারেলসহ আরও অসংখ্য এটা-ওটা।

এসবের মূল্য বোঝে সন্ত্রাসী আরগুয়েলো। জানে লন্ডনের যে কোন নিলাম ঘরে অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি হবে এসব।

'আমার তরফ থেকে ওদের পেমেন্টের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছ নিশ্চই?' বলল রজার সাইমুর।

ওপর-নিচে মাথা দোলাল স্প্যানিশ। 'দিয়েছি। তবু, এসব ব্যাপারে শেষ দিকে অনেক সময় পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে যায়, বোঝেনই তো! তাই ওরা একটু…ইয়ে…'

'বুঝি। ওদের বোলো, আমার প্ল্যানের বেলায় পরিস্থিতি একচুল এদিক-ওদিক হবে না। আমি যেভাবে বলেছি, ঠিক সেভাবেই ঘটবে সব। কেউ কিছু করার কথা ভাবতে পর্যন্ত পারবে না। আমি জানি আমি কি করছি,' কথাটা খুব জোর দিয়ে, থেমে থেমে বলল লোকটা। 'ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকাও বুঝবে একদিন। ওরা জানে, দাবি পূরণ করা না হলে আমি যা করব, তার পরিণতি পৃথিবীর জন্যে, মানব সভ্যতার জন্যে কতবড় সর্বনাশা হবে। যখন ওরা বুঝবে ওদের কিছু করার নেই, তখন…' আপনমনে হেসে উঠল বিজ্ঞানী।

প্রথমে নিঃশব্দে, তারপর গলা ছেড়ে। ওই হাসির মধ্যে অশুভ কিছু আছে টের পেয়ে বিশ্বের সেরা সন্ত্রাসী আরগুয়েলো পর্যন্ত মনে মনে কুঁকড়ে গেল। কিন্তু সামলে নিল কোনমতে, কারণ এখন ভয় পেয়ে লাভ নেই। বিজ্ঞানীর সাথে তাল মিলিয়ে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে সে।

এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখান থেকে পিছিয়ে আসার পথ নেই। কেবলই এগিয়ে যেতে হবে এখন। নিয়তির দিগন্তের ওপারে কি আছে, দেখার জন্যে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে।

এর কোন বিকল্প নেই।

তিন

বিএসএস, লন্ডন। মারভিন লংফেলোর মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। হাতে তিনটে ছবি—একটা রজার সাইমুরের, অন্য দুটোর একটা এক মাঝবয়সী মহিলার, অন্যটা অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতীর।

মহিলার ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে বয়স, চমৎকার চেহারা। পিম, লম্বাটে ফিগার। মাঝপিঠ পর্যন্ত কালো, ঘন চুল। বড় বড় চোখ, তবে চাউনি সরল নয়—বরং একটু কঠিন। জ্ঞানী মানুষের মত লাগে দেখতে। ছোট, লোভনীয় দুই ঠোঁটে ফুটে আছে আমন্ত্রণের হাসি।

'মিস মে হরোইৎজ,' বলে উঠলেন লংফেলো। 'সাইমুরের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। ট্রেইনড় ফিজিসিস্ট। সাইমুরের মত এ-ও কেমব্রিজের ছাত্রী। প্রায় এক যুগ হতে চলল এক সঙ্গে আছে দু'জন, যেখানেই যাক বিজ্ঞানী, সে থাকবেই সাথে। সোজা কথায় তার রক্ষিতা।'

মাথা দুলিয়ে পরের ছবিতে মন দিল ও। মে-র তুলনায় অনেক কম বয়স এ মেয়েটির, বিশ-একুশ। এক কথায় অপরূপা। মিষ্টি চেহারা, চাউনি নিষ্পাপ। মুখটা ডিমের মত, চুলের রঙ চকচকে সোনালী। মসৃণ, লাবণ্য ভরা ত্বক। চোখ দুটো বেশ বড়, তার ওপরে ধনুকের মত বাঁকা, সরু ভুরু। ক্যামেরার সামান্য ডানে তাকিয়ে আছে মেয়েটি, হাসছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দুটো ঝকঝকে দাঁতের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বৃদ্ধের দিকে তাকাল রানা।

'এ হচ্ছে রজার সাইমুরের ভাইঝি, মিস রোজালিন সাইমুর, বা রোজি,' বললেন তিনি। 'সাইমুরদের শেষ বংশধর। বেশ কয়েক বছর আগে সিসিলিতে এক প্লেন দুর্ঘটনায় মারা গেছে ওর মা-বাবা।'

সিগারেট ধরিয়ে নীরবে টানলেন কিছুক্ষণ লংফেলো। অন্যমনস্ক। 'জানা গেছে একে কড়া শাসনে রাখে রজার। স্কুল-কলেজে পড়ার সুযোগ পায়নি বেচারী, প্রাইভেট টিউটর বাড়িতে গিয়ে পড়িয়েছে। একা দুর্গের বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই। বের হয় অবশ্য মাঝেমধ্যে, তবে চাচার সাথে। একদল পোষা কুকুরের পাহারায়।'

'পোষা কুকুর?' প্রশ্ন করল রানা।

'বডিগার্ড আরকি!' চেহারা বিকৃত করলেন বৃদ্ধ। 'বাছা বাছা স্কটিশ দানব একেকটা। সব সময় ছায়ার মত লেগে থাকে রজারের সাথে। ওদের যে চীফ, তার আকার-আকৃতি প্রায় গরিলার মত, রানা। নাম পিটার।'

আবার কিছু সময় চুপ করে থাকলেন তিনি। কপালে গভীর কুঞ্চন। 'রজারের সাথে আরগুয়েলোর গোপন যোগাযোগের পিছনে কারণ যাই হোক, সেটা যে ভয়ঙ্কর কিছু, তাতে কোন সন্দেহ নেই, রানা। ভেবে দেখো, এক মাসের সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যে চার-চারজন অপারেটর হারিয়েছি আমি। অপূরণীয় ক্ষতি

হয়ে গেল আমাদের। সন্দেহ হচ্ছে আমাদের বেশিরভাগ অপারেটরকে চেনে ওরা। কি করে, ঈশ্বরই জানে। পরেরবার যাকে পাঠাব, তারও হয়তো পরিণতি একই হবে। কাল আবার এসেছে আরগুয়েলো, মারকাল্ডি গেছে। দূর থেকে ওকে অনুসরণ করেছে আমার লোক, ধারেকাছে যেতে নিষেধ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু দূর থেকে কাজ হবে না, রানা, রজারের কাছে পৌঁছতে হবে, তাই বাধ্য হয়ে তোমার সাহায্য চেয়েছি।'

'বুঝলাম,' চিন্তিত রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু তার কাছে যাব কি করে, স্যার? সে ব্যাপারে ভেবেছেন কিছু?'

'ভেবেছি,' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে ঝুঁকে বসলেন বিএসএস প্রধান। 'খুব শিগগিরই লোকটার কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ আসবে, রানা। সেটা কাজে লাগানো সম্ভব।'

'কি ধরনের সুযোগ?'

পরে বলছি। ওটা যদি কাজে লাগাতে পারো, রজার সাইমুরের কাছে পৌঁছে তাকে প্রভাবিত করতে পারো, তাহলে খুব সম্ভব তার ক্যাসেলে ঢোকার একটা সুযোগ তুমি পাবে।'

'ওর মত একজন ঘুঘু লোককে প্রভাবিত করা নিশ্চই কঠিন হবে।'

'সে ব্যবস্থা আমি করব,' তাড়াতাড়ি বললেন বৃদ্ধ। 'তোমার নতুন ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে দেব আমি। পরিচয়ের পরে যদি তোমার ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়, যে সব তথ্য লোকটা পাবে, তাতে আর কিছু না হোক, অন্তত অখুশি হবে না। সে ক্ষেত্রে ধরে নেয়া যায় কিছু না কিছু প্রভাবিত হবেই। চাই কি খুশিমনে এক-আধটা কাজের অফারও দিয়ে বসতে পারে তোমাকে।'

খানিকটা সময় চুপ করে থাকল ও। 'সুযোগটা কখন, কোথায় পাচ্ছি আমি, স্যার?'

'আগামী সপ্তায়, অ্যাসকট হর্স রেসের মাঠে। ওখানে য়াবে রজার সাইমুর, মে আর রোজিকে নিয়ে।'

রোজমেরির ছবি দেখছিল ও। চোখ তুলে লংফেলোর দিকে তাকাল। 'শিওর যাবে তো?'

'নিশ্চই! বাৎসরিক গোল্ড কাপ রেস হতে যাচ্ছে ওখানে, রানা। রজারের নিজের ঘোড়া ব্লু চায়নাও অংশ নেবে। ঘোড়ার নামের তালিকা আছে আমার কাছে।'

ওপর নিচে মাথা দোলাল রানা।

'তবে রজারের সাথে পরিচয়টা কষ্ট করে তোমাকেই করে নিতে হবে। আমি অবশ্য পথ বলে দেব। হাতে কয়েকদিন সময় আছে, এর মধ্যে প্র্যাকটিস কিছুটা ঝালিয়ে নিলে...'

'প্র্যাকটিস!' চোখ কুঁচকে উঠল ওর। 'কিসের?'

অমায়িক হাসি দিলেন মারভিন লংফেলো। 'এই পকেট মারা বিদ্যের মতই অনেকটা আরকি!'

'অ্যাসকট ৫ মাইল' লেখা মাইল স্টোন সাঁ করে পিছিয়ে গেল। আর ঘণ্টা দেড়েক

আছে রেস শুরু হতে। প্রশান্ত মেজাজে গাড়ি ড্রাইভ করছে রানা, এক হাতে স্টিয়ারিঙ হুইল ধরা, অন্য হাতে সিগারেট পুড়ছে। গত প্রায় এক সপ্তাহ দু'আঙুলের কারবার নতুন করে, খুব ভাল ভাবে প্র্যাকটিস করেছে ও কার্টপার্সের 'দ্য স্কিলস্, আর্টস অ্যান্ড সিক্রেটস্ অভ দ্য ডিপ' পড়ে।

পকেট মারা বিদ্যের অনেকগুলো কৌশলের সাথে বইটায় নেকলেস লোপাট করার কায়দাও আছে, সবচেয়ে কঠিন কাজ। ওটাই শিখেছে রানা। শুধু শেখেনি, মডেলের সাহায্যে খুব ভালমতই প্র্যাকটিস করেছে। লংফেলোর দেয়া তথ্য যদি সঠিক হয়, যদি রেস দেখতে সাইমুরের সাথে তার ভাইঝি আসে, তাহলে এ বিদ্যা কাজে লাগবে। নিজের ওপর আস্থা আর বিশ্বাসের অভাব নেই রানার, জানে, ও সফল হবেই।

'অ্যাসকট ৪ মাইল' পোস্ট পেরিয়ে গতি কমাতে বাধ্য হলো ও, সামনে বেন্টলি, রোলস রয়েস আর ডিমলারের লম্বা লাইন। সবাই চলেছে রেস কোর্সের দিকে। আরও খানিকদূর এগোতে একটু একটু অস্বস্তি লেগে উঠল। মনে হলো গলার মধ্যে কোথাও গিঁট লেগে গেছে। বাতাসে বিপদ আর রক্তের দূরাগত গন্ধ। তবে যত বড় আর ভয়ঙ্কর বিপদই হোক, মোকাবেলা করার সবধরনের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে রানা, এই যা সান্ত্বনা।

একেবারে বোঝাই কার পার্কে গাড়ি রেখে নামল ও। কোটের ল্যাপেলে জ্বল জ্বল করছে রয়্যাল এনক্লোজারে ঢোকার পাস। ও ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে রানী মা ও প্রিন্স ফিলিপ পৌঁছলেন, তারপর রাজকীয় পরিবারের অন্য সদস্যরা। রেসে রানীমার ঘোড়া অংশ নিচ্ছে। ওটাই ফেভারিট। এছাড়া আছে ফ্রান্সিস ফলি, ডেসমন্ড'স ডিলাইট এবং সফট সেন্টারসহ আরও ছয়টা। সবার শেষে সাইমুরের চার বছর বয়সী চায়না ব্লু। প্রথম চারটের ওপর বাজী ধরা হয়েছে বহু টাকার। আর সব আছে শুধুই প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়াতে।

গত কয়েকটা রেসের রেকর্ড অনুযায়ী আজকের রেসে কোন চান্সই নেই চায়না ব্লুর। প্রথম চারটের ধারে কাছেও আসতে পারবে না। বুকমেকারদের হিসেবে আজ ওটার জয়ের সম্ভাবনা শতকরা মাত্র চার ভাগ। তবু ওটার ওপরই বাজী ধরার সিদ্ধান্ত নিল রানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল কাছের বুকমেকারের স্টলের দিকে। একশো পাউন্ডের কড়কড়ে পাঁচটা নোট ঠেলে দিল গ্রিলের ফাঁক দিয়ে। 'চায়না ব্লু,' বলে হাসল।

রসিদ বই বের করে লেখা শুরু করতে গিয়েও থেমে গেল লোকটা, ভুল শুনেছে ভেবে মুখ তুলে তাকাল। 'এক্সকিউজ মি, স্যার?'

'চায়না ব্লু।'

নোটগুলো দেখল লোকটা। দ্বিধায় পড়ে গেছে। 'এতগুলো টাকা পানিতে ফেলতে চান, মিস্টার?'

মাথা দোলাল রানা। 'উঁহুঁ! আরও পনেরো হাজার ফেরত পেতে চাই।'

'ওয়েল, স্যার,' শ্রাগ করল সে। 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনি শেষ পর্যন্ত হতাশ হবেন।'

টিকেট নিয়ে এনক্লোজারে ঢুকে পড়ল ও। হাঁটাহাঁটি করতে লাগল ভিড়ের

মধ্যে। পুরুষ আর মেয়ে দর্শকের অনুপাত প্রায় সমান মনে হলো, মেয়েরা জবরজঙ ফ্যাশনেব্‌ল্ ড্রেস আর চওড়া কার্নিসের হ্যাট পরে ঘুরঘুর করছে পুরুষ সঙ্গীদের বাহু ধরে। কিশোরী থেকে বুড়ি পর্যন্ত। অনর্গল বক্ বক্ করে চলেছে।

এ মুহূর্তে নিরস্ত্র মাসুদ রানা, প্রিয় ওয়ালথার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে রেখে এসেছে। সাথে আছে কেবল একটা বিশেষ কলম–ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট ডিভাইস।

হাঁটতে হাঁটতে নিরিবিলি দেখে বড় এক গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াল ও, তাকিয়ে থাকল কাছের গোল প্যাডকের দিকে। প্রতিযোগী প্রায় সব ঘোড়াই আছে ওখানে, ট্রেইনার, জকি ও স্টেবল-বয়রাও আছে নিজ নিজ ঘোড়ার সাথে। চায়না ব্লুকে ওর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে কিছু সময় লাগল। প্যাডকের ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ওটা প্রবল প্রতাপশালীর মত। আপোসহীন, দুর্জেয় ভঙ্গিতে। অন্যগুলোকে ওটার পাশে ম্লান লাগছে।

অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। কপালে মৃদু কুঞ্চন ফুটল। কেন যেন মনে হলো, আজ একটা অঘটন ঘটিয়ে বসবে চায়না ব্লু। গত কয়েকটা রেসের রেজাল্ট যা-ই হোক, আজ অন্য কিছু ঘটবে। প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝে ফেলল, ওটার মধ্যে এমন কিছু আছে যা চোখে দেখা যায় না, শুধু অনুভব করা যায় সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে। দীর্ঘদিন ধরে জীবন-মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে রানার এই অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ণ, অনেক শানিত হয়েছে, বিপদ-আপদ বা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু ঘটে বসার আগে তাই টের পেয়ে যায় ও। আজও পেল–বুঝল চায়না ব্লু জিতবেই।

কিন্তু কিভাবে? অস্বস্তি লেগে উঠল। আজকাল ইংল্যান্ডে ঘোড় দৌড়ে কোনরকম ঠগবাজি চলে না, তাছাড়া সেরকম কিছু রজার সাইমুর করবে বলেও মনে হয় না। এতবড় এক প্রতিযোগিতায় ডোপিং বা অন্য কিছু করে নিজের ঘোড়া জেতাবার ঝুঁকি সে নেবে না, ধরা পড়লে সর্বনাশ ঘটে যাবে। তারপরও রানা একশো ভাগ নিশ্চিত, আজ জিতবেই চায়না ব্লু।

অজানা এক রোমাঞ্চে গায়ে কাঁটা দিল ওর, ঘাড়ের কাছের খাটো চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। তখনই চোখ পড়ল এক পক্বকেশ বৃদ্ধ ও দুই মেয়ের ওপর। প্যাডকের ভেতরে ঢুকেছে তারা, চায়না ব্লুর দিকে এগোচ্ছে। হ্যাট খুলে ঝুঁকে তাদের নড করল ওটার ট্রেইনার। পাখির মত চকিত মাথা দুলিয়ে জবাব দিল বৃদ্ধ। এই প্রথম সামনাসামনি দেখল ও বিজ্ঞানীকে।

পকেট থেকে বিএসএসের সরবরাহ করা প্যাডকের গেট পাসটা অনুভব করল রানা। ঘোড়ার মালিকদের বিশেষ পাস ওটা–জাল। ভেতরে প্রচুর মানুষ। প্রতিটি ঘোড়ার সাথে কম করেও তিনজন তো রয়েইছে, সাথে সপরিবারে মালিকরাও। এরমধ্যে রানা কোন্ ঘোড়ার মালিক, কেউ জিজ্ঞেস করতে আসবে না আশা করা যায়।

দ্রুত এগোল ও প্যাডকের গেটের দিকে। যেন ভারি ব্যস্ত, এমনভাবে সিকিউরিটি গার্ডের নাকের সামনে পাসটা দুলিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সুড়ুৎ করে। ওটা ভালমত দেখার বা ওকে দাঁড় করিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার কথা ভাবলও না পর্যন্ত লোকটা, হলুদ পাস দেখেই সন্তুষ্ট। ভেতরে এসে যথেষ্ট কাছ

থেকে বৃদ্ধকে দেখল রানা। স্টিল ছবিতে কারও হাঁটাচলা বা অঙ্গভঙ্গি ধরে রাখার উপায় নেই, থাকলে চেহারার সাথে লোকটার সে সবও জানা থাকত। নতুন করে তার সম্পর্কে হিসেব-নিকেশ করতে হত না।

টেনেটুনে পাঁচ ফুট হবে লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। হাঁটে ছোট ছোট, দ্রুত পদক্ষেপে, অনেকটা ছাগলের বাচ্চার মত—এ ছাড়া আর কোন যোগ্য তুলনা খুঁজে পেল না ও। মাথা, হাত, আঙুল, ঘাড়, সবকিছুর মুভমেন্টও তেমনি দ্রুত, চকিত। সব মিলিয়ে মানুষটাকে ভূচর পাখির মত লাগে। স্কটিশ চীফটেইনের সহজাত গাম্ভীর্য বা ধীরস্থির ভার, কিছু নেই—সারাক্ষণ ছট্ফট্ করছে। হঠাৎ দেখলে যে কারও চোখে দৈহিক প্রতিবন্ধী মনে হবে তাকে।

অথচ এতকিছুর আড়ালেও যে লোকটার মধ্যে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আছে, ব্যাপারটা ওর নজর এড়াল না। তার সঙ্গী দুই মেয়ে একই ডিজাইনের ড্রেস পরেছে, রঙ আলাদা। ভি-গলার ক্লাসিক ড্রেস, ওপরে খাটো, পীভলেস জিলেট।

রোজালিনের দিকে নজর দিল রানা। ছবির চাইতে বহুগুণ সুন্দরী মেয়েটি। পাঁচ ফুট সাত, স্লিম ফিগার। হাসছে চায়না ব্লুর দিকে তাকিয়ে। মৃদু বাতাসে বুক ফাড়া জিলেট বারবার সরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে উন্নত বুক আর মোহায়ের মুক্তো বসানো মহামূল্যবান নেকলেস। মারভিন লংফেলোর সূত্র যদি সত্যি হয়, তাহলে ওটার দাম পাঁচ লাখ পাউন্ড।

রোজালিনের বাবা রবার্ট সাইমুর বিয়ের সময় স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল ওটা। বেশির ভাগ সময় ব্যাঙ্কের ভল্টেই পড়ে থাকত, বিশ বছর পূর্তির দিন উত্তরাধিকার সূত্রে রোজালিনের গলায় উঠেছে। আজকাল প্রায় সব বড় অনুষ্ঠানে ওটা পরে আসে মেয়েটি। মুচকে হাসল রানা, উপযুক্ত গলাতেই জায়গা হয়েছে নেকলেসটার, ওর মত অপূর্ব সুন্দরীকেই মানায় মোহায়ের পার্ল।

ভাল করে ওটা দেখে নিল রানা। দুদিক থেকে নেমে আসা তিনটে করে খাটো সোনার দড়িতে ঝুলছে আসল জিনিস। দুই কানের কাছে এক হয়ে গেছে দড়ি, পিছনে এক নকশা করা খুদে সোনার বাক্সের মধ্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়েছে। ছোট্ট এক লিভারে চাপ পড়লে ভেতরের স্প্রিঙের ধাক্কায় খুলে যাবে বাক্স, তারপর...।

রজার সাইমুরকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল ও। দুই সঙ্গিনীর সাথে কথা বলছে। তার ট্রেইনার চায়না ব্লুর জকির কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলছে—রেস জেতার অব্যর্থ কৌশল বোধহয়। পিছনে সদম্ভে দাঁড়িয়ে অপ্রতিরোধ্য চায়না ব্লু, চক্চকে চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ছে যেন শক্তির ছটা। প্যাডক এন্ট্রান্সের কাছে এসে দাঁড়াল রানা, ভেতরের লোকজন সব বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।

কাঁধে ঝোলানো যেইস লেন্সের শক্তিশালী ফিল্ড গ্লাসের ফিতে আরেকটু ওপরে তুলল ও, আসল সময় হাজির বুঝতে পেরে হার্টবিট একটু বেড়ে গেছে। গলা শুকিয়ে আসছে। ওদিকে সব ঘোড়ায় জিন চাপানো শেষ, একটা-দুটো কোর্সের গেটের দিকে রওনাও হয়েছে। ভিড়ের মধ্যে চায়না ব্লুর জকিকে এক পলক দেখতে পেল রানা। চেহারায় প্রবল আত্মবিশ্বাস। আবার সেই চিন্তা পেয়ে বসল ওকে—কি ভাবে জিতবে চায়না ব্লু? কোন্ অলৌকিক শক্তির বলে?

নিজের চারদিকে ভিড়ের চাপ অনুভব করল ও। ক্রমেই বাড়ছে। ঘোড়ার মালিক, পরিবারের সবাই, বন্ধু-বান্ধবসহ জকি বাদে অন্য কর্মচারীরা সবাই একযোগে সরু গেটের মুখে এসে জড়ো হয়েছে। রজার আর মের কাছ থেকে হয়তো ভিড়ের চাপেই পিছিয়ে পড়ছে রোজালিন, তাই দেখে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, দ্রুত কয়েক পা সরে এসে মেয়েটির ঠিক পিছনে দাঁড়াল। তার সাথে তাল রেখে এক পা এক পা করে এগোল গেটের দিকে।

পেট মোটা বোতলের সরু গলা দিয়ে ঘন কিছু বের করার সময় জিনিসটার গতি যেমন খুব ধীর হয়ে যায়, তেমনি হয়েছে গেটের অবস্থা। প্যাডকের চওড়া পেট থেকে অনেকে একসাথে বের হতে গিয়ে আটকে গেছে সরু মুখে। সবাই তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চায় নিজেদের বক্সে, অথবা গ্যালারিতে। গেটের কয়েক গজ ভেতরে বলতে গেলে থেমেই আছে মানুষ, পিঁপড়ের মত এগোচ্ছে। একদম চোখের সামনে রোজালিনের নেকলেসের বক্সটা দেখতে পাচ্ছে রানা এখন–মাত্র দু'হাত সামনে।

ওর গায়ের মিষ্টি সুবাস নাকে আসছে। মিলি ডি প্যাটো, ভাবল রানা, বাজারের সবচেয়ে দামী সেন্ট। এতই দামী যে এক শিশি কিনলে সঙ্গে একটা সার্টিফিকেটও পাওয়া যায়। পিছন থেকে আরেকটু ধাক্কা খেতে রানার নাক রোজালিনের চুলে ঠেকে যাওয়ার অবস্থা হলো। আশেপাশে তাকিয়ে অবস্থা বুঝে নিল ও। অসুবিধে নেই, কেউ নিচে দেখছে না, দেখছে ওপরে। থুত্নি উঁচু করে সামনের বাধার ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে গেট কতদূর।

চট্ করে বাঁ হাত তুলল রানা, তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে রোজালিনের নেকলেসের ক্ল্যাস্প্ বক্সটা আলতো করে ধরে আধ ইঞ্চিমত ওপরে তুলে ফেলল, যাতে আসল সময়ে ঘাড়ে আঙুলের ছোঁয়া না লেগে যায়। দুই আঙুলের ভেতরদিক দিয়ে জিনিসটা একবারের চেষ্টায় আটকে ধরে তোলা, ওটাই মূল–পরের কাজ সহজ। অন্য হাতের মধ্যমা দিয়ে নাকের ডগা চুলকাল রানা, হাত নামাবার সময় তর্জনীর নখ দিয়ে খুদে লিভারে চাপ দিল, লাফিয়ে খুলে গেল ক্ল্যাসপ বক্সের নকশা করা ঢাকনা। তার মেরুদণ্ডের ভাঁজের কাছে গোল এক রিঙের সাহায্যে আটকে আছে ওপাশের দড়ির মাথা।

চাপটা দিয়েই বক্স গলিয়ে দিল ও রিঙের মধ্যে দিয়ে–অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে। বিএসএসের এক মেয়ে অফিস কর্মীর গলায় ঠিক এইরকম বক্সওয়ালা নেকলেস পরিয়ে কয়েকদিন অবিরাম প্র্যাকটিস করেছে রানা। শেষের তিন দিন কিছুই টের পায়নি সে, রোজালিনও পেল না। রিঙের মধ্যে দিয়ে বক্স গলিয়ে দিতেই দুই দড়ি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, ও দুটো ছেড়ে হাত নামিয়ে নিল রানা। রোজালিনের বুকের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে নিঃশব্দে টার্ফের ওপর পড়ল মোহায়ের পার্লের নেকলেস, একই মুহূর্তে তার ওপর পড়ল রানার ফিল্ড গ্লাস। ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিনিস দুটো তুলল ও এক হাতে, মুহূর্তের জন্যে ব্রেক কষল পিছনের ভিড়, তারপর আবার নড়ে উঠল। রোজালিনের নেকলেস ততক্ষণে সবার অলক্ষে রানার কোটের সাইড পকেটে চালান হয়ে গেছে।

এরপর ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে সাইমুরের পার্টিকে অনুসরণ করে ট্যাটারসাল

স্ট্যান্ডের দিকে এগোল ও। এরমধ্যে জোর পায়ে চাচার পাশে পৌঁছে গেছে মেয়েটি। মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা, নিজেদের বক্সে না পৌঁছানো পর্যন্ত গলার দিকে যেন নজর না যায় ওর। স্ট্যান্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল দলটা, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে লম্বা একসার খোপ-খোপ বক্সের পিছনের করিডরে চলে গেল। ওদিকে একটা একটা করে কোর্সে ঢুকছে ঘোড়া, দর্শক হৈ-হৈ শব্দে তাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

পাঁচ মিনিট পর স্ট্যান্ডে ঢুকল রানা, ধীরেসুস্থে এগোল সাইমুরের বক্সের দিকে। বন্ধ দরজার কাছে এসে পকেট থেকে জিনিসটা বের করল, নক্ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ওর দিকে পিছন ফিরে বসে আছে সবাই, নজর কোর্সের স্টার্টিং পয়েন্টের দিকে। অন্য প্রতিযোগীদের মাঝে চায়না ব্লুকেও দেখতে পেল রানা ওখানে।

খুক্ করে কাশল ও। 'মাফ করবেন।'

একযোগে ঘুরে তাকাল তিনজন। 'ডিসটার্ব করার জন্যে দুঃখিত,' বলল ও নেকলেস ধরা খোলা হাত সামনে বাড়িয়ে, নজর রোজালিনের ওপর। 'মনে হয় এটা আপনার গলায় দেখেছি আমি। করিডরে পড়ে ছিল, বোধহয় খুলে পড়ে গেছে। আপনারই তো…?'

গলা দিয়ে চাপা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটির, ডান হাত চট্ করে উঠে গেল গলায়। পরক্ষণে আরেক অস্ফুট গোঙানি, 'ও মাই গড!'

'কেমন, দেখলে তো?' চাপা গলায় বলে উঠল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। পরক্ষণে পাখির মত ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে রানাকে দেখল। 'ঠিকই ধরেছেন, স্যার। জিনিসটা ওরই। আমার ভাইঝি,' হাসল সে। রোজালিনকে দেখল। 'ওকে আমি প্রায়ই বলি এত দামী জিনিস পরে যেখানে-সেখানে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে। আজ মনে হয় বিশ্বাস হবে ওর।'

'আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব,' চকের মত সাদা চেহারা করে হাত বাড়াল রোজালিন, নেকলেসটা নিয়ে চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকল। 'ঠিক…'

বাধা দিল বৃদ্ধ। 'আর কিছু না হোক, এখানে আমাদের সাথে বসে রেস দেখার আমন্ত্রণ জানাতে পারি আমরা ভদ্রলোককে।' ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি রজার সাইমুর। এ আমার বান্ধবী, মে হরোইৎজ। আর এ হচ্ছে রোজালিন সাইমুর, আমার ভাইঝি।'

লোকটার গাঢ় পাথুরে চোখে চোখ রেখে হাসল ও। একই সাথে গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল তার শীতল লাভা রঙের দু'চোখের স্থির চাউনি দেখে। 'আমি রানা। মাসুদ রানা।' জোরে ঝাঁকিয়ে দিল খুদে হাতটা। মেয়েদের সাথেও হাত মেলাল ও। এরমধ্যে নিজের রঙ ফিরে পেয়েছে রোজালিন, হাসছে বোকার মত। মে হরোইৎজকে দেখে যতটা মনে হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট মহিলা। হাসি উষ্ণ, মনকাড়া।

'বসছেন তো আমাদের সাথে রেস দেখতে?' বলল রজার।

'প্লীজ, বসুন!' অনুনয় করল কৃতজ্ঞ রোজালিন।

'ধন্যবাদ।' ঘুরে সোফার সামনে চলে এল রানা। সরে তার আর বিজ্ঞানীদের

মাঝখানে ওকে বসতে জায়গা করে দিল মেয়েটি। নিজের গ্লাসের সাহায্যে কোর্সে নজর বোলাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল বৃদ্ধ।

'আমার ঘোড়াও আছে আজকের রেসে,' বলল সে অন্যমনস্ক কণ্ঠে।

'তাই নাকি?' ঝুঁকে বসল রানা। 'কোনটা?'

'চায়না ব্লু,' গ্লাস নামিয়ে ওর দিকে তাকাল বিজ্ঞানী। শীতল লাভা জ্যান্ত হয়ে উঠল যেন মুহূর্তের জন্যে। 'এবারের গোল্ড কাপ আমার ঘরেই যাবে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'কি আশ্চর্য!' মৃদু শব্দ করে হাসল ও। 'আমিও তো তাই চাইছি, কারণ আজকের বাজী চায়না ব্লুর ওপরেই ধরেছি আমি।'

'সত্যি!' সন্তুষ্টি ফুটল তার চেহারায়। 'তাহলে বলতে হয় আপনার টাকা নিরাপদ। রোজালিনের এতবড় উপকারের কিছুটা প্রতিদান দিতে পারব আমি। কি ভেবে ওটার ওপর বাজী ধরলেন?'

'নামটা পছন্দ হলো, তাই।'

'রেস শুরু হচ্ছে!' রোজালিনের রুদ্ধশ্বাস গলা শুনে ফিল্ড গ্লাস তুলল ও, নজর দিল আড়াই মাইলের অ্যাসকট গোল্ড কাপ রেসের স্টার্টিং পয়েন্টে। একই মুহূর্তে নিচের দর্শক গ্যালারি গর্জে উঠল–শুরু হয়ে গেছে রেস। ব্যস্ত হাতে কোনমতে ফোকাস রি-অ্যাডজাস্ট করার সময় পেল রানা, ততক্ষণে মেঘের মত ধুলো উড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুট লাগিয়েছে দশটা ঘোড়া।

আধ মাইলের মধ্যে দৌড়ের একটা প্যাটার্ন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগে আগে ছুটছে চারটা–রানীমার ঘোড়া, ফ্রান্সিস ফলি, ডেসমন্ড ডিলাইট ও সফট সেন্টার। প্রায় পাশাপাশি রয়েছে এরা। প্রথমটার গলা অল্প কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে রয়েছে। এরপর একসাথে তিনটে, প্রায় দশ ঘোড়া পিছনে পড়ে গেছে এরা। আর সব অনেক পিছনে। দ্বিতীয় গ্রুপের এপাশেরটা সাইমুরের চায়না ব্লু। হালকা হলুদ আর কুচকুচে কালো রঙ ওটার।

বক্সের ভেতর অদ্ভুত চাপা উত্তেজনা অনুভব করল মাসুদ রানা, কথা নেই কারও মুখে। সবাই শক্ত হয়ে বসে আছে। নজর চায়না ব্লুর ওপর স্থির। এর মধ্যে আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে রানীমার ঘোড়া, কিন্তু ডেসমন্ড ডিলাইট ছেড়ে দেয়ার পাত্র নয়, সঙ্গের দুটোকে একটু একটু করে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছে। দেখতে দেখতে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল চার লীডার। প্রায় আধঘোড়া পরিমাণ পিছিয়ে পড়ল ফ্রান্সিস ফলি ও সফট সেন্টার। পরের দুটো এমনভাবে ছুটছে, মনে হয় একটাই বুঝি। এক মাইল পেরিয়ে এসেছে ততক্ষণে ওরা।

ওদিকে পরের তিনটের মধ্যে দুটো পিছিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে। না, পিছিয়ে পড়া বলতে যা বোঝায় এ ক্ষেত্রে তা ঘটল না, ভুল দেখেছিল রানা। যা ঘটেছে, তা রেসের বেলায় যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অভাবিত। হঠাৎ করে অদৃশ্য কোন শক্তির প্রভাবে যেন গতি অস্বাভাবিক বেড়ে গেল চায়না ব্লুর। এর মধ্যেও খেয়াল করেছে ও, কি যেন বিড় বিড় করে বকছে বিজ্ঞানী। এবং ব্যাপারটা শুরু হতে না হতে ব্লুর গতি বাড়ার ঘটনাটা ঘটল। সঙ্গীদের পিছনে ফেলে প্রথম গ্রুপের পরের দুটোর সাথে নিজের ব্যবধান দ্রুত কমিয়ে আনতে শুরু করেছে

ওটা।
'ব্লু! কাম অন্, ব্লু!' চাপা কণ্ঠে বারবার একই কথা বলে চলেছে রোজালিন, বক্সের রেলিঙের বাইরে ঝুলছে তার অর্ধেক শরীর। মে হরোইৎজও দাঁড়িয়ে গেছে উত্তেজনায়, দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ।
দর্শক গ্যালারি উত্তেজনায় টান্ টান্। প্রথম চারটের ওপর নজর ছিল তাদের, জানা কথা ওদেরই একটা জিতবে। কিন্তু এক মাইল পেরিয়ে আসার পরপরই চায়না ব্লু যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিল, তাতে সবার বিস্ফারিত দৃষ্টি ওটার ওপর থেকে নড়ছেই না এখন। দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ অভাবনীয় ব্যাপারটা।
প্যাডকে মনের চোখে দেখা ব্লুর সাথে এ মুহূর্তে কোর্সে কেশর দুলিয়ে ঝড়ের বেগে ধাবমান ঘোড়াটাকে মেলাতে পারছে এখন রানা—অনুমানে ভুল হয়নি ওর। যান্ত্রিক নিয়মতান্ত্রিকতার সাথে দু'জোড়া পা উঠছে আর নামছে ওটার, এতই দ্রুত যে চোখ দিয়ে অনুসরণ করা দায়। মনে হচ্ছে এতক্ষণ মূল শক্তি রিজার্ভ রেখেছিল ব্লু, জকির নির্দেশে এবার ব্যবহার শুরু করেছে।
দেখতে দেখতে ফ্রান্সিস ফলি ও সফট সেন্টারকে পিছে ফেলে ডেসমন্ড ডিলাইটকে ধাওয়া করল ওটা, রানীমার ঘোড়ার সাথে সমান সমান তখন ডিলাইট। শেষ চক্কর ঘুরল ব্লু প্রথম দুটোর সামান্য পিছনে থেকে—চমকের তখনও বাকি ছিল, এবার তা চাক্ষুস করল দর্শক। বাঁকটা ঘুরেই পেট প্রায় মাটির সাথে ঠেকিয়ে দৌড় শুরু করল ব্লু, এককে লাফে অন্যগুলো যতটা দূরত্ব পার হচ্ছে, ওটা তার কম করেও সিকি গুণ বেশি অতিক্রম করছে।
তুমুল হাততালি আর আকাশ ফাটানো হৈ-হৈর মধ্যে শেষ পাঁচশো গজের ভেতরে ডিলাইট ও রানীমার ঘোড়াকে প্রায় অনায়াসে পিছনে ফেলে দিল ওটা। মুহূর্তে দাঁড়িয়ে গেল গ্যালারি, দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে উন্মত্তের মত চিৎকার শুরু করে দিল কয়েক হাজার দর্শক। চায়না ব্লু শেষ লাইন অতিক্রম করামাত্র ছাগলের বাচ্চার মত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রজার সাইমুর, খুশির চেয়ে গর্ব আর অহঙ্কার বেশি ফুটেছে তার চেহারায়।
'ও পেরেছে!' প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বলল রোজালিন। 'ব্লু জিতেছে! আমাদের ব্লু জিতেছে।'
'ওয়েল, মিস্টার রানা,' বক্সের উত্তেজনা প্রশমিত হতে হাসল বিজ্ঞানী। 'কেমন লাগছে আপনার?'
'এইমাত্র আপনার চায়না ব্লু পনেরো হাজার পাউন্ড পাইয়ে দিল, কাজেই অনুমান করে নিন,' হেসে জবাব দিল ও।
ব্যস্ত হয়ে উঠল লেয়ার্ড অভ ম্যারকান্ডি। 'এবার যেতে হয়। যদি কখনও স্কটল্যান্ড আসেন, আমার সাথে অবশ্যই দেখা করবেন, খুশি হব।' নিজের একটা কার্ড ধরিয়ে দিল সে ওর হাতে।
ওটা পড়ে আবার হাসল রানা। এবার চওড়া। 'আরেক দৈব-সংযোগ দেখছি! ইন ফ্যাক্ট ক'দিন পরই স্কটল্যান্ড যাওয়ার কথা আমার।'
শীতল চাউনি আরও শীতল হয়ে উঠল বৃদ্ধের। 'বেড়াতে, না কাজে? করেন

কি আপনি?'

'এক সময় সৈনিক ছিলাম। বর্তমানে মার্সেনারি।'

ভুরু তুলে ওকে দেখল সে। 'ওয়েল, ওয়েল! এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল হাজির!'

'অর্থাৎ?' প্রশ্ন করল রানা।

'আগে বলুন ওখানে কেন যাচ্ছেন, কাজে?'

'মূলত বেড়াতে। তবে কাজ-টাজ যদি জুটে যায়...'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। 'কি ধরনের কাজ?'

'আমার প্রফেশন তো শুনলেনই,' পকেট থেকে সিগারেট বের করল রানা। 'কন্ট্রাক্ট বিজনেস আর কি! অবশ্য যা দিনকাল পড়েছে, তাতে কাজ পাওয়া একটু কঠিন হয়ে পড়েছে আমাদের।'

ওর বাহু আঁকড়ে ধরে একপাশে টেনে নিয়ে এল বিজ্ঞানী। 'আপনি আমার ওখানে এলে আমি হয়তো এক-আধটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারব,' চাপা গলায় বলল। 'আমার অনেক বড় এস্টেট, প্রচুর কাজ ওখানে। আর...সেসব যদি পছন্দ না হয়, অন্য কাজও জোগাড় করে দিতে পারব। চলে আসুন।'

'আপনার এস্টেট!' চেহারায় বিস্ময় ফোটাল ও।

'আমার কার্ডটা পড়েননি বোধহয় ভাল করে,' অসন্তুষ্ট হলো যেন বৃদ্ধ। 'আমি লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি।'

'সরি!' অপ্রস্তুত চেহারা করে পকেট থেকে কার্ডটা বের করতে যাচ্ছিল রানা, বিজ্ঞানী বাধা দিল।

'থাক এখন, পরে দেখে নেবেন। আমাকে এখন যেতে হয়, চায়না ব্লুকে অভিনন্দন জানানো হয়নি, মন খারাপ করবে ওটা। আপাতত কিছুদিন ফ্রী আছি আমি, সময় নষ্ট না করে চলে আসুন। ওখানে ভালই লাগবে আপনার। আয়ও প্রচুর হবে, নিশ্চিত থাকুন।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে মাথা ঝাঁকাল ও। 'আচ্ছা, বেশ।'

মেয়েদের দিকে ঘুরল রজার সাইমুর। 'চলো, যাওয়া যাক্। মিস্টার রানা খুব শীঘ্রি আমাদের ক্যাসেলে আসছেন।' শেষ বাক্যটা প্রায় নির্দেশের মত ঠেকল রানার কানে।

মে হরোইৎজ কিছু বলল না, নীরবে হ্যান্ডশেক করে মনকাড়া এক চিলতে হাসি দিয়ে বুঝিয়ে দিল কথাটা সত্যি হলে সে খুশি হবে। রোজালিন নেকলেস 'উদ্ধার' করে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে রানাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওর পৌঁছার অপেক্ষায় থাকবে জানাল।

বিজ্ঞানী ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে বক্স থেকে, স্বভাবসুলভ ব্যস্ত, ছোট ছোট পায়ে করিডর ধরে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে। আর একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি লোকটা।

রানাও বেরিয়ে এল বক্স থেকে। ফিল্ডগ্লাসের একটা চামড়ার স্ট্র্যাপ বুড়ো আঙুলের ভাঁজে ধরে কার পার্কের দিকে এগোল। বের হওয়ার পথে বাজীর টাকা নিতে ভুলল না। আট পারসেন্ট বেটিঙ ট্যাক্স আর বুকমেকারের কমিশন শোধ

করে রসিদ নিল, তারপর লোকটাকে একটুকরো সবজান্তা মার্কা হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে এল।

চার

রজার সাইমুরকে বেশি একটা এগিয়ে থাকতে দেয়ার ইচ্ছে নেই রানার, ঠিক করেছে সে ক্যাসেলে ফিরে যাওয়ার পরপরই ওখানে হানা দেবে। তাই হোটেলে ফিরে গ্লাসগো সেন্ট্রাল হোটেলের রুম বুক করল ও ফোনে, জানিয়ে দিল কাল খুব ভোরে পৌঁছবে। পরের ফোনটা করল মারভিন লংফেলোর গোপন নম্বরে।

দিনের বাকি সময় সেঁটে ঘুম দিয়ে পার করল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল লম্বা ড্রাইভে। পথে অসংখ্য বিষয়ের সাথে চায়না ব্লুকে নিয়েও মাথা ঘামাল ও। ঘোড়াটার অপ্রত্যাশিত জয়ের পিছনে মূল কারণটা কি, ভাবতে ভাবতে একটা অনুমান পছন্দ হলো। আগের রেসগুলোয় জকি নিশ্চই ওটার গতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল–জিততে দেয়নি। তার মানে ব্লুর গতি সম্পর্কে অন্যদের গোল্ড কাপের আগে পর্যন্ত কাউকে বুঝতে দিতে চায়নি রজার সাইমুর।

দেখা যাক, চিন্তার বিষয় বদলানোর আগে ভাবল রানা, এর আর কোন জবাব পাওয়া যায় কি না সাইমুর ক্যাসেলে।

সারারাত তুমুল গতিতে গাড়ি ছোটাল ও অর্ডন্যান্স সার্ভে ম্যাপ চোখের সামনে রেখে। গ্লাসগো সেন্ট্রালে ভরপেট নাস্তা খেয়ে যখন কফির কাপে চুমুক দিল, রুমের ওয়াল ক্লক ন'টার সঙ্কেত দিল তখন। এরপর দরজার বাইরে 'ডু নট ডিসটার্ব' সাইন ঝুলিয়ে আরেক দফা লম্বা ঘুম দিল রানা। এক ঘুমে সন্ধে সাতটা বাজিয়ে উঠল। হোটেলের নামকরা ম্যালমাইসন রেস্টুরেন্টে সাপার সারল। স্কটল্যান্ডের সেরা ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্ট। কিন্তু রানা খেলো হালকা-স্মোকড স্যামন, গ্রীন স্যালাড আর কড়া কালো কফি। রাতে আবার পথে নামতে হবে, ভারী খাবার খেয়ে অস্বস্তিতে পড়তে চায় না।

সাড়ে দশটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ও, এ-৮২ মোটরওয়ে ধরে উত্তরে ছুটল, উপকূল ঘেঁষা অজস্র লচ-এর উদ্দেশে। ভোরের একটু আগে লচ লোমন্ড হয়ে লচ গ্যারি পৌঁছল। দিনটা ওখানে কাটিয়ে রাতে আবার রওনা হলো এ-৮৭ ধরে, লচ ক্যারলের গভীর পাইন বনে পৌঁছল পরদিন ভোর সোয়া চারটায়। এখান থেকে মারকান্ডির সাইমুর ক্যাসেল কাছেই, মাত্র সত্তর মিনিটের ড্রাইভ। কিন্তু এখনই গিয়ে হাজির হতে চায় না রানা–আগে দূর থেকে ওটার ওপর রাতের আঁধারে নজর বোলানোর ইচ্ছে আছে।

বনের আরও গভীরে গাড়ি নিয়ে এল ও। বিএসএসের বিশেষ গাড়ি এটা– স্যাব ৯০০ টার্বো, বুলেট প্রুফ বডি, মহাশক্তিধর এঞ্জিন। চারদিক দেখে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে পার্ক করল রানা, সঙ্গে নিয়ে আসা হালকা নাস্তা আর বোতলের পানি খেয়ে সীট অ্যাডজাস্ট করে ঘুমিয়ে পড়ল।

সূর্য ডোবার একটু আগে উঠল ও। চূড়ান্ত প্রস্তুতির কাজে লেগে পড়ল। বুট খুলে ব্রীফকেসের ভেতর থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে কোটের সাইড পকেটে রাখল। ওর মধ্যে মাত্র ছয়টা সিগারেট আসল, বাকি সব অর্ধেক আসল। ফিল্টার টিপের ওপরের প্রায় ইঞ্চিখানেক জায়গায় তামাক নেই, ওর বদলে অনেক যত্নের সাথে ফিট করা আছে প্রি-সেট ইলেকট্রনিক মাইক্রোবাগ। দুর্গে কাজে লাগতে পারে। টেপ ও মাইক্রো হেডসেটসহ ওগুলোর মিনি রিসিভার শুয়ে আছে ব্রীফকেসের ফলস্ কম্পার্টমেন্টে।

ওয়ালথার আগের জায়গাতেই আছে, এখনই প্রয়োজন নেই ওটার। মারকান্ডি পৌঁছে প্রথমে ও যা করতে যাচ্ছে, সে-জন্যে চাই বাউচ অ্যান্ড লম্ব কোম্পানীর নতুন আবিষ্কার স্ট্র্যাপ-অন নাইটফাইন্ডার হেডসেট। ওটা পাশের সীটে রেখে স্টার্ট দিল রানা। সূর্য তখন সবে ডুব দিয়েছে। বন থেকে বেরিয়ে রওনা হলো ও। ঠিক সত্তর মিনিটের মাথায় মারকান্ডি ঢুকল ছোট এক কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে। এখান থেকেই গ্রাম শুরু।

একটাই মাত্র রাস্তা–চমৎকার মসৃণ, কালো কার্পেটিং করা। দু'পাশে পরিচ্ছন্ন কটেজের সারি। আর আছে দুটো জেনারেল স্টোর, একটা ইন ও একটা গির্জা। ছোট নদীর পারে, বড়সড় এক উপত্যকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়ে উঠেছে মারকান্ডি। একেবারে শেষ মাথায় ছোট এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সাইমুর ক্যাসেল। খাড়া। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দূর থেকে ওটার টাওয়ারকে তর্জনীর মত লাগছে দেখতে। আঙুল তুলে শাসাচ্ছে যেন–অ্যাই, চুপ!

রাস্তায় মানুষজন একেবারেই নেই, বিরান। দুয়েকটা কটেজে আলো জ্বলছে। গির্জার ওপাশ থেকে V-র মত দুভাগ হয়ে গেছে রাস্তা, একটা গেছে সাইমুর ক্যাসেলে, অন্যটা তার সামান্য দূর দিয়ে শিলডিগ গ্রাম ঘুরে মোটরওয়ে এ ৮৯৬-এ গিয়ে মিশেছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা সাপের মত আঁকাবাঁকা, কালো রাস্তাটা। আরেক পাহাড়ের ওপর দিয়ে গেছে ওটা, প্রায় ক্যাসেলের বাউন্ডারি ওয়াল সমান উঁচু দিয়ে।

ওটা ধরেই এগোল রানা। নির্জন জায়গায় এসে গাড়ি থামিয়ে মাথার ওপর দিয়ে স্ট্র্যাপ গলিয়ে ইনফ্রা রেড নাইটফাইন্ডার জোড়া পরে নিল। দূরবীনেরই নতুন সংস্করণ জিনিসটা–দেখতে গগলসের মত। খাঁজকাটা পুরু প্লাস্টিক হোল্ডে ধরা দুই লেন্সের মাঝখানটা নাকের ওপর ঠিকমত বসিয়ে সামনে তাকাতেই দিনের মত পরিষ্কার দেখতে পেল ও সবকিছু। একেবারে ঝকঝকে।

হেডলাইট অফ করে এগোল এবার রানা। কোন প্রয়োজন নেই আলোর। প্রায় আধমাইল পেরিয়ে এসে দুর্গের পাশাপাশি এক জায়গায় থামল বড় এক ঝোপের আড়ালে। এখান থেকে নজর বোলাতে সুবিধে হবে। মনের মধ্যে খুঁত-খুঁত করছে। গ্রামের কেউ দেখেনি ওকে, তবু কেন যেন মনে হচ্ছে খবরটা গোপন নেই। কেউ না কেউ জেনে গেছে, হয়তো রজারের কানে পৌঁছেও গেছে এতক্ষণে সে খবর।

ভাবটাকে পাত্তা দিল না। গুরুত্ব দিলে এসব পেয়ে বসে। বেরিয়ে পড়ল ও গাড়ি থেকে। আড়মোড়া ভেঙে দুর্গের দিকে তাকাল। কম করেও এক মাইল দূরে

বিশাল এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। নাইটফাইন্ডারের পাল্লা পাঁচশো গজ, কাজেই ফিল্ডগ্লাসও প্রয়োজন হলো–ডবল লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকাল ও, এক লাফে সামনে চলে এল দুর্গ।

গ্র্যানিট পাথরের পুরু দেয়াল দিয়ে চারদিক ঘেরা ওটা। বয়সের ভারে কোথাও কোথাও ভেঙে পড়েছে দেয়াল, পরে আবার ইঁট দিয়ে মেরামত করা হয়েছে জায়গাগুলো। দুর্গের সামনের দিকে রানার বাঁয়ে, দেয়ালের চওড়া এক ফাঁকের সাথে মিশেছে এসে গ্রামের রাস্তা। পুরু স্টীলের রডের মজবুত গেট ওখানে–সম্ভবত বিদ্যুৎচালিত। ওটাই ভেতরে যাওয়া-আসার একমাত্র পথ।

দুর্গও মেরামত করা হয়েছে অনেক জায়গায়, তবে বাইরের চেহারা একই আছে মনে হলো রানার। বিশাল গথিক কাঠামো। সামনের পিলারওয়ালা বড় পোর্টিকোয় বেশ কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দুর্গের চারদিকে অনেকখানি জায়গাজুড়ে বিশাল বাগান। ভালই, ভাবল ও, রজার সাইমুর রাজার হালে আছে। দুর্গের পিছনদিকে, বেশ দূরে এক জায়গায় বড় এক পাথর আর পুরানো কাঠের স্তূপ দেখা গেল।

খুব সম্ভব দুর্গের অংশ, ভাবল রানা, রিকন্সট্রাকশনের সময় জমা করা হয়েছে। তার মানে কি বেশিদিন হয়নি কাজটা করিয়েছে বিজ্ঞানী? ভারী ড্রেপারের ওপাশে প্রায় প্রতিটি রুমে আলো জ্বলছে দুর্গে, কিন্তু মানুষজনের দেখা নেই। আর দেরি করা উচিত হবে না ভাবল রানা, এবার ফেরা দরকার। ফিল্ডগ্লাস নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই এল ওরা।

অভিজ্ঞ, পেশাদার শিকারীর নিঃশব্দ পদক্ষেপে–মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা নিশি প্রেতাত্মার মত। কিন্তু আসলে প্রেতাত্মা নয়। রানার চেয়ে কম করেও এক হাত লম্বা হবে দলের নেতা, পাশে প্রায় দ্বিগুণ। তার দু'পাশে আরও দুই দানব, তবে এ দুটো চওড়ায় যা, লম্বা তত নয়। একজনের গালে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি।

'সাইমুর ক্যাসেলের ওপর স্পাইং হচ্ছে?' কড়া স্কটিশ অ্যাকসেন্টে ঘেউ ঘেউ করে উঠল দানব।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' লোকটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল ও। 'ভুল বুঝেছ তুমি। আমি···' নাইটফাইন্ডার খোলার জন্যে হাত তুলেছিল, কিন্তু কাজ শুরুই করতে পারল না, দুই শক্তিশালী হাতে কোটের ল্যাপেল ধরে রানাকে শূন্যে তুলে ফেলল নেতা।

'পরে শুনব তোমার কথা। এখন চুপচাপ আমাদের সাথে এসো, কেমন?'

মেজাজ বিগড়ে গেল ওর, ঠিক এক ফুট সামনে ব্যাটার নাকটা চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করছে দেখে কপাল দিয়ে ধাঁই করে মেরে বসল গায়ের জোরে। গুঙিয়ে উঠল দানব, ওকে ছেড়ে নিজের নাক চেপে ধরে এক পা পিছিয়ে গেল। দু'চোখ জ্বলছে ভয়ঙ্কর রাগে। লোকটার আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্তের ধারা নামতে দেখে সন্তুষ্ট হলো রানা।

'আজ তোমার একদিন কি···' কাছেই নারীকণ্ঠের ডাক শুনে থেমে গেল দানব।

'পিটার! কোথায় তোমরা? কে ওখানে?'

শোনামাত্র মে হরোইৎজের গলা চিনতে পারল রানা। 'আমি রানা, মিস মে,' গলা চড়িয়ে বলল ও। 'অ্যাসকটে পরিচয় হয়েছিল আমাদের।'

প্রথম তিনজনের মতই মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো মেয়েটি, দ্রুত ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। 'মাই গড! এ যে সত্যি...এখানে কি করছেন আপনি, মিস্টার রানা?' বলে পিটারের দিকে তাকাল। 'কি হয়েছে তোমার?'

'এই লোক নাকে মেরেছে, মাথা দিয়ে,' রুমাল দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে বলল দানব। মুহূর্তে চেহারা পাল্টে গেল ওটার।

শব্দ করে হাসল মে। 'এই লোক, তোমাকে মেরেছে! বলো কি?'

'এ বোধহয় পোচার ভেবেছিল আমাকে,' রানা বলল। 'কলার ধরে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিয়েছিল। সরি। ভুলে ট্রেসপাস করে বসিনি তো?'

'না,' মাথা দোলাল সে হাসিমুখে তা করেননি। এটা সরকারী জায়গা।' ওর দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল। নাকে ম্যাডাম রোচাসের মিষ্টি সুবাস পেল রানা। 'আমরা এসেছি শিকার করতে। কিন্তু আপনি...এখানে কেন?'

'পথ হারিয়ে ফেলেছি,' সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল ও। এমন সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে নাইটফাইন্ডার জোড়া খুলল, যেন ওটা খুব সাধারণ কিছু, সবাই ব্যবহার করে। 'ক্যাসেলটা কোথায়, খুঁজছিলাম।'

ওপরে-নিচে মাথা দোলাল মে, যেন ও যে সত্যি বলছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। 'পেয়ে গেছেন নিশ্চই?'

'হ্যাঁ।'

ওর কাঁধে এক হাত রাখল সে। 'এবার ভেতরে যাবেন আশা করি? আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা।'

'অবশ্যই যাব। সেই জন্যেই তো এলাম।'

'চলুন তাহলে,'-বলে পিটারের দিকে তাকাল মে। 'আমি মিস্টার রানাকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা গাড়ি নিয়ে এসো। আজ আর শিকার করব না।' কথার ফাঁকে হাত বাড়িয়ে নাইটফাইন্ডারটা নিয়ে লোকটার হাতে তুলে দিল সে, রানা দেখেও না দেখার ভান করল।

কারে উঠে বসল রানা তাকে নিয়ে, ঘুরে গ্রামের পথে ফিরে চলল। 'সোজা যেতে থাকুন,' বলল মেয়েটি। 'গ্রামে পৌঁছে পথ দেখাব আমি।'

মাথা দুলিয়ে সামনে মন দিল ও। দু'মিনিট পর রিয়ার ভিউ মিররে একজোড়া আলো দেখা গেল, দ্রুত এগিয়ে আসছে। পিটার আসছে নিশ্চই। দুর্গের মেইন গেটে পৌঁছতে সংলগ্ন গার্ড হাউস থেকে এক গার্ড বেরিয়ে এসে খুলে দিল গেট। আগে কারের আরোহীদের দেখে নিতে ভুল হয়নি তার।

'এমনিতে ম্যানুয়ালি অপারেট করা হয় গেটটা,' যেন কথার কথা, এমন ভাবে বলল মে হরোইৎজ। 'তবে রাতে দুর্গের সবাই ফিরে এলে স্পেশাল লকিং সিস্টেম চালু করে দেয়া হয়। ইলেক্ট্রিক্যাল।'

এক আধটা মন্তব্য করা উচিত, তাই বলল রানা, 'আই সী!'

'বলা তো যায় না, কখন কোন বিপদ-আপদ ঘটে যায়! দুনিয়ার কোথাও এখন আর শান্তিতে থাকার উপায় নেই। আপনি আসায় খুব ভাল হলো, মিস্টার

রানা। নাকি মাসুদ বলে ডাকব?'

'রানা, প্লীজ!'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'যা বলছিলাম। এখানে তেমন গেস্ট আসে না। আপনি এসেছেন বলে খুশি হয়েছি।'

'ধন্যবাদ।'

দীর্ঘ ড্রাইভওয়ে পেরিয়ে ক্যাসেলের পিলার্‌ড্‌ পোর্চের নিচে এসে থামল রানা। প্রায় একই সাথে পাঁচ ফুট পিছনে ব্রেক কষল একটা ল্যান্ডরোভার, ভেতর থেকে নামল পিটার ও তার দুই সঙ্গী। এরমধ্যে ওদের নাম জানা হয়ে গেছে রানার, ফ্রেঞ্চ কাটের নাম নিক, অন্যটার ফ্রেড।

গাড়ি থেকে নেমে নিককে ডাকল মে হরোইৎজ। 'তুমি লেয়ার্ডকে খবর দাও। বলরে মিস্টার মাসুদ রানা এসেছেন।' রানার দিকে ফিরল। 'গাড়ির চাবি পিটারকে দিন, ও আপনার লাগেজ পৌঁছে দেবে ভেতরে।'

মাথা দোলাল রানা। মের বেখেয়ালের সুযোগ নিয়ে গাড়ি লক্‌ করে দিয়েছে এর মধ্যে। 'এখন থাক ওসব। পরে হবে।'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'বেশ।'

চোখের কোণে নড়াচড়া দেখে দুর্গের মূল দরজার দিকে ঘুরে তাকাল রানা। ভূচর পাখি রজার সাইমুর এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। রানাকে দেখামাত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার, তিড়িং বিড়িং করে প্রায় ছুটে এল। 'আরে, মিস্টার রানা যে! সত্যি এসেছেন তাহলে?' বলতে বলতে দানবের ওপর চোখ পড়ল তার। আঁতকে উঠল। 'গুড হেভেনস্‌। তোমার আবার কি হলো, পিটার?'

'আমারই ভুল,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা। 'বুঝতে না পেরে মেরে বসেছি। দুঃখিত, পিটার।'

ওর দিকে তাকালই না দানব। তখনও রক্ত মুছছে ভেজা রুমাল দিয়ে। মনিবের চোখে চোখ রেখে সমীহের সাথে বলল, 'আমি বুঝতে পারিনি ইনি আপনার গেস্ট, লেয়ার্ড। স্পাই বা পোচার হবে ভেবেছিলাম অদ্ভুত আচরণ করতে দেখে।'

'অ। ঠিক আছে, পরে শুনব। মিস্টার রানা, ওকে গাড়ির চাবি দিন, মালপত্র নিয়ে আসুক আপনার।'

এবারও ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল ও। খেয়াল করে হাসল বিজ্ঞানী। 'ঠিক আছে, থাকুক এখন। পরে হবে ওসব। চলুন।'

লোকটার সাথে দুর্গে ঢুকল রানা। মে আগে আগে হাঁটছে। 'ওর গায়ে হাত তোলা ঠিক হয়নি আপনার,' যেন নিজের সাথে আলাপ করছে, এমনভাবে বলল বৃদ্ধ। 'ও বড় ভয়ঙ্কর। সতর্ক থাকতে হবে আপনাকে।'

পাঁচ

ভেতরের সাজ-সজ্জা যে কোন আগন্তুকের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়ার মত। সম্পূর্ণ অন্য জগৎ যেন এটা, ভিক্টোরিয়ান গথিক নয়—একেবারে অত্যাধুনিক। বিশাল হলরুম, দামী কাঠের সার্কুলার সিঁড়ি আর সংলগ্ন গ্যালারি, সবকিছু ধপধপে সাদা, ভেতরের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে গা থেকে। বিশাল দরজাগুলোর রঙ কালো। মেঝেতে পুরু সাদা কার্পেট। হাঁটতে গিয়ে রানার মনে হলো নরম লন ধরে চলেছে ও।

চার দেয়ালের নিচের অংশে ছাড়া-ছাড়া ঝোলানো আছে পঞ্চ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীর বেশ কিছু সমরাস্ত্র—যুদ্ধ কুঠার, রনচা, ব্যাট'স উইঙ করসিকুয়েস, ওঅর ফর্কসহ শত্রুকে বিদ্ধ করার আরও অনেক শানিত, ভয়ঙ্কর অস্ত্র। আলোয় চক চক্ করছে সব।

পাখির ডানা মেলার মত চকিতে দু'হাত প্রসারিত করল রজার। 'আগেকার আর্মলের যুদ্ধের র মেটেরিয়াল, আমি সংগ্রহ করি এসব। হবি। অবশ্য ভালগুলো এখানে রাখিনি। রেখেছি অন্য জায়গায়।'

হলের মাঝখানে রাখা একটা সোনালী ধাতব টেবিল ইঙ্গিত করল সে। ওটার ওপর কাঁচের বাক্সে একটা খোলা পিস্তল বক্স দেখে কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বক্সের ভেতর একজোড়া ডুয়েলিঙ পিস্তল শুয়ে আছে। আটকোনা ব্যারেল।

গর্বের হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'আঠারোশো তেতাল্লিশের শেষ ইংলিশ ডুয়েলে মনরো আর ফসেট ব্যবহার করেছিল এ দুটো।' রানার ডানদিকটা দেখাল। 'মনরোর। ফসেটের মৃত্যুদূত।'

পিছিয়ে এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল রানা, দেয়ালের ওপরের অংশে নিয়মিত দূরত্বে ঝোলানো পেইন্টিঙগুলো দেখল।

'হ্যাঁ, পেইন্টিঙ সংগ্রহেরও শখ আছে আমার,' ওর অনুচ্চারিত প্রশ্নের জবাবে বলল লেয়ার্ড। 'ওটা পিকাসোর "ব্লু পিরিয়ড," আর ওটা মাতিসের "পিঙ্ক ন্যুড"।'

'অরিজিন্যাল?'

'অবশ্যই অরিজিন্যাল!' পাখি-নড করল সে। 'চলুন, গলা ভেজানো যাক্।' ওপরদিকে মুখ করে মের নাম ধরে হাঁক ছাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির মাথায় উদয় হলো মেয়েটি, যেন ডাকের জন্যে আড়ালে কোথাও অপেক্ষা করছিল। এ মুহূর্তে অবশ্য অন্য ড্রেসে দেখল তাকে রানা।

'শিকারের পোশাক ছাড়তে গিয়েছিলাম,' মৃদু হেসে কৈফিয়তের সুরে বলল মেয়েটি। নেমে এল রাজকীয় চালে। 'আপনাকে আলোয় দেখে খুশি হলাম, মিস্টার রানা। অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পাইনি তখন। আসুন, রোজালিনকেও খবর দিয়েছি, এখনই এসে পড়বে।'

'আমাকে মাফ করতে হবে,' রজার বলল। 'মেয়েদের সাথে গল্প করুন,

মিস্টার রানা। আমি দেখি পিটারের কি অবস্থা।'

ও কিছু বলার সময় পেল না, বাহু ধরে আলতো করে টান দিল মে। 'আসুন, ড্রইং রুমে গিয়ে বসি।'

ওরা পা বাড়াবার আগেই নেমে এল রোজালিন। রানার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল। 'মিস্টার রানা। হাউ নাইস অভ উই।'

সাদা সান্ধ্য ড্রেসে মেয়েটিকে অপ্সরীর মত লাগছে। ওর দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়তে ঝট্ করে ঘুরে তাকাল রানা। ওপরের গ্যালারিতে কারও মাথা আর পিঠের এদিকটা দেখতে পেল পলকের দশভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে, খুব দ্রুত একটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে চলে গেল লোকটা। চোখ কুঁচকে উঠল ওর–আরগুয়েলো! এখনও যায়নি সে?

'কি হলো, কি দেখছেন অমন করে?' প্রশ্ন করল মে।

'মনে হয় বেড়াল,' আনমনে বলল ও।

'ও, তা হবে। আসুন।'

যে রুমে ওকে নিয়ে আসা হলো, সেটাও বেশ লম্বা-চওড়া। অরনেটের উঁচু সিলিঙ। দেয়ালের রঙ শেল পিঙ্ক। রুমের ফার্নিচার সব চামড়া মোড়া পুরু গদির। দরজা-সোজা উল্টোদিকের দেয়ালের প্রায় পুরোটাই বিশাল এক পিকচার উইন্ডো। ঝলমলে আলোয় কাঁচের টিন্ট চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসের দেয়ালে আছে এই বিশেষ কাঁচ, তবে ওটার মত সবুজ ভাব নেই এটায়, আছে হালকা গোলাপী রঙের আভাস। এই জানালা দিয়ে বাইরের সব পরিষ্কার দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে ভেতরের আলোর আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। তাও আবছা। বুলেটপ্রুফ কাঁচ।

'কি দেব আপনাকে, মিস্টার রানা?' বলল মে।

'শ্যাম্পেন, সামান্য। অথবা ভদকা মার্টিনি।' রোজালিনের মুখোমুখি একটা সোফায় বসল ও। ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল লেয়ার্ড। ডানহাত দেহের পিছনে, রাগ রাগ চেহারা।

'পিটারকে খানিক মশলা দিয়ে এলাম, মিস্টার রানা,' বলল লোকটা। 'সরকারী জমিতে কেউ পোচিঙ করুক চাই স্প্যাইঙ, তাতে ওর কি? ও কেন দুর্ব্যবহার করবে তার সাথে?' তার চোখের তারায় বিপজ্জনক, শীতল লাভার নড়াচড়া দেখতে পেল রানা।

ডান হাতটা সামনে নিয়ে এল সে, মুঠোয় ধরা রানার নাইটফাইন্ডার। 'এটা আপনার?' প্রশ্নের সাথে পাখি-নড করল। 'চমৎকার খেলনা!'

'পেশার খাতিরে এসব রাখতে হয়,' বলল ও। 'আপনার আমন্ত্রণে আমি এসেছি ঠিকই, তবে নতুন কোথাও; বিশেষ করে এরকম জায়গায় ঢোকার আগে আমার ট্রেনিঙ...'

'আমি বুঝতে পেরেছি,' কয়েক পা এগিয়ে এল লেয়ার্ড। 'কৈফিয়ত দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার কাজের স্টাইল আমার পছন্দ হয়েছে।'

রোজালিন ঝুঁকে বসল। 'কি ওটা?'

'নাইটফাইন্ডার বলে জিনিসটাকে,' মের হাত থেকে পানীয়ের গ্লাস নিয়ে বলল

ও। 'রাতে গাড়ি ড্রাইভ করার বেলায় খুব কাজে লাগে।'
'মিস্টার রানা,' বলল বিজ্ঞানী। 'গাড়ির চাবিটা দিলে লাগেজ আপনার রুমে পৌঁছে দিতে পারে পিটার।'
ধারণাটা পছন্দ নয় ওর, লোকটাকে ওর অনুপস্থিতিতে গাড়িতে হাতড়াহাতড়ি করার সুযোগ দিতে চায় না। কিন্তু এখন না দিয়েও উপায় নেই। এমনিতেই বেকায়দা অবস্থায় ধরা পড়ে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি করে বসেছে ও এদের মনে, তার ওপর বারবার চাবি দেয়ার বিষয়টা এড়িয়ে গেলে তা আরও বাড়বে। কিন্তু রানা চায় উল্টোটা–রজার সাইমুরের বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। পকেটে হাত ভরে ওটা বের করল রানা, তুলে দিল তার হাতে।
প্রায় একই মুহূর্তে রুমে ঢুকল ট্রেইল কোট পরা আরেক প্রকাণ্ডদেহী। ভাব-ভঙ্গিতে তাকে বাটলার মনে হলো রানার। চাবিটা তাকে দিয়ে রজার বলল, 'পিটারকে বলো, মিস্টার রানার লাগেজ ইস্ট গেস্ট রুমে রেখে গাড়ি পার্ক করতে।'
কোন কথা না বলে চলে গেল লোকটা। ওর দিকে অমায়িক হাসি দিল বিজ্ঞানী। হাতের গ্লাস ইঙ্গিত করল। 'পান করুন। ডিনারের সময় হয়ে গেছে।'
চুমুক দিল রানা। ভাবছে অন্য কিছু। বৃদ্ধ আসার আগে পর্যন্ত বেশ সাবলীল ছিল রোজালিনের আচরণ, এখন কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আছে। কথা প্রায় বলছেই না। কেন! পনেরো মিনিট পর বাটলার এসে রানার চাবি তুলে দিল মনিবের হাতে। জানাল, তার নির্দেশ পালন করা হয়েছে। গোছা হাতে পেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো রানা। যদিও জানে না, আর কোন নির্দেশ ছিল কি না পিটারের ওপর। থাকলেও এখন তা জানার উপায় নেই, কাজেই চিন্তাটা মন থেকে দূর করে দিল।
একটু পর আবার এল বাটলার, ঘোষণা করল ডিনার রেডি। 'চলুন,' উঠে পড়ল মে হরোইৎজ।
হলরুমে বেরিয়ে এল ওরা। উল্টোদিকের ডাইনিং রুমে ঢুকল এসে। এটাও যথেষ্ট বড়, দেয়ালে হালকা রঙ। আট চেয়ারের লম্বা মেহগনি টেবিলে সাজানো রয়েছে ডিনারের প্রথম কোর্স। চামচ-কাঁটা সব রুপোর–জর্জিয়ান। টেবিলের প্রত্যেকটা জিনিসে দুটো করে সোনার চাকতি আঁকা। লেয়ার্ড অভ মারকন্ডির প্রতীক।
লবস্টার ককটেইল, চিকেন বেজড কনজোমি, বীফ রিব, বিখ্যাত স্কটিশ পুডিঙ, ক্রীম ক্রাউডি ও পনিরের রাজকীয় ডিনার খেলো রানা তৃপ্তির সঙ্গে। লেয়ার্ডের কুকের চমৎকার রান্নার প্রশংসা না করে পারল না। 'এ আর কি!' প্রশংসা মাথা পেতে নিয়ে বিনয়ের সাথে বলল বিজ্ঞানী। 'আপনি আজই পৌঁছবেন জানলে আয়োজন ভিন্ন হত। যা খেলেন, খুবই সাধারণ। ক'দিন থাকুন, তাহলে বুঝবেন আমার কুক কি জিনিস।'
মেয়েরা উঠে গেল। সিগার, কাটার, দেশলাই–সাজিয়ে আনা হলো একটা রুপার পাত্রে। কাটারও রুপোর। ওগুলো রেখে দুই পেশীবহুল সার্ভেন্টকে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাটলার। চুরুট নিল না রানা, লেয়ার্ডের অনুমতি নিয়ে সিগারেট

ধরাল।

'আমার প্রস্তাব তাহলে গ্রহণ করেছেন আপনি, মিস্টার রানা?' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল সে।

'হ্যাঁ, প্রথমটা।'

চোখ কুঁচকে উঠল বৃদ্ধের। 'অর্থাৎ?'

'বেড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝাতে চাইছি আমি,' হাসল রানা দুই টুকরো শীতল লাভার দিকে তাকিয়ে।

লেয়ার্ড হাসল শব্দ করে। 'আমি বোঝাতে চেয়েছি পরেরটা। কাজের কথা। আমি মানুষ চিনি, রানা। গন্ধ শুঁকে বলতে পারি কে কাজের মানুষ। প্রথম দেখার সময়ই আপনার মধ্যে কাজের মানুষের গন্ধ পেয়েছি আমি। ঠিক বলিনি?'

শ্রাগ করল ও। বেশি গরজ দেখাবার ইচ্ছে নেই।

'আপনি নিশ্চই নিজের ক্ষেত্রে ওস্তাদ। সতর্ক। এ ধরনের মার্সেনারির মৃত্যু সহজে আসে না। দুর্গে ঢোকার আগে আপনার দূর থেকে স্পাইং করার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি চাইলে আপনার উপযুক্ত একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারব আমি। দু'একদিন থাকুন, দেখুন।'

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল মাসুদ রানা, তারপর সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কাজটা কিভাবে সম্ভব হলো?'

ভুরু কুঁচকে উঠল বিজ্ঞানীর। 'কোন্টা?'

'গোল্ড কাপ রেসের কথা বলছি,' একঘেয়ে সুরে বলল ও। হাসি অনুপস্থিত চেহারায়। 'চায়না ব্লু জিতল কি করে?'

বিস্ময় ফুটল বৃদ্ধের চোখে-মুখে। 'কি করে আবার! ভাল ট্রেইনার আর ভাল ঘোড়া ছিল বলে!'

'নতুন ট্রেইনার?'

ফাঁদটা টের পেল না লেয়ার্ড। দ্রুত মাথা দোলাল। 'নাহ্!'

'ট্রেইনার পুরনো, ঘোড়াটাও রেসে অভিজ্ঞ, তবু আগের কোন রেসে জয়ের ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারেনি চায়না ব্লু। কেন? গতি নিয়ন্ত্রণে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনি জকিকে?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল লোকটা, চেহারায় অবিশ্বাস। হয়তো অস্বীকার করতে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে মত পাল্টাল কি ভেবে। চট্ করে উঠে পড়ল। 'আসুন। একটা জিনিস দেখাই।'

ডাইনিং রুমের শেষ মাথার এক বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, পকেট থেকে বড় এক গোছা চাবি বের করে খুলল ওটা। পিছনে দাঁড়ানো রানার দিকে ফিরে পাখি-নড করল। 'আসুন।'

ভেতরের আলোকিত, দীর্ঘ এক প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আরেক বন্ধ দরজার সামনে থামল বিজ্ঞানী। এটাও চাবি দিয়ে খুলল। এক মুহূর্ত পর বাস্কেটবল কোর্টের মত বড় এক রুমে ঢুকল রানা বিজ্ঞানীর পিছন পিছন। দুই দেয়ালে সিলিঙ সমান উঁচু র‍্যাকে ঠাসা দামী দামী বই। ঘরের মাঝখানে বড় এক মিলিটারি ডেস্ক, তার পিছনে গ্লাস কেবিনেট। বেশ কিছু অ্যান্টিক অস্ত্রশস্ত্র সাজানো আছে

ওর মধ্যে।

'আমার আপন ভুবন,' বলে ওর দিকে ফিরে হাসল বৃদ্ধ। 'সবাই এখানে আসতে পারে না। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে বলে এই দুর্লভ সম্মান দেয়া হলো।' ডেস্কের পিছনে বসে উল্টোদিকে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করে ডানদিকের ওপরের ড্রয়ার খুলল সে। ভেতরের এক ফোল্ডার থেকে দুটো ছবি বের করে ওর সামনে রাখল। দেখুন।'

দেখল রানা। দুটোই চায়না ব্লুর ছবি। বৃদ্ধ কি বোঝাতে চাইছে ধরতে না পেরে মুখ তুলল।

'কিছু বোঝেননি?'

মাথা দোলাল ও। 'ওয়েল, এই হচ্ছে আমার সিক্রেট। ওরা হচ্ছে দুই ভাই–যমজ। দেখতে অবিকল এক, দুটোকে একসঙ্গে না দেখলে কোন এক্সপার্টের সাধ্য নেই অন্য কিছু চিন্তা করার।' শ্রাগ করল সে। 'আমি একটা রেজিস্ট্রি করিয়েছি রেসের জন্যে, অন্যটার খবর কেউ জানে না। যমজদের ক্ষেত্রে একটা হয় দুর্বল, অন্যটা স্বাভাবিকভাবেই শক্তিশালী। আগের সব রেসে দুর্বলটাকে নামিয়েছি আমি।'

'গোল্ড কাপে নামিয়েছেন সবলটাকে?' লোকটার প্রতারণার কৌশল জেনে অবাক হলেও প্রকাশ করল না রানা।

'হ্যাঁ।' একটা ছবিতে টোকা দিল সে। 'এটাকে দেখেছেন আপনি রেসে। এটার স্ট্যামিনা অফুরন্ত, আর গতি তো নিজের চোখেই দেখলেন। যাক্, নিজের এই গোপন তথ্যটা আপনাকে কেন জানিয়েছি বুঝতে পারছেন?'

মাথা দোলাল রানা। 'বোধহয়।'

'হ্যাঁ। আমাদের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই আমি, তাই জানিয়েছি। যদি কখনও এ তথ্য ফাঁস হয়, কেউ আপনার মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না।'

'আমার মুখ থেকে ফাঁস হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।' পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল ও। লেয়ার্ড ছবি দুটো নিয়ে ফোল্ডারে ভরছে দেখে খুব দ্রুত হাত চালাল। একটা মাইক্রোবাগের অ্যাডহেসিভ লাগানো দিক টিপে লাগিয়ে দিল ডেস্কের তলায়, আরেক হাতে অকেজো সিগারেটটা কোটের সাইড পকেটে চালান করে দিল।

ড্রয়ারে তালা লাগিয়ে উঠল রজার সাইমুর। 'চলুন, রাত হয়েছে। বিশ্রাম দরকার আপনার।'

তাকে অনুসরণ করে হলরূমে এল রানা। মনের মধ্যে আরগুয়েলোর চিন্তা। কোথায় আছে লোকটা? কি করছে এখন ক্যাসেলে? হলরূমে মে আর রোজালিনের কাছ থেকে রাতের মত বিদায় নিল রানা। ঘুরে দাঁড়াবার আগে পরেরজনের উষ্ণ, বন্ধুসুলভ চাউনির মধ্যে কি যেন এক গোপন বার্তা আছে মনে হলো। কিছু যেন বলতে চাইছে। কি হতে পারে? নাকি ভুল দেখেছে ও? বিষয়টা নাড়াচাড়া করতে করতে বাটলারের পিছন পিছন নিজের রূমের দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। মনে মনে ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাইছে রিসিভারের কাছে।

সাইমুরের আপন ভুবনে আর কোন মীটিঙ বসে কি না জানতে হবে।

দুর্গের পুব প্রান্তের একটা বন্ধ দরজা মেলে ধরল বাটলার। গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল, 'ইস্ট গেস্ট রুম, স্যার।'

'ধন্যবাদ।'

'লাগেজের চাবি দেননি আপনি, স্যার,' বলল সে। 'দিলে কাপড়-চোপড় সব প্রেস করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে পারতাম।'

ঘুরে একটুরো হাসি উপহার দিল রানা। 'সরি, ভুল হয়ে গেছে। গুড নাইট...ইয়ে...'

'হ্যারি, স্যার।'

'গুড নাইট, হ্যারি।'

'গুড নাইট, স্যার।'

বেরিয়ে গেল লোকটা, গভীর 'ক্লিক্' শব্দে দরজা লেগে গেল। চোখ কুঁচকে উঠল রানার। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে হাতল ধরে ওটা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল। দরজা অনড়। আপাতত ও বন্দী, বুঝল রানা। নিশ্চই রিমোট কন্ট্রোল লকিং সিস্টেমের কাজ। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ও, তারপর ফিরে এল লাগেজের কাছে। দরজা নিয়ে ভাববার সময় নেই এখন।

রুমটার ওপর নজর বুলিয়ে নিল দ্রুত। এটাও বেশ বড়, চারদেয়ালের রঙ কালো। সিলিঙে এখানে ওখানে জ্বলছে কনসিল্ড্ বাতি–মৃদু আলো ছড়াচ্ছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট, কালো। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক খাট। বেডশীট ও পিলো কভার ধপধপে সাদা সিল্কের। দু'মাথায় চকচকে স্টীলের সেমি সার্কুলার প্যানেল। মৃদু আলো জ্বলছে তার মধ্যে। পায়ের প্যানেলের সাথে একদিকে সেট করা আছে কালার টিভি, অন্যদিকে স্টেরিও সিস্টেম।

মাথার কাছে বড় এক কনসোল। বেশ কয়েকটা সুইচ ওখানে। বোঝা গেল ওগুলো টিপে খাট ইচ্ছেমত ঘোরানো বা উঁচু-নিচু করান যায়। ব্রীফকেস নিয়ে বিছানায় বসল রানা। শার্ট-প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার–মোজাসহ অন্য সব বের করে খুব দ্রুত সাজিয়ে রাখল বাথরুমের দরজার কাছে দাঁড়ানো লম্বা ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে। কোট-টাই ইত্যাদি রাখল ওটার পাশের ক্লজিটে।

এরপর কেসের ফলস্ বটম থেকে বের করল খুদে এক রিসিভার/রেকর্ডার–এসটিআর ৪৪০, জিনিসটা লম্বায় ৮৪ ও পাশে ৫৫ মিলিমিটার মাত্র। ভেতরে সেট করা আছে পিচ্চি ক্যাসেট। সেটের সাথে একটা ফোম প্যাডেড মাইক্রো হেডসেটও আছে। বালিশের পাশে রেখে রিসিভার/রেকর্ডারের সুইচ অন করল রানা, পিনের মাথার মত ছোট্ট একটা লাল আলো জ্বলে উঠল। লেয়ার্ডের ভুবনে পেতে রাখা বাগ অ্যাকটিভেট হয়েছে। মেশিন রেডি, ওখানে এখন সামান্যতম শব্দ হলেও রেকর্ড করে নেবে, একইসাথে রানাও হেডসেটের সাহায্যে শুনতে পাবে সব।

ড্রেস পাল্টে রাতের পোশাক পরে বিছানায় বসল ও, কানে হেডসেট লাগিয়ে সিগারেট ধরাল–এবার অপেক্ষার পালা। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, একটা চাপা কাশির শব্দ কানে এল। কেউ ঢুকেছে লেয়ার্ডের স্টাডিতে। পরমুহূর্তে

লেয়ার্ডকে বলতে শুনল, 'এসো। দরজা লাগিয়ে দাও।'

দরজার বোল্ট লাগানো. একটুপর চেয়ারের নড়াচড়ার আওয়াজ হলো, তারপর আবার বলে উঠল সে, 'ডিনারের ব্যাপারে দুঃখিত। আগন্তুকের সামনে তোমার যাওয়া ঠিক হবে বলে মনে হয়নি আমার। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'না। কিন্তু লোকটা কে?' কড়া স্প্যানিশ অ্যাকসেন্টে বলল আরেকজন। মাথা দোলাল রানা আপনমনে।

'তেমন কেউ নয়,' বলল বিজ্ঞানী। 'তবে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। পিটারকে তো দেখছ, মগজ বলে কিছু নেই। ভাবছি আস্তে আস্তে একে ওর জায়গায় বসানো যায় কি না পরীক্ষা করে দেখব।'

'করে কি…?'

'মার্সেনারি। অ্যাসকটে হঠাৎ…'

'পরিচয় চেক করে শিওর হয়েছেন?'

'হয়ে নেব। লোকটার নাম, গাড়ির নাম্বার, অন্য সব ডিটেইল্স্ জানা হয়ে গেছে। ওসবের সূত্র ধরে আর সব তথ্যও জেনে যাব কালকের মধ্যে।'

হাসল রানা। কেউ যদি ওর পাসপোর্ট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কার রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদির সূত্র ধরে এগোবার চেষ্টা করে, যা জানবে, তার সাথে নাম ছাড়া অন্য কিছুর মিল পাবে না। মারভিন লংফেলো রানার কাভার ডোশিয়ে সাজিয়েছেন এভাবে–মাসুদ রানা, বাংলাদেশ আর্মির এক্স মেজর, রিটায়ার্ড। বর্তমানে মার্সেনারি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইত্যাদি ইত্যাদি।

লেয়ার্ড কথা বলছে তখনও। '…নিশ্চই! টেস্ট করব আমি লোকটাকে। পুরো নিশ্চিত হলে তবেই কাজের প্রস্তাব দেব। সে যাক্, তুমি তো কাল যাচ্ছ, যা যা বলেছি সব মনে আছে তো?'

'আছে, ওয়ারলক।' ওয়ারলক! ভাবল রানা, এ আবার কি ধরনের নাম? 'ইংল্যান্ড, ফ্রান্স আর জার্মানিতে আমার টীম রেডি, কোন সমস্যা নেই। লাইনে আছে ওরা, প্রয়োজন পড়লে যে কোন মুহূর্তে কথা বলতে পারব আমি। এখন শুধু যুক্তরাষ্ট্র বাকি।'

'কাল রাতের মধ্যে পৌছবে তুমি ওখানে?' প্রশ্ন করল বিজ্ঞানী।

'দুপুরের মধ্যে।'

দীর্ঘ নীরবতা। কাগজের খস্ খস্ শব্দ হচ্ছে। 'ওখানে তোমার যারা আছে, তাদের ব্যাপারে শিওর তুমি, প্যাট্রিক?'

'পুরোপুরি।'

'হুম! ওদের বলবে, সবদেশের সরকারকে চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেব আমি দাবি মেনে নেয়ার। যদি তা মানা না হয়, কাজ সারতে যেন এক সেকেন্ডও দেরি না করে, সঙ্গে সঙ্গে চালু করে দেবে কুলিঙ সিস্টেম।' একটু বিরতি। হাসল লেয়ার্ড। 'তবে সেসবের প্রয়োজন হবে না, আমি জানি। সব সরকারই বুঝবে আমার হুমকি কার্যকর হলে কি পরিণতি ঘটবে পৃথিবীর। জেনে রেখো, এটাই হবে প্রথম হুমকি, বিশ্বকে যার কাছে মাথা নত করতে হবে। করতেই হবে। নইলে…'

'অর্ধেক জনসংখ্যা ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবীর,' বিজ্ঞানীর হয়ে আরগুয়েলো

শেষ করল বাক্যটা।
স্থির হয়ে গেল মাসুদ রানা। কি দুষ্কর্ম ঘটাতে যাচ্ছে লোকটা?
'হ্যাঁ,' বলল সে। 'একদিনের মধ্যে দুটোর কাজ শেষ হবে তো?'
'অবশ্যই হবে। ইন্ডিয়ান পয়েন্ট ইউনিট থ্রীর লীডারের সঙ্গে গত সপ্তায় কথা বলেছি, এখন বাকি কেবল সান ওনোফ্রি ইউনিট ওয়ানের সাথে কথা বলা। চব্বিশ ঘণ্টা যথেষ্ট সময়। সেরে ফেলব এর মধ্যে।'
'গুড,' বলল রজার সাইমুর। 'তাহলে আসছে বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ সামার টাইম দুপুর বারোটায় কাজ শুরু করব আমি।'
'আরেকটা ব্যাপার...'
'কোনটা?' আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বৃদ্ধের কণ্ঠ।
'সময়মত সিগন্যাল দেবেন কি করে আপনি?'
খিক্-খিক্ করে হাসল সে। 'তোমার ওদের কাছে রিসিভার আছে, প্যাট্রিক। তোমার সাথেও আছে। ওগুলো অন রেখো সময়মত, বাকি দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দাও।'
'কিন্তু ওরা যদি রেডিও সিগন্যাল পিনপয়েন্ট করে ফেলে?'
'বলেছি তো, ওসব নিয়ে আমাকে ভাবতে দাও। তুমি তোমার কাজ নিয়ে মাথা ঘামাও। সব যেন...'
চাপা একটা ক্লিক্! শব্দে বিদ্যুৎপৃষ্ট হলো রানা, দরজার দিক থেকে এসেছে শব্দটা। ঝট করে ঘুরে তাকাল ও, দেখতে পেল ডোর হ্যান্ডেল নিচের দিকে নামছে একটু একটু করে। এক ঝটকায় হেডসেট খুলেই রেকর্ডারসহ ওটা ধাঁ করে বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিল ও, খাট থেকে নেমে দ্রুত এগোল দরজার দিকে। হাতল ধরে আচমকা এক টানে হাঁ করে খুলে ফেলল।
রুমের মধ্যে প্রায় উড়ে এসে দাঁড়াল রোজালিন। আরেকটু হলে পড়েই যেত, অন্য হাতে ধরে ফেলল ও চট্ করে। খুব দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে ঘুরল মেয়েটি, লাফ দিয়ে দরজার হাতল ধরল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। নিজের জায়গায় আপনাআপনি ফিরে গেছে দরজা—ক্লিক! শব্দে লেগে গেছে ইলেক্ট্রনিক লক্।
'যাহ্!' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল রোজালিনের, আহাম্মকের মত রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আটকা পড়ে গেলাম ভেতরে।'
নাইট গাউন পরা মেয়েটিকে দেখল ও। 'কেন?'
'এই দরজা ভেতর থেকে খোলে না, খোলে বাইরে থেকে,' ভয়ে ভয়ে বলল সে। 'সেফটি ইলেক্ট্রনিক লকিঙ সিস্টেম।'
'সে আমি আগেই বুঝেছি,' বলল রানা। 'বুঝিনি কেবল কাউকে খাতির করে ডেকে এনে ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা লক্ করে দেয়া কোন্ সিস্টেম।'
খোঁচা খেয়ে সুন্দর মুখটা কালো হয়ে উঠল তার। বিড়বিড় করে বলল, 'এ সব চাচার কাজ, মিস্টার রানা। আমি জানি না।' খানিক ইতস্তত করল। 'খোলা যাবে না মানে, যাবে, ইন্টারকমে জিরো ডায়াল করে সুইচবোর্ডকে বললে ওরা খুলে দেবে, অবশ্য যদি লেয়ার্ডের আপত্তি না থাকে।'
'তাহলে আর সমস্যা...' মেয়েটিকে মাথা নাড়তে দেখে থেমে গেল ও।

'সমস্যা আছে। নিয়ম অনুযায়ী সকালের আগে এ দরজা খুলবে না ওরা। যদি বিশেষ কোন কারণ দেখিয়ে খোলাতে চান আপনি, কেউ না কেউ আসবে, আমার আসার কথা জানাজানি হয়ে যাবে।'

গোপন সঙ্কেতটা তাহলে ঠিকই দেখেছিল তখন, ভাবল রানা।

'সাথে ইলেক্ট্রনিক চাবি থাকলে অবশ্য খোলা যেত ভেতর থেকে,' আবার বলল সে। 'কিন্তু আমার কাছে নেই ও জিনিস। দেয় না কখনও চাচা। দুটো মাত্র চাবি, একটা নিজের কাছে রাখে, অন্যটা থাকে মের কাছে। আমিও এখানে একরকম বন্দীই।'

'দুঃখিত।'

'একটা সিগারেট দেবেন?'

প্যাকেট থেকে দু'জনের জন্যে দুটো সিগারেট বের করল ও, রোজালিনেরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজে ধরাল। এটা কোন ফাঁদ নয় তো? ভাবছে রানা, লেয়ার্ড ওকে টেস্ট করবে বলছিল তখন আরগুয়েলোকে, এ তা নয় তো? 'আপনার কাছে চাবি না থাকার কারণ, মিস...'

'রোজ, প্লীজ!'

'ওকে, রোজ।' বিছানা ইঙ্গিত করল ও। 'দাঁড়িয়ে থেকে শুধু শুধু পা দুটোকে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? বোসো।'

'বরং ওটায় বসি,' রুমের অন্য প্রান্তের একটা আর্মচেয়ারের দিকে এগোল মেয়েটি। এক হাতে গাউনের পেছনটা সমান রেখে বসল পায়ের ওপর পা তুলে। নীরবে ওকে দেখতে থাকল রানা। 'মিস্টার...'

'শুধু রানা।'

অধৈর্যের মত মাথা দোলাল রোজালিন। 'তুমি নিশ্চই ভাবছ এতরাতে এই বেশে এখানে কেন এসেছি আমি?'

' "না" বললে মিথ্যে বলা হবে,' মুচকে হাসল ও।

'আমি জানি না কথাগুলো তোমাকে বলে কোন বিপদে পড়ব কি না। তবু এসেছি তোমার সেদিনের উপকারের কথা মনে রেখে। সেদিন যদি নেকলেসটা ফেরত না দিতে তুমি, মায়ের শেষ স্মৃতিচিহ্নটাও হাতছাড়া হয়ে যেত আমার আর সবকিছুর মত।'

চোখ কুঁচকে উঠল রানার। 'আর সবকিছু বলতে?'

'সবকিছু। আমার বাবার সম্পত্তির অংশ, আমার প্রাপ্য, সে-সব মীন করতে চাইছি আমি।'

'লেয়ার্ড সব কেড়ে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' করুণ হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'আমার বাবা-মাকেও।'

'মানে?'

'ঐতিহ্য অনুযায়ী এ পরিবারের বড় ছেলে হয় লেয়ার্ড। আমার বাবা ছিল চাচার বড়, অর্থলোভী রজারের তা পছন্দ হয়নি। তাই প্লেন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বাবা-মাকে মেরে ফেলেছে সে নিজের লেয়ার্ড হওয়ার পথ পরিষ্কার করার জন্যে।' খানিক বিরতি দিল সে। 'আমার কথা থাক। আমি এসেছিলাম তোমাকে সাবধান

করতে, রানা। চাচা যদি তোমাকে কোন কাজের প্রস্তাব দেয়, রাজি হয়ে যেয়ো না। বিপদে পড়ে যাবে।'

'কেন?'

'গত কিছুদিন থেকে আজব কিছু ঘটে চলেছে এ দুর্গে। চাচা আর মেকে খুব বেশি রকম ব্যস্ত মনে হচ্ছে আমার। বাইরের এক লোক প্রায়ই আসে, চাচা তাকে প্যাট্রিক নামে ডাকে। খুব সম্ভব স্প্যানিশ লোকটা, জানি না। অ্যাকসেন্ট শুনে মনে হয়। ভয় হচ্ছে চাচা বোধহয় ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু আমাকে তার প্রস্তাবে রাজি হতে নিষেধ করার কারণ কি?' আগুন নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেট ফেলে দিল রানা।

'কারণ আমার বিশ্বাস সে তোমাকে বিপজ্জনক কোন কাজের প্রস্তাব দেবে। তার গত কিছুদিনের আচরণ খুবই অস্বাভাবিক লেগেছে আমার। এতসব কি নিয়ে, কিছুই বুঝতে পারছি না। কি এক নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর সম্পর্কে চাচা আর মেকে আলোচনা করতে শুনি মাঝেমধ্যে, তাও পরিষ্কার না। শুনেছি অনেক টাকা লাগবে কাজ শেষ করতে। মনে হয় ওই কাজের সাথে তোমাকে জড়াতে চাইছে ওরা।'

'তুমি আমার পেশা জানো, রোজ,' বলল ও। 'আমার সব কাজেই অল্প-বিস্তর বিপদ থাকে। এটায় না হয় একটু বেশি বিপদই হবে, তাতে কি?'

অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখল মেয়েটি। তারপর মাথা দোলাল নিজের মনে। 'তোমাকে সতর্ক করা আমার কর্তব্য ভেবে এসেছিলাম আমি, রানা,' নিচু কণ্ঠে বলল। 'করে গেলাম। এরপর তুমি কি করবে সে তোমার ব্যাপার।'

'তুমি কি ভেবেছ ভয় পেয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যাব আমি, তোমাকে নিয়ে? সেই জন্যেই এসব বলতে এসেছ?' আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা।

'না, সেজন্যে আসিনি।' রাগের আভাস দেখা গেল তার চোখে। 'তুমি ভুল লাইনে ভাবছ।'

'একটু আগেই না বললে, তুমিও এখানে আমারই মত বন্দী?'

'বলেছি। তাতে কি? আর যে-ই হোক, আমি অন্তত এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারব না। লেয়ার্ড সে পথ রাখেনি।'

'কিরকম?'

'টাকা-পয়সা নিজের বলে কিছু নেই আমার। অ্যাকাডেমিক শিক্ষা নেই, সার্টিফিকেট নেই। ছোটবেলা থেকে পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী আর সবার মত সবকিছুতে চাকর বাকরের ওপর নির্ভর করে এসেছি। এক কাপ কফি পর্যন্ত তৈরি করতে পারি না। পালিয়ে গিয়ে কি করে খাব?'

'কাউকে বিয়ে করে…'

'সে পথও নেই আমার,' চেহারা বিষণ্ন হয়ে উঠল রোজালিনের।

'কেন?'

কয়েক মুহূর্ত সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল ও। তারপর যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে বলতে শুরু করল, 'অল্পবয়সে আমাদের এস্টেটের এক কর্মচারীর প্রেমে পড়েছিলাম। খুব ভাল ছিল ছেলেটা। একদিন ওর সাথে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় ধরা পড়লাম মের চোখে। সেদিনের পর ছেলেটা যে কোথায় চলে গেল, আজও পর্যন্ত

জানতে পারিনি আমি। আমার অনুমান ওকে মেরে ফেলেছে লেয়ার্ড।

'এরপর, চার বছর আগে একবার প্যারিস গেলাম তার সাথে। যে হোটেলে উঠলাম, তার বেভারিজ ম্যানেজার ছেলেটাকে পছন্দ হলো, ভালবাসলাম তাকে। কেউ যে ব্যাপারটা টের পেয়েছে, দু'জনের একজনও টের পাইনি। একদিন দুপুরে হোটেলের বাথরুমে ছেলেটার লাশ পাওয়া গেল। জবাই করে রেখে গেছে কেউ। শেষবার, দু'বছর আগে ভাল লাগল এক ইটালিয়ান ধনীর ছেলেকে,' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রোজালিন। 'একদিন সে-ও মরল।'

চুপ করে কি যেন ভাবল রানা খানিক। 'তার মানে যে তোমার কাছে এসেছে, তাকেই মরতে হয়েছে?'

নতমুখে ওপরে-নিচে মাথা দোলাল মেয়েটি।

উঠল ও। কাছে গিয়ে দুই বাহু ধরে দাঁড় করাল তাকে, কিছু বুঝে আগেই চট্ করে হালকা চুমু খেলো ঠোঁটে। 'আমি একবার ঝুঁকি নিয়ে দেখতে চাই কি পরিণতি হয় আমার।'

কিছুটা বিরক্তি, কিছুটা বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে রানাকে দেখল রোজালিন, মাথা ঝাঁকাল দ্রুত। 'আমি…আমি সত্যি বলছি, রানা।'

'আমি বিশ্বাস করেছি।'

'তারপরও…!'

'হ্যাঁ, তারপরও।'

'না, প্লীজ, ছাড়ো!' রাগ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হেসে উঠল সে। 'নেই নেই করেও অনেকদিন পর একটা আশা জেগেছে তোমাকে দেখে, হয়তো তুমিই আমার শেষ ভরসা। সুযোগটা নষ্ট হতে দিতে চাই না আমি, রানা। যদি সত্যি খারাপ কিছু ঘটে এখানে, যদি পালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তোমার, একমাত্র আমি পারব তোমাকে সাহায্য করতে।'

'যদি পরিস্থিতি সেরকম হয়,' গম্ভীর হলো ও। 'তোমার জন্যে ফিরে আসব আমি, রোজ। তোমাকে বের করে নিয়ে যেতে।'

এর মধ্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে রানা, সাইমুরের ইচ্ছেয় নয়, নিজের গরজেই এসেছে মেয়েটা দেখা করতে। রানাকে পরীক্ষা করতে হলে নিজের তরফের এত খবর জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না লেয়ার্ডের, বরং ভাইঝিকে দিয়ে রানার পেটের কথা বের করাবার চেষ্টা করত। কিন্তু ঘটছে উল্টো।

প্রয়োজন পড়লে দুর্গ থেকে পালিয়ে যাবে রানা, সেরকম পরিকল্পনাই আছে। যদি দেখা যায় আরগুয়েলোর সাথে সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটাবার পরিকল্পনা করছে লেয়ার্ড, তাহলে বেরিয়ে গিয়ে সাথের সিগন্যাল পেন দিয়ে সঙ্কেত দেবে বিএসএসকে। তারপর বিএসএসের নির্দেশ এয়ার বেজে পৌঁছতে যা দেরি, একযোগে আকাশে উঠবে চার-চারটে বোমারু, ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবে সাইমুর ক্যাসেল।

কিন্তু সে সব এখনই নয়। তার আগে রানাকে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে লেয়ার্ড কি পরিকল্পনা করছে।

'কিন্তু আগে আমাকে জানতে হবে তোমার চাচা আসলে কি কাজের প্রস্তাব

দিতে চাইছে,' কথার জের টেনে বলল ও। 'দেখি কাল কথা বলে। কি আলাপ হয়, পরে জানাব তোমাকে।'

'আচ্ছা,' মাথা কাত করে সায় দিল রোজালিন। 'তবে আমার মন বলছে, পালাতে হবে তোমাকে।'

'তুমি শিওর?'

'মোটামুটি। স্প্যানিশ যে লোকটার কথা বললাম, সে এখন দুর্গেই আছে। তোমার সামনে তাকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছে লেয়ার্ড। আমাকেও কড়া হুকুম দিয়েছে ভুলেও যেন তার কথা তোমার সামনে উচ্চারণ না করি।'

'হুঁম।'

'কাল ভোরে শুনেছি চলে যাবে সে চাচার কপ্টার নিয়ে।'

'কপ্টার!' এই জন্যেই, ভাবল রানা, এই জন্যেই বিএসএস এতদিনেও জানতে পারেনি ব্যাটা সবার অজান্তে কোন পথে বেরিয়ে যায় প্রতিবার।

'হ্যাঁ, প্রত্যেকবার ওটায় চড়েই যায় লোকটা।'

একই বিছানায় ঘুমাল ওরা মাঝে ভদ্র দূরত্ব রেখে। খুব ভোরে রোজালিনকে জাগিয়ে দিয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকস আর সোয়েট শার্ট পরে '()' ডায়াল করল রানা ইন্টারকমে। সুইচবোর্ডকে জানাল; ওর রুমের দরজা বাইরে থেকে খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করতে, খুলছে না, খুব সম্ভব জ্যাম হয়ে গেছে কোনভাবে। এক্সারসাইজ করতে বের হবে ও।

কাজ হলো। একটু পর খুলে গেল দরজা। সময়টা সম্ভবত লেয়ার্ডের অনুমতির জন্যে ব্যয় হয়েছে সুইচবোর্ডের। বাইরে এসে চারদিকে নজর বুলিয়ে দেখে নিল রানা, কেউ নেই দেখে ইঙ্গিতে বের হতে বলল রোজালিনকে। নিরাপদেই নিজের রুমে চলে গেল সে। রানা বের হলো এক্সারসাইজ করতে। ভোরের আলো সবে ফুটি ফুটি করছে তখন।

একটু পর দূরাগত এক কপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল।

ছয়

টানা এক ঘণ্টা জগিং করে ফিরে এল ও। মাথার মধ্যে আবোল-তাবোল চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। আরগুয়েলোর সাথে লেয়ার্ডের আলোচনার যতটা শুনেছে ও রাতে, তাতে মোটামুটি পরিষ্কার, বড় ধরনের কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাতে চলেছে সে আগামী বৃহস্পতিবার।

আমেরিকার যে দুটো জায়গার নাম শোনা গেছে, রানা জানে, ওখানে দুটো নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট আছে। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না ওগুলোই তার টার্গেট, কিন্তু ব্রিটেন, ফ্রান্স আর জার্মানির টার্গেট কোথায় কোথায়? আরগুয়েলোর লোকেরা কি ওসব প্ল্যান্টের সাথে জড়িত? নইলে কি করে কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দেবে ওরা সময়মত?

ওয়ারলক! ওয়ারলক কি ধরনের নাম হলো? ওইদিন ব্রিটিশ সামার টাইম দুপুর বারোটায় ফ্রান্স আর জার্মানিতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। আমেরিকার ইন্ডিয়ান পয়েন্ট ইউনিট থ্রীতে তখন বাজবে সকাল সাতটা, সান ওনোফ্রি ইউনিট ওয়ানে ভোর চারটে। ঠিক কি ঘটাবে তখন ওয়ারলক?

জানতে হবে, ঠিক করেছে ও। হাতে দু'দিন সময় আছে, এর মধ্যে ওয়ারলকের পরিকল্পনা জানতে হবে। কিন্তু কি করে?

রুমে ফিরে তীক্ষ্ণ চোখে ব্রীফকেসটা পরীক্ষা করল রানা। ঠিকই আছে দেখা গেল। হাত দেয়নি ওটায় লেয়ার্ড। নিশ্চিন্ত মনে আরও কিছুক্ষণ বুক ডন, ওঠবস ইত্যাদি করল। লম্বা সময় নিয়ে শাওয়ার-শেভ সেরে ঝরঝরে অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। লাইটওয়েট প্যাকসের সাথে ম্যাচিঙ বিজ শার্ট ও কর্ড অ্যানোরাক পরে নরম চামড়ার মোকাসিন পায়ে দিল।

তখনই টোকা পড়ল দরজায়। 'ইয়েস?'

পাল্লা ফাঁক করে উঁকি দিল বাটলার হ্যারি। 'গুড মর্নিং, স্যার। ব্রেকফাস্ট রেডি।'

'গুড মর্নিং। আসছি আমি।'

মে হরোইৎজ ও রোজালিনকে দেখল রানা ডাইনিঙ রুমে। লেয়ার্ড তখনও আসেনি। সাড়ম্বরে ওকে অভ্যর্থনা জানাল তারা। মের হাসি কালকের চেয়ে আজ আরও বেশি প্রাণবন্ত, প্রশস্ত মনে হলো রানার। ভেতরে আনন্দের বান ডেকেছে যেন। রোজালিন আগের মতই, তবে চাউনি একটু অন্যরকম। কিছু একটা আছে ওখানে–হয়তো···। রানার ভাবনায় বাধা দিয়ে রুমে ঢুকল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি।

রানাকে দেখে মনে হলো যেন ভারি সন্তুষ্ট হয়েছে। 'আপনার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, মিস্টার রানা, কারণ আজ বিকেল পর্যন্ত খুব ব্যস্ত থাকতে হবে আমাকে। আপনাকে সময় দিতে পারব না। হাতের কাজটা সেরে তবে আপনার সাথে বাকি আলোচনা সারব, কেমন? মেয়েদের সাথে গল্প করে সময়টা পার করুন, প্লীজ!'

'কোন অসুবিধে নেই, লেয়ার্ড,' বলল ও। 'আগের কাজ আগে নীতিতে বিশ্বাসী আমি।' আসলে সময়টা নিচ্ছে সে ওর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে, ভাবল রানা। ব্যাকগ্রাউন্ড যদি মনমত না হয়, তাহলে নিশ্চই আলোচনার পিছনে সময় নষ্ট করবে না।

'আমারও একই নীতি,' দুই কান পর্যন্ত হাসি দিল বৃদ্ধ পাখি নড়ের সাথে। 'আগে কাজ, তারপর আর সব।'

দুপুর পর্যন্ত বসেই কাটাল রানা। ভেতরের অস্থিরতা চেপে গল্প করল মে আর রোজালিনের সাথে। ওর আসর জমানো চুটকি শুনে হেসে খুন হলো দু'জনেই। চোখে দেখেনি রানা, তবে মনে হয়েছে পুরোটা সময় দরজার বাইরেই পাহারায় ছিল নিঃশব্দচারী বাটলার লোকটা। আর মে, এক মুহূর্তের জন্যেও বের হয়নি রুম ছেড়ে। রানা ও রোজালিন যাতে ঘনিষ্ঠ হতে না পারে, একান্ত কোন আলোচনা করতে না পারে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল মহিলার।

অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না রানাকে। বোঝা গেল, লেয়ার্ডের

খবর সংগ্রহের সূত্র যে-ই হোক খুবই কাজের মানুষ। দুপুরে খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্যে শুয়ে পড়েছিল ও, খানিক পর দরজায় ব্যস্ত টোকা শুনে উঠে পড়ল। স্বয়ং লেয়ার্ডকে দোরগোড়ায় দেখে বিস্মিত হলো। 'আমার কাজ শেষ,' চওড়া হাসি দিয়ে বলল লোকটা। 'ভাবলাম আপনার সাথে কাজের কথা এখনই সেরে ফেলি। অসুবিধে ঘটালাম না তো?'

'মোটেই না।'

'আসুন তাহলে। অন্য কিছু দেখাব এবার আপনাকে,' বলে ওর মতামতের অপেক্ষায় থাকল না সে, প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরে চলল।

হলরুম পেরিয়ে ড্রইংরুমের শেষ মাথায়, সার্কুলার স্টেয়ার কেসের নিচ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে এক কাঁচের সুইং ডোর হয়ে লম্বা করিডরে পড়ল রানা লেয়ার্ডকে অনুসরণ করে। এটা দুর্গের পুরনো অংশ, আধুনিক মেরামতির ছোঁয়া লাগেনি এদিকটায়। অর্ধেক করিডর পেরিয়ে ভারী এক ওক কাঠের দরজার সামনে থামল লেয়ার্ড। দরজার চার কিনারা পুরু স্টীল দিয়ে মোড়া। পকেট থেকে গোছা বের করে চাবি বাছাই করল সে, পটে ঢুকিয়ে দু'বার মোচড় দিয়ে খুলল। দীর্ঘদিনের বদ্ধ বাতাসের গন্ধ এসে ঝাপটা মারল নাকে।

ভেতরে একসার চওড়া ধাপের সিঁড়ি দেখল রানা, কত নিচে গিয়ে শেষ হয়েছে বুঝতে পারল না অবশ্য। কয়েকটা টিমটিমে গাইড লাইট আছে সিঁড়িতে, তাতে বেশিদূর দেখা যায় না। বিজ্ঞানীর ইঙ্গিতে তার পাশাপাশি নামতে শুরু করল ও। দশ-বারো ধাপ নেমে কথা বলে উঠল লোকটা।

'কাল আমার স্টাডি দেখেছেন আপনি, আজ দেখবেন দুর্গের খুবই ইন্টারেস্টিঙ আরেক অংশ। খুব পুরনো। সাইমুর বংশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষ বলা যায় জায়গাটাকে।'

নীরবে নামতে থাকল রানা। মনে হচ্ছে সোজা পাতালপুরীতে নেমে গেছে সিঁড়ি, শেষ নেই। অনেকক্ষণ পর সমতল মেঝেতে পৌঁছল দু'জনে। দেয়ালের গায়ে লাগানো একটা লিভার ধরে নিচের দিকে টান দিল লেয়ার্ড, আচমকা উজ্জ্বল আলোয় হেসে উঠল চারদিক। চোখ সয়ে আসতে পিট্ পিট্ করে তাকাল রানা। মেঝেটা পাথরের, আয়তাকার–বিশ বাই চল্লিশ হবে সম্ভবত। ওর নাক বরাবর সোজা একটা সরু প্যাসেজ, পাঁচ ফুটের মত চওড়া। পনেরো ফুট দীর্ঘ। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা।

ডানে-বাঁয়ে আরও দুটো দরজা। প্রথমটার চেয়ে বেশ চওড়া। সিলিঙ অনেক উঁচু এখানকার। সামনের দরজাটা দেখাল লেয়ার্ড। 'ওটা দুর্গের প্রাচীন গুপ্ত পাতালপুরীতে যাওয়ার পথ,' বলে হাসল। 'মাঝে মধ্যে ব্যবহার হয় আজকাল। আমাদের ডানের রুমটা টর্চার চেম্বার। আসুন, দেখবেন ভেতরটা।'

কেন ও-রুম দেখানোর প্রয়োজন পড়ল বুঝেও না বোঝার ভান করল রানা। ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়ল লোকটা। ভেতরের বাতাস আরও ভারী, গুমোট লাগল ওর, নাক কুঁচকে উঠল আপনাআপনি। ভেতরে যা দেখল, সবই প্রাচীন, মানুষ মারা যন্ত্র। চাবুক, কাঁটার মুকুট, নখ উপড়ানোর পিলে চমকানো সাইজের সাঁড়াশী, জ্বলন্ত কয়লা রাখার তাওয়া, লোহার বুটসহ আরও অসংখ্য

হাবিজাবি। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়ল ওর লোহার বুট। কম করেও দেড় মন ওজন হবে একেকটার।

'এর সবই পুরনো স্কটিশ প্লেজারের অংশ, মিস্টার মাসুদ রানা। বিদ্রোহী প্রজাদের প্রাণদণ্ড দেয়া হলে ওই বুট পরিয়ে ফেলে দেয়া হত পাহাড় থেকে,' শ্রাগ করল লেয়ার্ড। 'বুঝুন, কি অবস্থা হত তার। একটা হাড়ও আস্ত থাকত না।'

'ভয়ঙ্কর ব্যাপার!' শিউরে ওঠার ভান করল রানা। এসবের সাথে একেবারে অপরিচিত নয় ও, জানে কোনটার কি কাজ। কোন কোনটার নির্যাতন সইবার অভিজ্ঞতাও আছে। সামনে তাকাল ও। রুমের শেষ মাথায় কিছু একটা দেখে মুহূর্তের জন্যে রক্ত হিম হয়ে গেল।

এক কোণায় সম্ভবত পরে তৈরি করা ছোট একটা সাব-রুম, সামনেরদিকটা উন্মুক্ত। ভেতরের তিন দেয়াল সাদা টাইলের। তার মাঝখানে আধুনিক এক অপারেটিঙ টেবিল, ওপাশে বড় এক কাঁচের কেবিনেট। ভেতরে চক্‌চক্ করছে নানান যন্ত্রপাতি–সিরিঞ্জ, ইঞ্জেকশন। মানুষকে জ্যান্ত মারার জিনিস সব।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল লেয়ার্ড। শব্দ করে হাসল। 'দেখতেই পাচ্ছেন, ওরা প্রাচীন নয়, অত্যাধুনিক। যুগের সাথে নির্যাতনের মাধ্যমও বদলে গেছে কি না! মাঝেমধ্যে কাজে লাগে রুমটা।' পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে উঠল। 'আমার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দেয়ার আগে এসব কেন দেখাচ্ছি আপনাকে জানেন? আপনাকে সতর্ক করতে। যাকে কাজে নিয়োগ করি, তার কাছ থেকে কমপ্লিট লয়্যালটি চাই আমি, আপনার বেলায়ও চাইব। তাই দেখালাম। আমার নির্দেশের অন্যথা হলে এখানে আসতে হয় সবাইকে,' শেষ বাক্যটা আরেকদিকে ফিরে বলল সে। যেন ওকে নয়, অন্য কাউকে বলছে।

'আসুন,' বলে হাঁটা ধরল লোকটা। আয়তাকার জায়গাটা পেরিয়ে উল্টোদিকের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। এটায় তালা মারা। তালা খুলে দরজা মেলে ধরল সে, পাখি-নড করে আবার বলল, 'আসুন। এটা আমার অপারেশন রুম।'

আগেরটার প্রায় দ্বিগুণ বড় এটা। সিলিঙ নিচু, দেয়ালে ধূসর রঙ। প্রাচীন আমল থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের প্রায় সব ধরনের ফায়ার আর্মসের মেলা বসিয়েছে এ রুমে লেয়ার্ড। সব শৈল্পিক নিপুণতায় দেয়ালে ঝোলানো। ছুরি, চাকু, চমৎকার কারুকাজ করা ঢাল-তরবারী, ক্রস বো, হুইল-লক্ পিস্তল, ফ্লিন্ট-লক্ পিস্তল, মাস্কেটসহ আরও অনেক কিছু। রুমের ও মাথায় আছে অত্যাধুনিক অস্ত্রের সংগ্রহ–রাইফেল, সেমি অটো-কারবাইন, পিস্তল আর অটোম্যাটিক রাইফেল, মেশিন-পিস্তল ইত্যাদি।

লোকটাকে সামান্য খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারল না রানা। 'কোন থার্মোনিউক্লিয়ার ডিভাইস দেখছি না যে?' বলল হাল্কা সুরে।

ভুরু কোঁচকাল লেয়ার্ড। 'চেনেন সেসব?'

'দুই একটা,' শ্রাগ করল ও। 'ছবি দেখেছি।'

'আমি রাখিনি। প্রয়োজন নেই। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে ওসব, সবাইকে ধ্বংস করার জন্যে।'

মাথা দোলাল অন্যমনস্ক রানা। নজর পড়ে আছে শেষ মাথার কাঁচঘেরা পার্টিশনের ভেতরের বড় এক কনসোল ডেস্কের ওপর। কয়েকটা কম্পিউটার মনিটর, রেডিও ইকুইপমেন্ট প্রায় ঢেকে রেখেছে ডেস্কটাকে। তার পিছনের দেয়ালে ঝুলছে বিশাল এক ট্রান্সপ্যারেন্ট ওয়ার্ল্ডম্যাপ। ম্যাপের কয়েকটা জায়গা চায়নাগ্রাফের মার্কিং দেখে দু'চোখ দূরবীন হয়ে উঠতে চাইল রানার, কিন্তু কাজ হলো না। পড়ার উপায় নেই জায়গাগুলোর নাম।

ডেস্কের পিছনের এক সুইভেল চেয়ার দেখাল ওকে লেয়ার্ড। 'ওখানে বসে আমি একদিন পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করব, মিস্টার মাসুদ রানা,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'একদিন। খুব শিগগিরি।'

আরেকবার ম্যাপের ওপর দিয়ে ঘুরে এল ওর দৃষ্টি। আমেরিকার ম্যাপের দুই জায়গায় দুটো মার্কিঙ দেখা গেল–নিশ্চই ইন্ডিয়ান পয়েন্ট ইউনিট থ্রী, ভাবল ও। অন্যটা সান ওনোফ্রি পয়েন্ট ওয়ান, কোন সন্দেহ নেই। ইউরোপের দিকে নজর দিল। জ্বলজ্বলে মার্কিঙগুলো স্পষ্ট, তাছাড়া ওর জানা আছে কোন্ কোন্ দেশ ওগুলো, তাই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। তবে জায়গাগুলোর নাম পড়া সম্ভব হলো না।

ম্যাপ থেকে চোখ সরাতে প্রচণ্ড মনের জোর খাটাতে হলো ওকে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে সন্দেহ করে বসতে পারে লেয়ার্ড। ধীরে, নিজেকে বোঝাল রানা, ধীরে। ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, এতদূর যখন আসা গেছে, ভেতরের কিছুই অজানা থাকবে না।

'সত্যি?' হাসল ও।

'হাসবেন না, আমি হাসির কিছু বলিনি।' একটু থামল সে। 'আপনি জানেন আমি কে? আমার আসল পরিচয় কি?'

'জানি। আপনি ডক্টর রজার সাইমুর, লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি।'

নাক দিয়ে হাসল লোকটা। গাধা কিসিমের কারও ওই জাতীয় কথাবার্তা শুনে যেমন তাচ্ছিল্যের হাসি দেয় মানুষ, তেমনি। 'ওটা ছাড়াও আমার আরেকটা পরিচয় আছে। আমি সম্ভবত পৃথিবীর সর্বকালের সেরা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।'

'আচ্ছা!' অবাক হয়েছে যেন, এমনভাবে তাকাল ও।

সন্তুষ্ট হয়ে ওপরে-নিচে মাথা দোলাল লেয়ার্ড। 'হ্যাঁ। এবং যারা বর্তমান পদ্ধতির নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের অবলুপ্তি দাবি করছে, আমি তাদের দলে। কারণ ওগুলোর যে সিস্টেম, তা মোটেই নিরাপদ নয়। এর ভয়াবহ পরিণতি জেনেশুনেও চেপে রেখেছে সরকারগুলো, সাধারণ মানুষকে জানতে দিচ্ছে না। বরং যারা এ কথা বলতে গেছে, তাদের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে পাল্টা ব্যবস্থা নিয়েছে। আমার ব্যাপারেও তাই করেছে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, বাধ্য করেছে আমাকে চাকরি ছাড়তে। অথচ আমি যা করতে চেয়েছি, সারা বিশ্বের উপকার হবে জেনেই করতে চেয়েছি। আপনি জানেন বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কিভাবে?'

'জেনারেটরের সাহায্যে,' বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ও, যেন জানতে চায় উত্তরটা সঠিক হয়েছে কি না।

'ঠিক বলেছেন। এই জেনারেটর অপারেট করতে দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার

হয়। হাইড্রোইলেক্ট্রিক প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে পানি, অন্য আর সব প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে ফুটন্ত পানির বাষ্প। পরের ক্ষেত্রে তেল, কয়লা বা গ্যাসের সাহায্যে ফোটানো হয় পানি—কখনও নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর কোরের মাধ্যমেও।' হাসল বিজ্ঞানী। 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মাধ্যমে পানি ফোটানো...খুব খরচবহুল মনে হয় না আপনার?'

ওর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে খুক্ করে কাশল সে। 'খুবই খরচবহুল। অকল্পনীয় খরচ হয় এতে, জনগণের ট্যাক্সের টাকার শ্রাদ্ধ হয়। এই সিস্টেমকে প্রফেসর লোভিন আখ্যা দিয়েছিলেন "মাখন কাটতে করাত ব্যবহার"। নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরের মূল সমস্যা হচ্ছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। গত কয়েক দশক ধরে যে পদ্ধতির রিঅ্যাক্টর কাজ করছে বিভিন্ন দেশে, এই সমস্যা তার প্রত্যেকটিতে আছে। এরমধ্যে অনেকগুলো দুর্ঘটনাও ঘটিয়েছে কোন কোনটা। প্রথম ধরুন বাহান্ন সালের কথা, ওন্টারিওর চক রিভার প্ল্যান্টে দুর্ঘটনা ঘটে সেবার। তারপর পঞ্চান্ন সালে আইডাহো ফলস, সাতান্ন সালে ইংল্যান্ডের উইন্ডস্কেল, আটান্নতে আবার চক রিভার, সত্তর সালে ইলিনয়, একাত্তরে মিনেসোটা, পঁচাত্তরে আলবামা, ছিয়াত্তরে ভারমন্ট, তারপর চেরনোবিল, আর কত দুর্ঘটনার কথা বলব? সোভিয়েত ইউনিয়নের কিশতিম ক্যাটাস্ট্রফের কথা জানেন, ইউরালে পারমাণবিক বর্জ্য ডাম্প করতে গিয়ে কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়ে বসেছিল ওরা? প্রচণ্ড বিস্ফোরণে কত প্রাণহানি ঘটেছে সে দুর্ঘটনায়, জানেন?

'এত ঘটনার পরও কোন সরকারের কানে পানি যায়নি, সেই পুরনো, বিপজ্জনক পদ্ধতি আঁকড়ে ধরে আছে তারা। মুখ খুলতে রাজি নয়। সাতাত্তরে কার্টার প্রশাসন এ ব্যাপারে কিছুটা মুখ খুলেছিল অবশ্য। হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিল, দু'হাজার দুই সালের মধ্যে এ পদ্ধতির রিঅ্যাক্টরের কোর ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করবে বিশ্বে। গলে যাবে। অনুমান করতে পারেন কোর গলে গেলে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটবে?'

চোখ কুঁচকে মাথা দোলাল রানা। 'জেন ফন্ডার এক ছবিতে কি যেন দেখেছিলাম একবার, চায়নাসিনড্রোম, না কি যেন। সে ধরনের কিছু?'

'আসুন,' ডেস্কের দিকে পা বাড়াল বিজ্ঞানী। 'বসে কথা বলি।'

ম্যাপটার অনেক কাছে আসতে পেরে স্বস্তি অনুভব করল ও। তখনই অবশ্য চোখ তুলল না। 'কি, বলছিলাম যেন? ও হ্যাঁ, কোর মেল্টডাউনের ব্যাপারে,' সুইভেল চেয়ারে বসে আবার শুরু করল লেয়ার্ড। 'এই কোরের সাহায্যেই নিউক্লিয়ার প্যান্ট তাপ উৎপাদন করে, ইনরমাস হীট। কন্ট্রোলড্ চেইন সিস্টেম। সিস্টেম যতক্ষণ কন্ট্রোলে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু,' বলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে। '...যদি রিঅ্যাক্টরের কূলিঙ সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দেয়, যদি কোন পাইপ ফুটো হয়ে যায়, তাহলে সমূহ বিপদ। সিস্টেম অকেজো হয়ে যাবে, অথচ কোর তার তাপ উৎপাদন ঠিকই চালু রাখবে। তাপ যত অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়বে ততই রেডিওঅ্যাকটিভিটি উৎপন্ন হবে, সব মিলিয়ে একসময় ফল হবে দর্শনীয়।

'দর্শনীয়?' চোখ কুঁচকে উঠল রানার।

'কথার কথা আর কি! এক মার্কিন কবি বলেছিলেন, "দিস ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ডস, নট উইদ আ ব্যাঙ বাট আ হুইম্পার"। ঠিক তাই হবে। সামান্য ভূমিকম্প, দূরাগত মেঘের গুড় গুড় ডাক, তারপর শুরু হবে মাটির আড়মোড়া ভাঙা। রেডিওঅ্যাকটিভ ভস্ম ভেসে পড়বে বাতাসে। আর কোর এতই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে যে তা ঠেকানোর কোন উপায়ই থাকবে না। মাটি, পাথর, ধাতু, কিছুই পারবে না সে-উত্তাপ ঠেকাতে। যে-কোন প্ল্যান্টে যে-কোনদিন এ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, মিস্টার মাসুদ রানা।

'এবং একমাত্র আমি পারি তা ঠেকাতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সরকার আমাকে সে সুযোগ দিতে রাজি নয়। তাই ঠিক করেছি,' কড়া চোখে রানাকে দেখল বিজ্ঞানী। স্পৃথিবীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব আমি, ওরা কতবড় ভুল পথে চলছে। একই সাথে আমার তৈরি সিস্টেম কতখানি নিরাপদ, তাও দেখাব। নিশ্চই এ জন্যে আমাকে দায়ী করতে পারেন না আপনি?'

মানুষটা দাম্ভিক তো বটেই, ভাবল রানা, উন্মাদও। ফ্যানাটিক। আন্তর্জাতিক অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের আর সব সদস্য যেন ছাগল, কিছুই বোঝে না। বোঝে কেবল রজার সাইমুর। একা এরই আছে দুনিয়ার মানুষের ভালর চিন্তা, আর কারও নেই।

'না,' মাথা দোলাল রানা। 'আপনি যা বলছেন, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না।'

'যদি?' তিড়িঙ করে লাফিয়ে উঠল বিজ্ঞানী, প্রায় চিৎকার করে বলল, 'যদি মানে? কি বলতে চান আপনি? এ ব্যাপারে কতটুকু জ্ঞান আপনার, রানা? কি বোঝেন?' ধুম্ করে কিল মেরে বসল ডেস্কে। 'আমি বলছি আমি যা করতে যাচ্ছি তা শতকরা একশো ভাগ নিরাপদ। আমি করে দেখাব হারামজাদা পলিটিশিয়ানদের। আমাকে অবহেলা করার জন্যে সব ব্যাটাকে আমার পায়ের সামনে নাকে খৎ দেয়াব, অপেক্ষা করুন।'

চুপ করে থাকল ও। এরমধ্যে দু'বার চোরা নজরে ম্যাপ দেখে নিয়েছে, ইওরোপের মার্কিংগুলো কোথায় কোথায়, জানা হয়ে গেছে। ইংল্যান্ডেরটা হেইশাম–তার পাশে লেখা এক। ফ্রান্সের লোকেশনের নাম সেইন্ট-লরেন্ট-দ-ইয়ক্স–দুই। জার্মানিতে আছে দুটো লোকেশন। একটা পুবে, রাশিয়ার ঘাড়ের ওপর–নর্ড টু-টু। অন্যটা পশ্চিমের এসেন্সহ্যামে। নামগুলো মস্তিষ্কে ঢুকে নিল রানা। অপারেশন কমপ্লিট, ভাবল। কোনরকমে বিএসএসে খবরটা পৌঁছে দিলেই খেল্ খতম হয়ে যাবে রজার সাইমুরের।

কিন্তু রাখো, এখনই নয়। সময় যখন আছে, আরেকটু খোশগল্প করতে বাধা কোথায়? চলছে চলুক না!

'কাজ হাসিল করতে এক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছি আমি। ওদের শিক্ষা দেয়া এবং প্রয়োজনীয় ফান্ড জোগাড় করা, দুটোই হবে।'

'কি করে?' প্রশ্ন করল রানা। ভেবেছিল মেজাজ এ মুহূর্তে গরম আছে ব্যাটার, গড়গড় করে সব বলে যাবে, কিন্তু হলো না তা।

'পুরো ব্যাপারটা একটু জটিল, মিস্টার রানা,' পাশ কাটিয়ে গেল সে। 'তার

সাথে এখনই আপনাকে জড়াতে চাই না। আপনি অন্য একটা কাজ করবেন আমার হয়ে।'

'সেটা কি?'

'অপারেশন শেষ হলে আমার বিরুদ্ধে কোন দেশের সরকার যাতে লিগ্যাল অ্যাকশন না নিতে পারে, সেটা নিশ্চিত করা,' বলে হাসল লেয়ার্ড।

'কাজটা কি?' ঝুঁকে বসল ও।

'একজনকে খুন করা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ও। 'কি করে ভাবলেন আপনি বললেই আমি কাউকে খুন করতে ছুটব?'

'আপনার সম্পর্কে যা জেনেছি, তাতে না করতে চাইবার তো কারণ দেখি না,' মৃদু শ্রাগ করল লেয়ার্ড। 'তাছাড়া পারিশ্রমিকও প্রচুর দেব আমি। পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড। আমার ধারণা অঙ্কটা আপনার স্বাভাবিক ফীর বহুগুণ বেশি।'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না, লেয়ার্ড,' একঘেয়ে সুরে বলল ও। কাভার ডোশিয়ে পুরোই ব্যাটা জেনে গেছে বুঝতে পেরে খুশি। 'আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না আপনি।'

'জানি না, কেমন?' পাখি-নড়ের সাথে মৃদু হাসল লোকটা। 'আপনিই বা কি করে ভাবলেন আপনার সম্পর্কে ভাল করে খোঁজ-খবর না নিয়েই এমন এক কাজের প্রস্তাব দেব আমি? এতই বুদ্ধু মনে হয় আমাকে?'

'কি ভাবে সম্ভব···?'

'অনেকভাবে সম্ভব, মিস্টার রানা। ইচ্ছে যদি আন্তরিক হয়, ভাবের অভাব হয় না,' চওড়া হাসি দিল বিজ্ঞানী। রসিয়ে রসিয়ে আবার বলল, 'মিস্টার রানা, ওরফে মেজর মাসুদ রানা, ওরফে বীরউত্তম। আর কিছু জানতে চান? আপনি বাংলাদেশের নাগরিক, জন্ম ঢাকায়, বাবার নাম, জাস্টিস···থাক্, আর বোধহয় প্রয়োজন নেই, তাই না?'

চেহারায় বিস্ময় ফুটিয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

'তৃতীয় বিশ্বের কোন্ কোন্ দেশে কাকে কাকে খুন করেছেন আপনি, জানা হয়ে গেছে আমার। লন্ডনে কার সাথে জুয়া খেলায় হেরে বিশ হাজার পাউন্ড দেনা হয়েছেন, আগামী দশদিনের মধ্যে টাকাটা না পেলে সে আপনার কি দশা করবে, সব জানি। আরও এমন এমন সব তথ্য জানি, যা শুনলে আপনি অবাক হবেন। কিন্তু তার আর দরকার আছে বলে মনে করি না আমি। আপনার টাকা দরকার। কাজটা করে দিন, টাকা নিন।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল ওর, যেন নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করছে। 'কাকে খুন করতে বলছেন?' মুখ আঁধার করে বলল।

'লোকটার নাম প্যাট্রিক অলিভিয়েরো আরগুয়েলো।'

মোটেই অবাক হলো না রানা। তাকে দিয়েই নিজের প্ল্যান সফল করতে যাচ্ছে সাইমুর। ভবিষ্যতে যদি এ কাজের জন্যে কেউ তাকে ফাঁসাতে সফল হয়, সে এই অলিভিয়েরো। অতএব সময়মত লোকটার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। 'চিনলাম না।'

'স্মরণশক্তি একটু বাড়ান, পারবেন। পৃথিবীর সবচে' বড় সন্ত্রাসী—হাইজ্যাকিঙ, কিডন্যাপিঙ, বোমাবাজী, সবই করে সে। ওস্তাদ লোক। অনেক দেশে মোস্ট ওয়ান্টেড টেররিস্ট।'

'ও। সেই আরগুয়েলো?'

নীরবে মাথা দোলাল লেয়ার্ড।

'তাকে কোথায় পাচ্ছি আমি?'

'আমার সাথে থাকলেই পাবেন। কখন কাজটা করতে হবে, তাও আমিই জানাব আপনাকে।'

'পঞ্চাশ হাজারে,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'শুধু ওকে কেন, ওর বার্থ সার্টিফিকেটও হাওয়া করে দিতে রাজি আছি আমি।'

'সে কাজ বসে নেই,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল লোকটা। 'আমি সেরে ফেলেছি। আপনি শুধু ওকে শেষ করুন, তাতেই চলবে।'

'কিন্তু আমার ফী?' গলায় খানিকটা কাঠিন্য ফোটাল রানা। 'কখন, কিভাবে পাচ্ছি আমি টাকাটা?'

'আপনি যখন যেভাবে চাইবেন। তবে কাজ শেষ হওয়ার পর।'

'কিন্তু...'

'আমার কথায় যদি আস্থা রাখতে না পারেন, আপনিই তাহলে একটা পথ ভেবে বের করুন। আমি আপত্তি করব না।'

চিন্তার ভান করল রানা। 'ঠিক আছে, রাতে ভেবে ঠিক করব।'

'সেই ভাল। কাল জানান আমাকে।'

নীরবে কেটে গেল কিছু সময়। 'আরগুয়েলোর সাথে কি সম্পর্ক আপনার?' প্রশ্ন করল ও। 'আপনার এই মিশনে ওর কোন পার্ট আছে?'

'অপারেশন মেল্টডাউন? আছে।' সুপ্ত লাভা নড়ে উঠল। 'ডিটেইলস জানার প্রয়োজন নেই আপনার, তবু, কিছুটা অন্তত শুনুন। জানার অধিকার আছে আপনার। দুনিয়ার সমস্ত সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে লোকটার, প্ল্যান সফল করতে তাই ওর সাহায্য আমাকে নিতে হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকার ছয়টা মেজর নিউক্লিয়ার এস্টাবলিশমেন্টে আমার হয়ে তাদের থেকে ধার করা ছয় গ্রুপ এক্সপার্টকে ইনফিলট্রেট করিয়েছে সে। তা প্রায় এক বছর আগে। ওরা প্রত্যেকে সিরিয়াস, নিবেদিতপ্রাণ। আমার কাজ উদ্ধারে প্রয়োজন হলে মরতেও তৈরি সবাই। কাজ হলে ওরা প্রত্যেকে প্রচুর টাকা পাবে পুরস্কার হিসেবে, পৃথিবীর যে দেশে খুশি, গিয়ে বাস করতে পারবে। আর যদি আমি ব্যর্থ হই, ওরা মরবে। দুটোর কোনটাতেই অমত নেই লোকগুলোর। তবে,' থেমে নাকের ডগা চুলকাল লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি। 'পরেরটার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। ওদের জানিয়ে দিয়েছি আমি আরগুয়েলোর মাধ্যমে। এবং ওরা সাফল্য আশা করছে, ব্যর্থতা নয়।

'ঠিক সময়ে স্থাপনাগুলোর কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে ওরা। তারপর, যদি তেমন প্রয়োজন দেখা দিয়েই বসে, আপনি যে জিনিসটার নাম বললেন, চায়নাসিনড্রোম, তাই ছড়াতে শুরু করবে ভেতরে বসে। কারও

ঠেকাবার সাধ্য থাকবে না। যদি কাজটা করতে হয়, পৃথিবীর বেশ বড় একটা অংশের মানুষ, সম্পদ, সব শেষ হয়ে যাবে। মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ মরবে রেডিওঅ্যাকটিভ ফলআউটের মরণ ছোঁয়ায়। আমি অবশ্য মনে করি না তেমন কিছু ঘটবে।

'আরগুয়েলো ওদের জোগাড় করেছে। আমি সবাইকে তার মাধ্যমে ট্রেনিঙ দিয়েছি, কাকে কোন এস্টাবলিশমেন্টে পুশ করতে হবে, ঠিক করে দিয়েছি। তাদের ইনফিলট্রেশনের কাজটাও আরগুয়েলোকে দিয়ে করিয়েছি। অর্থাৎ ও ছাড়া আর কেউ ব্যক্তিগভাবে চেনে না আমাকে। ওদের কারও তরফ থেকে বিন্দুমাত্র ভয় নেই আমার, আছে আরগুয়েলোর তরফ থেকে। এ কাজে বেশ বড় অঙ্কের মুক্তিপণ আদায় করব আমি, কথা আছে তার থেকে অর্ধেক ও নেবে। একা নয়, অন্যদের সবাইকেও নির্দিষ্ট একটা ভাগ দেবে ওখান থেকে।'

হাসল লেয়ার্ড। নড়েচড়ে বসল। 'ডাউন পেমেন্ট হিসেবে আগে বেশ কিছু টাকা দিয়েছি আমি আরগুয়েলোকে, কিন্তু সে মনে হচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। চাপ দিয়ে আরও কিছু টাকা আদায় করতে চেয়েছিল এর মধ্যে, আমি দেইনি। দেবও না আর। দিয়ে লাভ নেই, কারণ ও আমার কাছে অলরেডি মৃত। মৃতের সাথে আবার কিসের লেন-দেন? ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর যখন সিকিউরিটি ফোর্স দুনিয়ার সমস্ত সন্ত্রাসীকে ধরে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে তুলবে, তখন ও বেঁচে থাকলে আমার কথা ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তা হতে দেব না।'

'এ না হয় মরল,' বলে উঠল মাসুদ রানা। 'অন্যদের কি হবে? ওরাও নিশ্চই টাকা পাচ্ছে না?'

'ঠিক, পাচ্ছে না। পাবে কি করে? যে ওদের টাকা দেবে সে-ই তো থাকছে না! তাছাড়া আমি যে রিঅ্যাক্টর তৈরি করতে চাই, তাতে প্রচুর টাকা লাগবে। বিলিয়ন বিলিয়ন পাউন্ড। কাজেই নিজেদের শেয়ার ওদের স্যাক্রিফাইস করতেই হবে।'

তা বটে, ভাবল ও। উপায় কি? মানুষটা যে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে, তার কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে ঘাম ছুটে গেল। সাইমুর কি করে নিশ্চিত হলো যে সন্ত্রাসী স্কোয়াডগুলো যখন কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব নেবে, তখন তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে না? নিজেরাই নেমে পড়বে না তার ভূমিকায়? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ব্যাটারা নিজেরা পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে যে মারাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসবে না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

প্রশ্নটা না করলেও চলত, কারণ এরমধ্যে নিজের পরবর্তী করণীয় ঠিক করে ফেলেছে রানা। তবু করল। নইলে সন্দেহ জাগতে পারে উন্মাদটার। 'আরগুয়েলোকে আমাকে দিয়ে হটাতে চাইছেন, ঠিক আছে। কিন্তু কাজটা করার পর আমাকেও যে আর কাউকে দিয়ে একই পথে পাঠাবেন না, তার কি নিশ্চয়তা আছে?'

চেহারা আঁধার হয়ে উঠল লেয়ার্ডের। রেগে উঠছে বোঝা গেল। তবু শেষ পর্যন্ত সামলে নিল। মেঘ ফুঁড়ে রোদ বের হওয়ার মত করে হাসল জোর করে। 'কোন নিশ্চয়তা নেই, মিস্টার রানা। আমার মুখের কথা বিশ্বাস করা ছাড়া

আপনার কোন পথও নেই। যদি আমাকে অবিশ্বাস করতে চান, করতে পারেন। যদি দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে চান এই মুহূর্তে, কেউ বাধা দেবে না। চলে যান। কিন্তু যে মুহূর্তে মেইন গেটের বাইরে পা রাখবেন, মনে করবেন আপনি মরে গেছেন।

'দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাকে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তবে বের হওয়ামাত্রই কাজটা করব না আমি, করব রয়ে-সয়ে। আপনাকে যথেষ্ট সময় দেব সিকিউরিটি এজেন্সি বা পুলিসের কাছে আমার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে।' কপালের পাশ চুলকাল লেয়ার্ড চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'কেউ যদিও একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। তবু, মৃত্যুর আগে অন্তত একটা সান্ত্বনা তো সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন যে না, চেষ্টা করেছিলাম আমি অমুককে ফাঁসাতে। পারিনি।'

দীর্ঘশ্বাসটা শব্দ করেই ছাড়ল ও। 'বুঝেছি। টাকা পাই আর না পাই, কাজটা আমাকে করে দিতেই হবে, এই তো?'

পাল্টা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল লেয়ার্ড। 'দেখো দেখি, টাকা দেব না এমন কথা কি আমি বলেছি একবারও?'

চুপ করে থাকল ও। 'চলুন,' উঠে পড়ল বিজ্ঞানী। 'চায়ের সময় হয়ে গেছে।' আগে আগে চলল। 'কাজটা শেষ করুন। অবশ্যই টাকা পাবেন।'

ডেস্কের ইঙ্ক স্ট্যান্ডের পাশে পড়ে থাকা ছোট ছোট বল বিয়ারিঙ জুড়ে তৈরি রিঙের মত এক পেপারওয়েটের ওপর অনেকক্ষণ থেকেই চোখ আটকে ছিল রানার, ওঠার সময় সুযোগ বুঝে চট্ করে পকেটে চালান করে দিল জিনিসটা।

সাত

ডিনারের পর নিজের রুমে চলে এল রানা। সিদ্ধান্ত পাকা, আজ রাতেই ভাগবে। যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে, আর সময় নষ্ট করা যায় না এখানে বসে। ছয় নিউক্লিয়ার এস্টাবলিশমেন্টের নাম মুখস্থ ওর, বাইরে গিয়ে ওগুলো মারভিন লংফেলোকে কোনমতে জানিয়ে দিলেই চলবে। হাতে সময় আছে, বিপদ ঘটে যাওয়ার আগে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারবেন তিনি, সামরিক বাহিনীর সাহায্যে ওগুলোর কন্ট্রোল রুম নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারবে তারা ঝটিকা অভিযান চালিয়ে। লেয়ার্ডের আর তার দুর্গের সম্ভাব্য পরিণতি তো ঠিক হয়েই আছে।

জুতোর হিলের খোপ থেকে লুকানো ছুরিটা বের করে পেপারওয়েটের খুদে বলগুলোর জোড়া খুলতে লেগে গেল ও। বিশেষ অসুবিধে হলো না, অ্যাডহেসিভ দিয়ে লাগানো ছিল, ছুরির ধারাল প্রান্তের সামান্য চাপ খেতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এক এক করে। মোট বারোটা বল–প্রয়োজনের চাইতে যথেষ্ট।

ওগুলো ট্রাউজারের পকেটে ভরে ব্রীফকেস গোছগাছ করে নিল রানা, তারপর উঠে পড়ল বিছানায়। শার্ট, প্যান্ট, জুতো, কিছুই খোলেনি। সিগারেট ধরিয়ে সময় পার করতে লাগল। সবাই ঘুমালে রোজালিন আসবে, খেতে বসে ইশারায় কথা

হয়েছে। তার অপেক্ষায় আছে। শুয়ে থেকে থেকে তন্দ্রামত এসে গিয়েছিল বলে উঠে পায়চারি শুরু করল একসময়।

অনেক দেরিতে, প্রায় একটার সময় এল মেয়েটি। দরজার লকের ভারী ক্লিক শব্দ শুনে দ্রুত সেদিকে এগোল রানা। এক হাতে দরজার পাল্লা ধরে অন্য হাত পকেটে ভরে কয়েকটা চকচকে বল বের করল। 'কি করছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রোজালিন।

'লেয়ার্ডের দরজার তালা পরীক্ষা করছি।' এই প্রথম দেখল ও, ফ্রেমে যেখানে তালার লিভার ঢুকে দরজার লকিং সিস্টেম 'অন' করে, সেই জায়গাটা স্টীলের। একটা নয়, তিনটে হাউজিং আছে ফ্রেমে–ওপরে, মাঝখানে ও নিচে। অর্থাৎ তিনটে লক। সিলিন্ড্রিক্যাল বোল্ট টাইপের, ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তির সাহায্যে অ্যাকটিভেট হয়। যখন লক করা হয়, বোল্ট তিনটে যার যার হাউজিঙের শেষ মাথা পর্যন্ত সেঁধিয়ে যায়, ইলেক্ট্রিক সার্কিট কমপ্লিট হয় তখন।

সন্তুষ্ট হলো রানা, এরকম কিছুই আশা করছিল। প্রতিটা হাউজিঙে চারটে করে বল ভরে দিল ও, আঙুল দিয়ে যতদূর যায় ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। এতগুলোর দরকার ছিল না, তবু ভরল অতিরিক্ত সতর্কতার জন্যে। তারপর আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজা। বোল্টগুলোর নিজের নিজের হাউজিঙে ঢুকে পড়ার শব্দ শুনল ওরা আবছামত, তবে সেই ভারী 'ক্লিক' শোনা গেল না। সার্কিট পুরো করতে পারেনি ওগুলো বলের বাধার জন্যে, পারবেও না যতক্ষণ বের না করা হচ্ছে।

ব্যাপার টের পেয়ে মুচকে হাসল রোজালিন। এখনও ডিনারের পোশাক পরে আছে সে। এক হাতে ক্যালকুলেটরের মত কিছু একটা ধরে আছে, অন্য হাতে ডুয়েলিং পিস্তল। হলরূমের কাঁচের বক্স থেকে বের করে এনেছে নিশ্চই।

'দেরি হয়ে গেল বলে দুঃখিত, রানা,' বলল সে চাপা গলায়। 'লেয়ার্ড এইমাত্র শুতে গেল। পিটার আর তার সঙ্গীদের সাথে কি নিয়ে যেন কথা বলছিল এতক্ষণ, কিছু কিছু শুনেছি আমি।' চোখ বড় করে ওকে দেখল সে। 'রানা, লেয়ার্ড তোমাকে কোন কাজের প্রস্তাব দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' বলল ও।

'সর্বনাশ!' অস্ফুটে প্রায় গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি। 'যা ভেবেছিলাম! কাজটা শেষ হলে পিটার তোমাকে খুন করবে, রানা। লেয়ার্ড তাকে সে-অনুমতি দিয়েছে।'

হাসল ও মেয়েটিকে অভয় দেয়ার জন্যে। 'সে আমিও অনুমান করেছি, রোজ।'

'কি কাজ করতে দিয়েছে তোমাকে লেয়ার্ড? কতটা ভয়ঙ্কর?'

'এতই ভয়ঙ্কর, রোজ, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'সারা বিকেল কোথায় ছিলে তোমরা? নিশ্চই সেই নিউক্লিয়ার...'

'ঠিকই ধরেছ তুমি। লেয়ার্ড তার প্ল্যান ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিল আমাকে।'

'ওহ্, গড!'

'শোনো, আমি পালাচ্ছি। ঘাবড়িয়ো না, সময়মত যেমন বলেছি, তোমাকে উদ্ধার করতে আসব আমি।'

পিস্তলটা ওকে দিল রোজালিন। 'এটা রাখো। বের হওয়ার সময় লাগতে

পারে।'

'ধন্যবাদ,' জিনিসটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল ও। 'ট্রিগার টিপলে আমার হাত উড়িয়ে দেবে না তো?'

'না, ঠিক আছে ওটা। লেয়ার্ড মাঝেমাঝে গুলি ছুঁড়ে মেকানিজম পরীক্ষা করে। কোন অসুবিধে নেই। বল, পাউডার সব লোড করাই আছে।'

জিনিসটা নিয়ে আসার জন্যে ওর বুদ্ধির তারিফ করল রানা মনে মনে। এ মুহূর্তে ও নিরস্ত্র, ওয়ালথার গাড়ির ড্যাশবোর্ডে। বলা যায় না, ওই পর্যন্ত পৌঁছার আগে প্রয়োজন পড়তেও পারে এ জিনিসের। 'এটা কারটা?'

'মনরোর। যে জিতেছিল।'

'গুড! হারু পার্টির জিনিস নিয়ে কারও সাথে লড়তে চাই না।'

'এবার মন দিয়ে শোনো কি করে বেরুতে হবে। হলরূমের মেইনগেটের ডানদিকে, ওপরে একটা লাল সুইচ আছে। ওটার নিচে আছে আরেকটা ছোট সুইচ। প্রথমটা দরজা খোলার, পরেরটা দুর্গের অ্যালার্ম সিস্টেম অফ করার। প্রথমে ছোট সুইচ ওপরদিকে তুলে দেবে, তারপর লালটা টিপলেই দরজার লক্ খুলে যাবে। ওটা অন করার সাথে সাথে সুইচবোর্ডে লাল আলো জ্বলে উঠবে, সতর্ক হয়ে যাবে সবাই। কাজেই বেশি সময় পাবে না।

'দরজা খুলেই সোজা ছুটতে হবে তোমাকে। তোমার গাড়ি সামনেই আছে, খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। বুঝতে পেরেছ?' রানা মাথা দোলাতে অন্য জিনিসটা এগিয়ে দিল মেয়েটি। 'এটা মেইন গেটের রিমোট কন্ট্রোল। বেশি দূর থেকে না, গেটের একশো গজ দূর থেকে "ওপেন" লেখা সুইচটা টিপবে তুমি, কাজ হবে।'

'কার এটা?'

'মের। চুরি করে এনেছি।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, রোজ। নিজের রূমে ফিরে যাও, আমি ঠিক তিন মিনিট পর বের হব। সব ঠিক থাকলে আবার ফিরে আসব আমি তোমার জন্যে, ভেবো না।'

কাছে এসে ওর গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েটি, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। 'সাবধানে থেকো, রানা। সাবধানে যেয়ো।' চোখ বুজে মুখ এগিয়ে দিল ও। চুমু খেলো রানা। অনেকক্ষণ দুটো দেহ সেঁটে থাকল পরস্পরের সাথে। মুখ সরিয়ে নিল রোজালিন। চাপা কণ্ঠে আবার বলল, 'সাবধান থেকো।'

'চিন্তা কোরো না,' ওর বাহুতে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'যাও, নিজের ঘরে চলে যাও।'

যাই যাই করে আরও মিনিটখানেক অপেক্ষা করল মেয়েটি, ওর দিকে তাকিয়ে হয়তো ভরসা খুঁজল। 'গুড বাই, রানা।'

'গুড বাই, রোজ।'

ধীরপায়ে বেরিয়ে গেল সে বারবার পিছন ফিরে দেখতে দেখতে। নিঃশব্দে ওর উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, দরজা বন্ধ হয়ে যেতে কাজে লেগে পড়ল। রিমোট কন্ট্রোলটা হিপ পকেটে রেখে ডুয়েলিঙ পিস্তল কোমরে গুঁজল, হ্যামার ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখে নিতে ভুলল না আগে। তারপর ব্রীফকেস থেকে

একটা ছোট, চৌকো বক্স বের করল, দেখতে অনেকটা ডানহিল সিগারেট প্যাকেটের মত জিনিসটা। ওটাও একটা রিমোট কন্ট্রোল। ওর গাড়ির।

ইগনিশন সিস্টেমের সাথে পেতে রাখা বোমার ঝুঁকি এড়াতে দূর থেকে ওটার সাহায্যে গাড়ি স্টার্ট দেয়ার ব্যবস্থা আছে ওর গাড়িতে। ব্রীফকেস, গাড়ির চাবি আর রিমোট কন্ট্রোল, সব বাঁ হাতে নিল রানা। ডান হাত সম্ভাব্য অ্যাকশনের জন্যে মুক্ত। লম্বা করে দম নিল কয়েকবার, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রূম থেকে। দরজা আস্তে করে ভিড়িয়ে দিয়ে অন্ধকার করিডরে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। চোখ সয়ে আসতে পা বাড়াল গ্যালারির দিকে। সিঁড়িতে লো ওয়াটের একটামাত্র সেফটি ল্যাম্প। তাতে অন্ধকার দূর তো হয়ইনি, বরং আরও যেন চেপে বসেছে।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে থামল রানা। পুরানো দুর্গ দু'বার বিচিত্র শব্দ করল। কান খাড়া করে আওয়াজটা বোঝার চেষ্টা করল ও–দুর্গেরই তো? হ্যাঁ, তাই। আবার এগোল। সিঁড়িতে পা রাখার আগে নিচের হলরূম আর গ্যালারির ওপর তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে নিল। তারপর নিশ্চিন্তমনে দেয়াল ঘেঁষে নামতে শুরু করল। হলরূমে পা রেখে দ্রুত এগোবার স্বাভাবিক তাগিদ প্রতিরোধ করতে মনের জোর খাটাতে হলো ওকে। পা দুটো নিয়ন্ত্রণে থাকতে চাইছে না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চাইছে।

ধীর পায়ে রয়ে-সয়ে মেইন ডোরের দিকে এগোল রানা। টিপে টিপে। সুইচ দুটো যথাস্থানে দেখতে পেল। লালটা অন্ধকারে জ্বলছে অল্প অল্প। কাছে গিয়ে প্রথমে অ্যালার্ম সিস্টেম অফ করল ও খুদে লিভার ওপরে ঠেলে দিয়ে, তারপর দুরু দুরু বুকে টিপে দিল লালটা। পরক্ষণে চমকে উঠল নিজেই। হাউজিং থেকে একযোগে বেরিয়ে এল তিন হেভি সিলিন্ড্রিকাল বোল্ট, আওয়াজটা হলো প্রায় গুলি ফোটার মত। অখণ্ড নীরবতার মাঝে এত বিকট আওয়াজে মরাও বুঝি জ্যান্ত হয়ে উঠেছে মনে হলো রানার। খুলে যেতে শুরু করেছে দরজা, নাকে এসে লাগছে বাগানের হরেক রকম ফুলের মিলিত সুগন্ধ, তখনই আরেক দফা ওকে চমকে দিয়ে পুরো হলরূম আলোকিত হয়ে উঠল।

'হ্যান্ডস আপ্!' গুরুগম্ভীর একটা নির্দেশ ভেসে এল পিছন থেকে। গলাটা নিঃশব্দচারী বাটলার হ্যারির, শুনেই বুঝল ও। অনুমান করল সিঁড়ির গোড়ায় কোথাও আছে লোকটা। থমকে গেল রানা।

ভান করল আস্তেই ঘুরছে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘুরল বিদ্যুৎগতিতে, হাতে বেরিয়ে এসেছে ডুয়েলিঙ পিস্তল। যে মুহূর্তে ঘোরা শেষ হলো, অষ্টকোণ ব্যারেলটাও প্রয়োজনীয় বুক সমান উচ্চতায় স্থির হলো। গুলি করল রানা। হাতের মধ্যে বন্দী সাপের মত লাফ মেরে উঠল ওটা বিকট শব্দের সাথে, সাদা ধোঁয়ায় মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। লক্ষ্য নির্ধারণে ভুল হয়নি ওর, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর ট্রেনিঙ পাওয়া কান গলাটা কোনখান থেকে এসেছে, সনাক্ত করেছিল ঠিকমতই।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল হ্যারি, পরমুহূর্তে ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠল মেঝেতে, হাতের অস্ত্র পড়ে গেছে। পুরো একটা চক্কর খেয়ে দড়াম করে আছড়ে

পড়ল লোকটা পাকা মেঝের ওপর। দেড় শতাব্দীরও পুরানো বল বুলেটের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে কাঁধের হাড়।

ছবিটা পুরো দেখা হলো না রানার—সময় নেই। এক লাফে বাইরে চলে এল, ঝেড়ে দৌড় লাগাল গাড়ির দিকে। চোখের কোণ দিয়ে সামনের বাগানে কয়েকটা নড়াচড়া দেখতে পেল ও। কারা যেন ছুটে আসছে! রিমোট কন্ট্রোল টিপে দিল রানা, গজ বিশেক সামনে সগর্জনে স্টার্ট নিল স্যাব ৯০০ টার্বো। আওয়াজটা কানে যেতে ও-ও যেন নতুন উদ্যম পেল, ছুটল তুমুলবেগে। বাগানের ছায়াগুলো ততক্ষণে ঘুরে গেছে, দুর্গ ছেড়ে গাড়ির দিকে আসছে। সামনের ছায়াটা দানবাকৃতি—পিটারের!

ডোর লক স্লটে চাবি ভরে মোচড় দিল রানা, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ব্রীফকেসটা পিছনের সীটে ছুঁড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। পিছন থেকে পিটার প্রায় ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তখন সঙ্গী-সাথী নিয়ে। ঘাবড়াল না ও, বুলেটপ্রুফ কার, সহজে কিছু করতে পারবে না ব্যাটারা। ব্যস্ত হাতে ড্যাশবোর্ড থেকে অতিরিক্ত নাইটফাইন্ডারজোড়া বের করে পরে নিল, পরমুহূর্তে ঝট্ করে গিয়ার এনগেজ করেই ব্রেক রিলিজ করল, এবং ঠিক সেই মুহূর্তে সামনেই মেশিন পিস্তল হাতে পিটারকে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। হাঁপাচ্ছে। মুখে কলজে হিম করা বিকট হাসি। দু'হাতে অস্ত্র ধরে রেখে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কি যেন বলল সে, দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে গাড়ি থেকে বের হতে নির্দেশ দিল। মুখ ঘুরিয়ে দু'পাশে লেয়ার্ডের আরও চার চ্যালাকে দেখতে পেল রানা, ফ্রেঞ্চ-কাট নিক আর হ্যারিও আছে তাদের মধ্যে। একই অস্ত্র সবার হাতে, রানার মাথা সই করে ধরে আছে ব্যাটারা।

সামনে নজর দিল রানা। পিটারের অগ্নিশর্মা, খেপাটে মুখের দিকে তাকাতে আবার দাঁত খিঁচাল সে। 'সরি, বন্ধু,' বলল রানা। 'আজ সময় নেই, পরে আলাপ হবে।' এক্সিলারেটরে চাপ দিল হাত নেড়ে নীরবে পিটারকে টা টা করে। লাফ দিল স্যাব, খুব দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে ডান ফেন্ডার দিয়ে মাঝারি একটা গুঁতো মেরে পথ থেকে সরিয়ে দিল ও পিটারকে, তারপর ছুটল।

পিছন থেকে গুলি করল লোকগুলো, স্যাবের মজবুত আর্মার প্লেটিঙ মোড়া দেহে ঠক্-ঠক্ করে লেগে ছিটকে পড়ল প্রতিটা বুলেট, কয়েকটা পিছনের কাঁচেও লাগল। পিছলে এদিক-ওদিক ছুটে গেল। রিয়ার ভিউ মিররে দানবটাকে উরু চেপে ধরে পথের ওপর গড়াগড়ি খেতে দেখল রানা মুহূর্তের জন্যে। বাঁক ঘুরে মেইন ড্রাইভওয়েতে উঠতে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। পিছনে সমানে গুলি ছুঁড়ছে অন্যরা, স্যাবের গায়ে অনবরত মাথা কুটছে বুলেটগুলো।

হিপ পকেট থেকে এক টানে রোজালিনের দেয়া মেইন গেটের রিমোট কন্ট্রোলটা বের করে কোলের ওপর রাখল রানা, নির্ভয়ে কাঁচ নামিয়ে দিল। আচমকা একটা ফট্ শব্দের সাথে দুলে উঠল স্যাব, মুহূর্তখানেক টলোমলো করে সোজা হয়ে গেল আবার। বুঝল রানা কি ঘটেছে—পিছনের এক টায়ারে গুলি লেগেছিল। কিন্তু ডানলপ ডেনোভোস টায়ারের জন্যে তাতেও সুবিধে হয়নি ব্যাটাদের, পাংচার ও স্প্লিট-প্রুফ মাল, উল্টে ওটাকেই বেমালুম হজম করে

ফেলেছে।

একটুপর ভারী লোহার মেইন গেটের দেখা পেতে মন খুশি হয়ে উঠল ওর। থার্ড গিয়ার দিল। এসে পড়েছে গেট, চট্ করে রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে জানালা দিয়ে হাত বের করে 'ওপেন' সুইচ টিপে দিল। যদিও এর মধ্যে মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, জিনিসটা হয়তো কাজ করবে না। জানাজানি হয়ে গেছে ওর পালানোর খবর, কাজেই সুইচবোর্ড কন্ট্রোল হয়তো অফ করে দিয়েছে গেটের লাইন।

মুহূর্তের জন্যে রোজালিনের ব্যাপারেও সন্দেহ জাগল রানার। ওকে ইচ্ছে করে ফাঁদে ফেলেনি তো মেয়েটা? নইলে এত রাতে লোকগুলোর প্রায় রেডি অবস্থায় থাকার তো কথা নয়! এটা কোন সেট-আপ নয়তো? ভাবতে ভাবতেই মন খুশি হয়ে উঠল গেটটা নড়ে উঠেছে দেখে। এক পাল্লার গেট, একটু একটু করে সরে যাচ্ছে ওর বাঁয়ে। গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা।

তখনই একটা কাঠামো দেখতে পেল, ডানদিকের গার্ড পোস্ট থেকে বেরিয়ে এসেছে, ডান হাত বেশ দীর্ঘ তার। ওপরে উঠল হাতটা, হলুদ ফুল্কি উদ্গিরণ করতে লাগল। জানালার কাঁচ তুলে দিল রানা, পাল্টা গুলি ছোঁড়ার কোন আগ্রহ দেখা গেল না ওর মধ্যে। অহেতুক রক্তপাত পছন্দ নয়। করতে থাক ব্যাটা যত খুশি গুলি, ভাবতে ভাবতে তুফান বেগে স্যাব ছোটাল রানা।

গেট এখনও খুলছে। গতি এত ধীর যে শঙ্কিত না হয়ে পারল না ও, ভয় হলো প্রয়োজনের সময় বেরিয়ে যাওয়ার মত পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি হবে কি না ভেবে। আহাম্মক গার্ডের নাকের সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল রানা, এসে পড়েছে গেট। একদিকের পিলার আর গেটের প্রান্তের মাঝের ফাঁক হিসেব করে হুইল ঘোরাল ও, পিছনে ধুপ্ ধাপ শব্দে আছড়ে পড়ছে বুলেট। সাঁ করে মাথার ওপর এসে হাজির হলো গেট।

উন্মুক্ত জায়গা দিয়ে নাক ভরে দিল ও। পরক্ষণে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল স্যাব–দু'পাশেই ঘষা খেয়েছে। মুহূর্তের জন্যে গতি কমে গেল, বিকট শব্দে নাক থেকে লেজ পর্যন্ত বডি তুবড়ে, চিরে গেল। হোঁচট খেতে খেতে এগোল স্যাব, তারপর মুক্ত হয়েই গা ঝাড়া দিয়ে ফের ছুটল ঘণ্টায় ৮৫ মাইল বেগে। তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত ভাগছে লেজ দাবিয়ে।

মোটামুটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল ও, এমন সময় চোখ পড়ল পিছনের আলোটার ওপর। তেড়ে আসছে পিটার দলবল নিয়ে। গতি আরও বাড়িয়ে দিল রানা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য এক চিন্তা জুড়ে বসল মাথায়। গ্রাম পার হতে পারবে নিরাপদে? পথে কি বাধা দেয়া হবে ওকে? বলা যায় না, হতেও পারে। হয়তো খবর পেয়ে এতক্ষণে ওখানে তৈরি হয়েই আছে কোন অভ্যর্থনা কমিটি। তবে ভরসাও একটা আছে, হেড লাইট অফ করে ছুটছে রানা, তারওপর গতিও তেমনি, হয়তো সময়মত ওকে লোকেট করতে পারবে না ব্যাটারা।

পিছনের গাড়ি মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনতে পারেনি দেখে খুশি হয়ে উঠল রানা। একই দূরত্বে আছে। গির্জার কাছে পৌঁছে হঠাৎ করে মত পাল্টাল ও, খুব দ্রুত স্টিয়ারিঙ হুইল ঘুরিয়ে শিলডিগের পথ ধরল। শেষ মুহূর্তে মারকান্ডি ঢোকার

মুখের কাঠের ব্রিজটার ব্যাপারে সন্দেহ জেগেছে। ওটা ড্র ব্রিজ কি না কে জানে? হয়তো জায়গামত পৌঁছে শেষ মুহূর্তে দেখা যাবে তাই, জায়গা ছেড়ে শূন্যে ভাসছে। শিলডিগের রাস্তা অন্যটার মত মসৃণ নয়, বেদম লাফাচ্ছে গাড়ি। কয়েকবার ছাতে ঠুকে গেল মাথা। তবু গতি কমানোর কথা ভাবল না পর্যন্ত ও। অন্ধকারে যত তাড়াতাড়ি মারকান্তি থেকে দূরে সরে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

ভাবতে না ভাবতে ওর আশা-ভরসার গালে প্রচণ্ড এক চড় পড়ল। কাছেই কোথাও থেকে আকাশে উঠল কয়েকটা ফ্লেয়ার! একটুপরই শূন্যে ফুলঝুরির মত বিস্ফোরিত হলো ওগুলো, তীব্র নীলচে আলোয় দিনের মত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারদিক। দিনে দুপুরে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে যেন ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন অনুভূতি হলো রানার। পিছনে কোথাও গর্জে উঠল অসংখ্য অটোম্যাটিক অস্ত্র।

গতি কমাবার ফাঁকে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ দিল ও। যে রিসেপশন কমিটির ভয় করছিল, এরা নিশ্চই সেই দলের। মুঠো থেকে শত্রু বেরিয়ে গেছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠেছে, খুঁজছে হন্যে হয়ে। মাথার ওপর তিনটে ফ্লেয়ার ঝুলছে, হেলেদুলে নেমে আসছে। আচমকা ব্রেক কষল রানা, থাবা দিয়ে ওয়ালথার বের করেই ওপরদিকে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। ব্যস্ত হয়ে নয়, ধীরেসুস্থে। চেম্বার খালি হয়ে গেল দুটো নেভাতে, অন্যটা পারা গেল না বেশি দূরে বলে। শূন্য ম্যাগাজিন ফেলে অতিরিক্তটা চেম্বারে ভরল রানা, ওটা পাশে রেখে আবার ছোটাল গাড়ি। অজ্ঞাত কারণে পিছনের গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এর মধ্যে। পিছনের গাড়িটাও আর দেখা যাচ্ছে না, কেন, তাও ভেবে পেল না।

খানিকটা পথ নিরাপদে এগোল। তারপরই আবার বাধা, চার পাঁচটা ফ্লেয়ার একযোগে জ্বলে উঠল আকাশে। ততক্ষণে প্রায় সাইমুর ক্যাসেলের বরাবর পৌঁছে গেছে ও। ফ্লেয়ারের আলোয় নতুন একটা জিনিস দেখে আঁতকে উঠল—ওগুলো ট্রেসার! শূন্যে বাঁক খেয়ে ছুটে আসছে স্যাবের দিকে। অলস গতিতে। দ্রুত ওয়ালথার তুলে নিয়ে ব্রেক কষল ও, গুলি করে ফেলে দিতে হবে ওগুলোকে। কিন্তু তার আর দরকার হলো না। স্যাবের বেশ পিছনে রাস্তায় পড়ল সব ক'টা।

গিয়ার দিয়ে এগোল রানা, ওদের আওতার বাইরে চলে এসেছে ভেবে খুশি। গতি বাড়াতে শুরু করল, ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটে চলল। মুখ ঘুরিয়ে পাশ কাটাবার সময় দুর্গের দিকে তাকাল একবার—অন্ধকার এক ভৌতিক কাঠামোর মত দাঁড়িয়ে আছে ওটা। পিছনে ধাওয়াকারীদের খবর নেই। ওরা কেন থেমে গেল বোঝা যাচ্ছে না। এরমধ্যেই আশা ছেড়ে দিয়েছে? মনে হয় না।

কারণ যা-ই হোক, তাড়া করা বন্ধ হয়েছে ভেবে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল মনে, প্রতিমুহূর্তে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসতে থাকল ওর একটু একটু করে। লাফঝাঁপ কমে আসছে বুঝতে পেরে গতি বাড়াল স্যাবের, আগের তুলনায় যথেষ্ট মসৃণ এখন রাস্তা। গিয়ার বদলে টপে নিয়ে এল, মোটরওয়ের দূরত্ব বোঝার জন্য ম্যাপের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে জমে গেল শেষ মুহূর্তে। চট্ করে কপাল কুঁচকে উঠল, কেমন একটা আওয়াজ আসছে না? কিসের?

রিয়ার ভিউ মিররে চোখ বোলাল রানা—নেই কিছু, রাস্তা ফাঁকা। তাহলে?

অবশ্য সমস্যা একটা আসছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না। কিন্তু সেটা কি? দ্বিধায় পড়ে গতি কমিয়ে দিল ও অজান্তেই, বোকার মত শত্রুর অপ্রত্যাশিত কোন ফাঁদে পড়ার ইচ্ছে নেই।

এমন সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল। যে পথে ও চলেছে, পাহাড় চূড়ার পাশ দিয়ে বাঁক খেয়ে শিলভিগের দিকে নেমে গেছে সেটা। সামনেই রাস্তার সর্বোচ্চ পয়েন্ট, দু'মিনিট লাগবে স্যাবের ও পর্যন্ত পৌঁছতে–কিন্তু সুযোগটা যে পাওয়া যাবে না, ওটাকে দেখার এক সেকেন্ড আগেও ভাবেনি রানা। দেহের সমস্ত পেশী টান্ টান্ হয়ে উঠল।

চূড়োর ওপাশ থেকে স্লো মোশন ছায়াছবির মত ধীরগতিতে প্রথমে মাথা জাগাল ঘূর্ণায়মান রোটর, তারপর প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত বিশাল একটা কপ্টার। চুঁই-চুঁই চুঁই-চুঁই শব্দে বাতাস কাটছে। মুহূর্তের জন্যে আহাম্মক বনে গেল ও, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। পরক্ষণে তীব্র এক ঝাঁকি খেয়ে সচকিত হলো, দাঁড়িয়েই গেল প্রায় ব্রেকের ওপর। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে যন্ত্র দানবটার দিকে।

এই জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, ওটাকে দেখার আগপর্যন্ত ভুলেও একবার মাথায় আসেনি। আরগুয়েলোকে রেখে কপ্টার কখন ফিরে এসেছে, টেরই পায়নি রানা। এর জন্যেই যে ধাওয়া করা বন্ধ হয়ে গেছে, এইবার বুঝল। স্যাবের নাকের প্রায় সামনে ভেসে আছে ওটা, ককপিটে পাইলটের পাশে স্বয়ং লেয়ার্ড বসা। পাইলটের চোখে ওরই নাইটফাইন্ডার।

কড়া ব্রেক কষার ফলে ঘুরে যেতে শুরু করেছে স্যাব, দাঁড়িয়েই পড়েছে প্রায়, তখনই খেয়াল হলো ভুল করছে ও, এরকম সময় থেমে পড়া বোকামি। হুইলের সাথে কুস্তি শুরু করে দিল রানা, গাড়ি সোজা করে আবার ছুটল, ডান হাত ওয়ালথারসহ বের করে দিয়েছে জানালা দিয়ে। ব্যারেল ওপরমুখো করে পর পর দুটো গুলি করল ও, কিছুই ঘটল না, বরং আরও বিপজ্জনক নিচে নেমে এল কপ্টার। স্যাবের সাথে তাল রেখে পিছু হটছে।

আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা, তবে একটু দেরিতে। তার এক সেকেন্ড আগেই সাঁই-সাঁই করে ওপরে উঠে যেতে শুরু করেছে যন্ত্র ফড়িং। পরমুহূর্তে স্যাবের দশ গজ সামনের রাস্তা লাফ দিয়ে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায়। স্টান গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে কপ্টার থেকে। আবার হুইলের সাথে কুস্তি শুরু করল রানা, বিস্ফোরণের জায়গাটাকে পাশ কাটাবার সংগ্রাম করছে। এর মধ্যে ওর পিছনে চলে গেছে কপ্টার।

সামলে ওঠার আগেই পর পর আরও দুটো গ্রেনেড পড়ল স্যাবের একেবারে সামনে। ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা অনুভব করল রানা, পরক্ষণে মাথা তুলতে শুরু করল গাড়ি। শূন্যে উঠে গেছে সামনের দুই চাকা। উঠছে, আরও উঠছে, ভেতরে বসে রানা অসহায়ের মত উত্থান দেখছে ওটার। কিছু করার নেই।

দেখতে দেখতে একদম খাড়া হয়ে গেল স্যাব টার্বো, তারপর উল্টে যেতে শুরু করল পাশের অগভীর খাদের দিকে। মরিয়া এক হ্যাঁচকা টানে নিজেকে সীট বেল্টের বাঁধন মুক্ত করল রানা। বুঝে ফেলেছে কি ঘটতে যাচ্ছে। সময় নেই।

এখনই সতর্ক করতে হবে মারভিন লংফেলোকে। ড্যাশবোর্ডে দুই পা বাধিয়ে, এক হাতে সীটের ব্যাক আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষার লড়াইয়ের ফাঁকে বুক পকেট থেকে সিগন্যাল পেনটা বের করার জন্যে হাত বাড়াল ও। থমকে গেল পরমুহূর্তে। নেই ওটা!

অথচ পরিষ্কার মনে আছে রানার, দুর্গ থেকে বের হওয়ার সময় ওখানেই রেখেছে জিনিসটা। কোথায় পড়ল? ভাবনাটা পুরো শেষ করতে পারল না ও, সবেগে রূফ দিয়ে আছড়ে পড়েই আবার নাকের ওপর ভর দিয়ে খাড়া হতে শুরু করেছে স্যাব। দ্বিতীয় আছাড়ের ফল দেখার সুযোগ হলো না, পাশে পড়ে থাকা ওয়ালথার এখানে-ওখানে বাড়ি খেয়ে ঠকাশ করে আছড়ে পড়ল ওর কপালের পাশে।

ব্যথা তেমন অনুভব করল না রানা। জ্ঞান হারাবার আগে মনে হলো কুচকুচে কালো বালির সাগরে পড়েছে বুঝি ও। তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

আট

চোখ ধাঁধানো আলো। তীব্র, সাদা। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো এখনও গাড়ির মধ্যেই আছে ও, ঘনঘন ডিগবাজি খাচ্ছে। আশেপাশে কারা যেন ফিস্ ফিস্ করছে।

বন্ধ পাতার মধ্যে মণি কয়েকবার ঘুরল, প্রায় জোর করেই চোখ খুলল ও। মুখের ওপর আরেকটা মুখ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হলো—মে হরোইৎজ। হাসছে। 'কেন এমন একটা কাণ্ড ঘটালেন?' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'পনেরো ফিট গভীর খাদে পড়ে গিয়েছিলেন আপনি, জানেন? অক্সি-অ্যাসিটিলিন কাটার দিয়ে গাড়ি কেটে বের করতে হয়েছে আপনাকে। না না, ঘাবড়াবেন না, তেমন কিছু হয়নি। এখানে-ওখানে সামান্য কেটে ছড়ে গেছে কেবল। ভয় নেই।'

উঠে বসার চেষ্টা করে বাধা পেল ও, হার্নেস দিয়ে বিছানার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে শক্ত করে। নাকে কড়া ওষুধের গন্ধ আসছে। পাশে তাকাল, সাদা টাইলের দেয়াল দেখে বুঝে ফেলল কোথায় আছে। লেয়ার্ডের টর্চার চেম্বার।

অপারেটিঙ টেবিলের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে। গায়ে কোট নেই। পাশেই দাঁড়িয়ে মে হরোইৎজ, পরনে সাদা কোট। ডাক্তারের বেশ। পরমুহূর্তে মনে পড়ে গেল মেয়েটি ট্রেইনড ফিজিশিয়ান। তার পাশে লেয়ার্ডের দুই পোষা কুকুর দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। একটা ফ্রেঞ্চ-কাট নিক, অন্যটাকে ও চেনে না। পাথর দিয়ে তৈরি যেন ব্যাটাদের মুখ, কোন অভিব্যক্তিই নেই ওখানে।

'ভয় নেই যখন,' সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলার চেষ্টা করল ও। 'বেঁধে রাখা হয়েছে কেন আমাকে?'

রজার সাইমুরের মৃদু গলা ভেসে এল জবাবে। 'কথা নেই বার্তা নেই যা ঘটিয়ে বসলেন, তার ব্যাখ্যা জানার জন্যে, মিস্টার মাসুদ রানা।'

'ব্যাখ্যা!' আকাশ থেকে পড়ল ও। 'কিসের? আপনি বলতে চাইছেন এখানে কাউকে নাইটরাইডে যেতে হলেও আগে নোটিশ দিতে হবে?'

'ভারি রসিক মানুষ তো সাহেব আপনি!' বলল সে। 'আমার কর্মচারীকে খুন করলেন, গোপনে ক্যাসেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, নাইটরাইডের জন্যে? তা বেশ! কিন্তু মাথার মধ্যে আমার বর্তমান প্রজেক্টের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য ভরে আপনি গভীর রাতে সো কল্ড্ রাইডে যাবেন, আর আমি তা চুপ করে দেখব, কি করে ভাবলেন?' আফ্সোস প্রকাশ করল বিজ্ঞানী মাথা দুলিয়ে। 'মানুষটা আপনি মোটেই বিশ্বস্ত নন। তাই আপনার-আমার মৌখিক চুক্তি বাতিল করে দিয়েছি। এখন আমাকে জানতে হবে আপনি আসলে কে, কার হয়ে কাজ করছেন, এখানে আসার অন্য কোন উদ্দেশ্য আপনার ছিল কি না। তবে আপনার শেষ পরিণতি যে পরপারে যাওয়া, সে ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ পুষে রাখবেন না যেন। কনর্ফার্ম টিকেট হয়ে গেছে, যেতেই হবে আপনাকে। এবার বলবেন কি দয়া করে, কে আপনি? সত্যিকার পরিচয় কি আপনার?'

মাথার ভেতরের ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গেছে রানার এতক্ষণে। দৃষ্টিও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। সব মনে পড়ছে। এখন কি ঘটতে যাচ্ছে অনুমান করতে দেরি হলো না। হাত-পায়ের আঙুল নেড়েচেড়ে দেখল ঠিকই আছে সব, হাড়গোড় ভাঙেনি কোথাও। এখানে-ওখানে সামান্য কেটে ছড়ে যাওয়া ছাড়া তেমন কিছুই ঘটেনি। শুধু কপালের পাশে ওয়ালথারের বাড়ি খাওয়া জায়গাটায় যা একটু

'কে আপনি, মিস্টার রানা?'

'আপনি ভালই জানেন আমি কে,' রেগে ওঠার ভান করল ও।

লেয়ার্ডকে চিন্তিত দেখাল। 'আমি যা জেনেছি, তা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনার এমন এক কাণ্ড ঘটানোর কোন কারণ দেখি না। আমার কাজ করে দেয়ার চুক্তিতে রাজি হলেন, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাসেল ছেড়ে ভেগে যাওয়ার চেষ্টা, কেন?'

'ভয়ে,' গলা স্বাভাবিক রেখে বলল ও।

'ভয়ে!'

'হ্যাঁ, ভয় ছিল কাজটা আমি করতে পারব না, ব্যর্থ হব, তাই।'

'হবে হয়তো,' পাখি-নড করল লেয়ার্ড। 'কিন্তু আমি শিওর হতে চাই, মিস্টার রানা। ভেতরের আসল কথা জানতে চাই। এবং তাড়াতাড়ি, হাতে সময় নেই। আমার বান্ধবী মে আমাকে সাহায্য করবে এ ব্যাপারে। আপনি জানেন না ও ট্রেইনড ফিজিশিয়ান। সাইকিয়াট্রিস্ট। প্রয়োজনে আপনার জীবন দুর্বিষহ করে তুলতে পারবে এসব করতাম না, করছি বাধ্য হয়ে। এরমধ্যে আপনার লাগেজ চেক করেছি আমি। যা পেয়েছি, একজন মার্সেনারির জন্যে সে সব একটু বেশি সফিস্টিকেটেড। ভেরি ইন্টারেস্টিং। মে! এঁর পেটের ভেতর আরও কোন কথা আছে কি না জানতে হবে। শুরু করো।'

আতঙ্কিত হয়ে উঠল রানা মেকে ওর শার্টের হাতা গোটাতে দেখে, স্ট্র্যাপের বাঁধন অগ্রাহ্য করে উঠে বসার চেষ্টা করল মরিয়া হয়ে। লাভ তো হলোই না, বরং ওগুলো আরও চেপে বসল। বাইসেপের একটু নিচে ভেজা, ঠাণ্ডা কিছুর ছোঁয়া

অনুভব করল ও পরক্ষণে। ইঞ্জেকশন পুশ করতে যাচ্ছে মে। চেহারা-চাউনি এ মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্যরকম লাগছে তার।

কি পুশ করতে যাচ্ছে মেয়েটি, কনভেনশনাল কোন ট্রুথ ড্রাগ? না আনকনভেনশনাল? সতর্ক থেকো রানা, নিজেকে শোনাল ও, মারভিন লংফেলোর তৈরি নিজের বর্তমান ডোশিয়ের ওপর মনের চোখ স্থির করল। সাবধান! বেফাঁস কিছু বলে বোসো না যেন। বাহুতে কুট করে হাইপোডারমিক নীড্ল ঢুকে গেল, মুখ বিকৃত করল রানা। কি ওটা? সার্ভিসে যাকে সোপ বা সাবান বলা হয়, সেই সোডিয়াম থাইওপেন্টাল? না আরও শক্তিশালী কোন টক্সিক ড্রাগ? অথবা স্কোপোলামাইনের সাথে মরফিনের মিশ্রণ?

আসল দিকে মন দাও, আহাম্মক কোথাকার! ডোশিয়ের পাতা ওল্টাতে থাকো মনে মনে, যেন সময়মত উল্টোপাল্টা কিছু বেরিয়ে না যায় মুখ থেকে। আলসেমি কোরো না, পাতা ওল্টাও। খেয়াল রেখো, তুমি মাসুদ রানা, বাংলাদেশী, এক্স মেজর, নম্বর ৭২৫০৯৫। তোমার বর্তমান পেশা...

হাত টেনে নিল মে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল সেই মনকাড়া হাসি। প্রায় একই মুহূর্তে রানা টের পেল, দেহ থেকে মনটা ওর স্বাধীন হয়ে গেছে যেন, ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে বাতাসে। ধীর গতিতে ঘুরছে চোখের সামনে।

একটু পরই মনে হলো গ্রীষ্মের শেষ বিকেলে ফুলে ফুলে ভরা বাগানে হাঁটছে ও। সুন্দর ছায়াঢাকা পরিবেশ, ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর-মন জুড়িয়ে যাচ্ছে, নাকে আসছে নাম না জানা নানান ফুলের গন্ধ। রোজালিন রয়েছে সাথে—পরস্পরের হাত ধরে হাঁটছে দু'জনে... শিশুরা হাসছে...ফোয়ারার পানিতে খেলা করছে হাঁস...কাছেই কোথাও...

হঠাৎ করে চেহারার সমস্ত কমনীয়তা উবে গেল রোজালিনের। মৃদু তবে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'রানা, তোমার সত্যিকার পেশা কি?'

জোর করে মনটাকে দেহের খাঁচায় বন্দী করতে চাইল ও। জানে মেয়েটাকে বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না, তবু বলল, 'মার্সেনারি।'

'তোমার আসল পরিচয়?'

'মাসুদ রানা। মেজর, রিটায়ার্ড। ৭২৫০৯৫।'

'আহ্, ওসব নয়, ডার্লিঙ। আমি তোমার সত্যি পরিচয় জানতে চেয়েছি।'

হঠাৎ করে রোজালিন মে হয়ে গেল। ঢুলুঢুলু চোখে তাকে দেখল ও। 'আমি মার্সেনারি। লেয়ার্ড...একটা কাজ দিয়েছে, আরগুয়েলোকে খুন করার। তারপর...তারপর ছয়টা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টে...' মনটা বেরিয়ে যেতে চাইছে ফের। বেরিয়ে গেছে। ওটাকে ক্যাচ্ ধরার জন্যে হাত বাড়াল রানা, হলো না। পিপ করে গেছে।

'তারপর?'

'ইউরেনিয়াম আইসোটোপ...ইউ-টু থার্টি ফাইভ, আর আছে রিঅ্যাক্টর কোর। ইউরেনিয়াম ফুয়েল রড... চেইন রিঅ্যাকশন... মেল্টডাউন...'

'তুমি আবোল-তাবোল বকছ, রানা,' অসন্তুষ্ট হলো যেন রোজালিন। 'এসব তোমাকে শিখিয়েছে, তোমার মা, না ন্যানি? কেন সত্যি পরিচয়টা জানতে দিচ্ছ না

আমাদের?'

চালিয়ে যাও, রানা, কে যেন বলে উঠল ওর ভেতর থেকে। লড়াই চালিয়ে যাও। খবরদার, হার মানলেই কিন্তু সব শেষ। ভয়ঙ্কর মৃত্যু! 'বলছি তো, তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কি করব?'

'রাগ কোরো না, ডার্লিঙ! আরেকবার বলো, প্লীজ!'

'আমি মাসুদ রানা,' গলা বুজে এল ওর। 'বাংলাদেশী। মেজর, রিটায়ার্ড। বীরউত্তম। নম্বর...'

মৃদু শব্দ করে হাসল মেয়েটি। 'তুমি আসলে কোন নিউক্লিয়ার পাওয়ারের সঙ্গে জড়িত, তাই না? কোনটার সাথে, অ্যাটমিক রিসার্চ, ইন্টারন্যাশনাল কমিশন, নাকি ভিয়েনার অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি, কোনটার সাথে?'

চিন্তা করো, রানা। ভালমত ভেবেচিন্তে উত্তর দাও, নইলে কিন্তু ফেঁসে যাবে। স্বপ্নে নয়, জেগে উঠে কথা বলো। সাইমুর কি কি বলেছিল মনে করার চেষ্টা চালিয়ে যাও। লড়াই করো। 'জুয়ো খেলে অনেক টাকা দেনা হয়ে গেল, শোধ করতে না পারলে ওরা মেরে ফেলবে, তাই...পালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। এমন সময় এক...এক বুড়ো হাবড়া তার হয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিল...'

'আবার সেই ফালতু কথা?' খেপে উঠল রোজালিন। গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'কে তুমি?'

'আমি...' না, রোজালিন তো নয়! ও আর কেউ। অথচ নাকে রোজালিনের মিলি ডি প্যাটোর চমৎকার মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে রানা। তাহলে কে ও? বুঝেছি। ডাক্তারনী মেয়েটা, কি যেন নাম? ও হ্যাঁ, মে।

অন্ধকার এক টানেল ধরে ভেসে যেতে যেতে চিৎকার করে উঠল ও। 'রানা! আমি মাসুদ রানা। মেজর, রিটায়ার্ড! কানে তুলো দিয়ে রেখেছ নাকি, শুনতে পাও না?'

'মেইন গেটের রিমোট কন্ট্রোল কে দিয়েছিল তোমাকে?' একটু নরম হলো গলাটা। 'ক্যাসেলের অ্যালার্ম সিস্টেম, লকিঙ সিস্টেম, এসব ভেতরের কথা তুমি জানলে কি করে, কে বলেছে?'

এবার মুখে তালা মারা উচিত, ভাবল রানা, কথা বেশি বলা ঠিক হচ্ছে না। অনিশ্চিত মেঘের মত ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়।

'কে বলেছে?' একটা পুরুষ কণ্ঠ। নিশ্চই লেয়ার্ড হারামজাদা।

রানা নিরুত্তর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, যেন বুঝতে পারছে না।

'কে, রোজালিন?'

উত্তর নেই। পরিস্থিতি কিছুটা নিজের নিয়ন্ত্রণে এসেছে মনে হলো রানার। চোখের ঝাপসা ভাব কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। লেয়ার্ড আর মেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। 'ও পুরো কাবু হয়নি,' সাইমুরকে রেগেমেগে বলতে শুনল ও। 'ডোজ বাড়াও!'

'সেটা ঠিক হবে না,' মাথা দোলাল মে। 'মরে যেতে পারে।'

'তাহলে আর কিছু করো!'

খানিক সব চুপচাপ। সাড়া নেই কোন। তারপর, মনে হলো হঠাৎ করেই

কিছুটা সামনে ঝুঁকল যেন রানার দেহ, অদৃশ্য এক ঢাল বেয়ে নিচের দিকে রওনা হলো ও। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে গতি, ওর মধ্যেই দুই কানে চাপ অনুভব করল—হেডফোন! মিউজিক বাজছে। মধুর সুরের তরল মিউজিক পতনের গতি কমিয়ে দিল রানার, শীতল পানির মত গা ভিজিয়ে দিচ্ছে। আহ্, কী আরাম! ঘুম পাচ্ছে। কেমন হয় একটা ঘুম দিলে? কেমন আবার, ভালই তো হয়! ভীষণ ক্লান্ত ও, কিছু সময় ঘুমিয়ে নিলে…হঠাৎ একটা গলা বাঁ হাত ঢোকাল ওর চিন্তায়। 'মাসুদ রানা!' পুরুষের গলা।

'কি?'

'এখানে কেন এসেছ তুমি?'

'বেড়াতে। অ্যাসকটে…'

'আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, বাজে বকে লাভ হবে না, বুঝতে পেরেছ? সত্যি বললে বেঁচে যাবে তুমি। বলো!'

'সত্যিই বলছি। আমি মেজর মাসুদ রানা, রিটায়ার্ড। নম্বর…'

আচমকা মিউজিকের ভলিউম খুব বেশি বেড়ে যেতে চিৎকার করে উঠল ও অসহ্য, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায়। মনে হলো আস্ত ঘিলু গলে পানি হয়ে যেতে আরম্ভ করেছে বুঝি। ভয়ঙ্কর, পাগল করা আওয়াজ—উন্মত্তের মত লাফালাফি শুরু করে দিল রানা। অসহ্য, অসহ্য! ড্রাম বিট্, অজানা যন্ত্রের সুতীক্ষ্ণ কিঁচ-কিঁচ আর গিটারের উদ্দাম বাদন গরম লোহার স্পোকের মত, একদিক দিয়ে মগজ ছেঁদা করে ঢুকে মাথার অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বারবার।

তবে ভাগ্য ভাল যেমন শুরু হয়েছিল, তেমনি আচমকা থেমে গেল মিউজিক। কাউন্টার প্রোডাকটিভ ছিল ব্যাপারটা। মিউজিক থামতেই প্রতিটি পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা কয়েক মুহূর্তের জন্যে। চিন্তাশক্তিও। এখন আবার খুব মৃদু সুরে বাজছে মিউজিক। তার মানে রানার উত্তর যদি লেয়ার্ডের মনমত না হয়, তাহলে ফের একই কাণ্ড ঘটাবে সে। হাই ফ্রিকোয়েন্সির উন্মাতাল মিউজিক-পাগল করা যন্ত্রণা।

'তুমি এখানে কোনও মিশনে এসেছ, তাই না, মাসুদ রানা?' আলাপী ঢঙে শুরু করল রজার সাইমুর। 'সেটা কি?'

'আপনি আসতে বলেছিলেন,' থেমে থেমে বলল ও। 'তাই এসেছি।'

'আমার বিশ্বাস অ্যাসকটের ঘটনাটা তুমিই ঘটিয়েছিলে, আমি যাতে আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হই,' মাথা দোলাল লেয়ার্ড। 'কার হয়ে এসেছ তুমি?'

রানা নিরুত্তর।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চাবুক হানল লেয়ার্ড। 'কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ?'

আবোল তাবোল বকতে শুরু করল ও। 'নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট…স্টীল ভেসেলের মধ্যে থাকে কোর…পুরু পড়ের মত দেয়াল…'

'আসল কথা বলো, রানা। আমি ফালতু কথা শুনতে চাই না। কে পাঠিয়েছে তোমাকে? কোন্ এজেন্সি?'

উত্তর নেই।

'শেষবারের মত জানতে চাইছি আমি, মাসুদ রানা। বলো!'

ভথৈবচ।

একটুপর আবার শুরু হলো শব্দ যন্ত্রণা। খুলি হয়ে সারাদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের মত বয়ে বেড়াতে লাগল হাই ফ্রিকোয়েন্সি মিউজিক, অবর্ণনীয় কষ্টে চেঁচিয়ে, দুমড়ে-মুচড়ে, কুঁকড়ে তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকল রানা মরিয়া হয়ে। এবার সহজে মুক্তি দিল না বিজ্ঞানী, একটু একটু করে ভলিউম বাড়িয়েই চলল। রানাকে ঘামের সাগরে চুবিয়ে অবশেষে যখন থামল, ও তখন প্রায় বদ্ধ উন্মাদ হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। চ্যাচাচ্ছে ঘরদোর ফাটিয়ে। পরিস্থিতি মোটামুটি আয়ত্তে আনতে প্রচুর সময় ব্যর্থ হলো। নরক দর্শন শেষে ফিরে রানা এখনও কাঁপছে ঠক্-ঠক্ করে, চোখ বিস্ফারিত।

'কে পাঠিয়েছে তোমাকে, রানা?'

'কোরের ভেতরের বারো ফুট লম্বা ফুয়েল রড...'

বুকের মধ্যে চাপা উল্লাস অনুভব করল ও। ঠেকানো গেছে! ঠেকিয়ে দিয়েছে রানা মে হরোইৎজকে। যে ড্রাগই ব্যবহার করে থাকুক সে, কার্যকরিতা নষ্ট হয়ে গেছে তার। সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণা, অসহনীয় হলেও শুষে নিয়েছে ওর মস্তিষ্ক।

'মুখ খোলো, রানা!'

'জাহান্নামে যাও তুমি, শয়তানের বাচ্চা লেয়ার্ড!' খেঁকিয়ে উঠল ও। চোখ বুজে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল।

'না!' একদম কানের কাছে মেকে এতজোরে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল রানা যে আপনাআপনি কুঁকড়ে গেল। 'আর না! এবার নির্ঘাৎ মরে যাবে লোকটা।'

'তাহলে? আসল কথাই তো শোনা হলো না!' বলে উঠল বিজ্ঞানী। 'কে দিল ওকে রিমোট কন্ট্রোল...'

'বলেছি তো, কাল আমার রুমে তোমার ভাইঝি ছাড়া কেউ যায়নি। ও-ই নিয়েছে। এর কাঁধে ভর করে পালাবার ফন্দী করেছিল সে।'

হঠাৎ করে ভেলভেটের মত মসৃণ এক টানেলে সেঁধিয়ে গেল রানা, নিচের দিকে ছুটছে, গতি মন্থর। ওর মধ্যেও লেয়ার্ড আর মের আলোচনা কানে গেল, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারল না কি বলছে ওরা।

একটু পর গাছের গুঁড়ির মত দুই বাহু তুলে ফেলল ওকে বেড থেকে। বন্ধ চোখের সামনে পৃথিবী ঘুরতে শুরু করল বন-বন্ করে, তারপরই সব অন্ধকার।

পরেরবার যখন জ্ঞান ফিরল, নিজেকে আবছামত চেনা এক রুমে দেখতে পেল রানা—সেই ইস্ট গেস্টরুম। পরিচিত একটা চেহারাও দেখতে পেল—পিটার! ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে তৃপ্তির হাসি হাসছে। কড়া স্কটিশ অ্যাকসেন্টে বলল সে, 'গুইড ইভনিং! অনেকক্ষণ থেকে স্যারের ডিনার সার্ভ করার জন্যে অপেক্ষা করছি, সময় কি হয়েছে? বলি দেয়ার আগে লেয়ার্ড তোমাকে তরতাজা দেখতে চান কি না!'

'ভারি অমায়িক মানুষ,' বলে হাসল রানা। 'তোমার লেয়ার্ড। একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

মাথা দোলাল সে। 'পারো। তবে জবাব দেব কি না তা আমার ব্যাপার।'

'এখন দিন, না রাত?'
'তুমি কালা নাকি? বললাম না ইভনিং?'
'কি বার?'
'মঙ্গলবার,' বলে সোজা হলো পিটার। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করল। দু'মিনিট পর বড় এক ট্রেতে খাবার আর ছোট ফ্লাস্ক ভর্তি কফি নিয়ে ভেতরে ঢুকল ফ্রেঞ্চ-কাট। আজ তার মুখে হাসি দেখল রানা।
'নাও, খেয়ে নাও,' দানব বলে উঠল। 'খেয়ে কৃতার্থ করো আমাদের। কয়েক ঘণ্টা পর আবার রওনা হতে হবে, জোগাড়যন্ত্র করতে হবে তার।'
'কোথায়?' তাড়াতাড়ি জানতে চাইল ও।
হেসে মাথা দোলাল লোকটা। 'দেখতেই পাবে।'
বেরিয়ে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল। ঘটাং শব্দে লেগে গেল ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক লক্।

বিএসএস, লন্ডন। একইদিন দুপুরের ঘটনা।
নিজের রুমে গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন সংস্থা প্রধান মারভিন লংফেলো। তাঁর মুখোমুখি বসে আছে এক মাঝবয়সী লোক। কমিউনিকেশনস অফিসার। একটু আগে গ্ল্যাসগো হয়ে আসা এক গোপন বার্তা জানাতে এসেছে চীফকে। কোঁচকানো কপাল চুলকালেন তিনি, উদ্বেগ বাড়ছে একটু একটু করে।
'কখনকার ঘটনা বললে?' প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।
'কাল রাতের। মানে, আজই খুব ভোরের, দেড়টার দিকে। গোলাগুলি, কার চেজ হয়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে কয়েকবার সাইমুর ক্যাসেলের কাছে। আমাদের ওখানকার সোর্স বলছে মাসুদ রানার স্যাব সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। দুপুরের পর ওটাকে ক্যাসেলে নিয়ে গেছে লেয়ার্ডের লোকজন। দূর থেকে কারের অবস্থা দেখে মনে হয়েছে ওটাকে কাটাছেঁড়া করা হয়েছে টর্চ দিয়ে।'
'এখন নজর রাখা হচ্ছে ক্যাসেলের ওপর?'
নেতিবাচক মাথা দোলাল লোকটা। 'খুব কঠিন অবস্থা, স্যার। মারকান্ডির বেশিরভাগ লোকই লেয়ার্ডের কর্মচারীর মত, ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বাইরের কেউ ওদের চোখে পড়ে গেলে প্রাণে বাঁচবে না।'
'আরগুয়েলো?'
'কাল দুপুরে শেষবার নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে ওকে। এফবিআই ভাল করে বুঝে ওঠার আগেই গা ঢাকা দিয়েছে।'
আরও কিছু সময় ভাবলেন লংফেলো, তারপর চেয়ার ছেড়ে পিছনের জানালা দিয়ে সন্ধের রিজেন্ট'স পার্কের দিকে তাকালেন। আগেও এই রকম বড়-বড় বিপদে পড়েছে মাসুদ রানা, বহুবার। এবং শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরেও এসেছে। এবার কি ঘটেছে ওর? খুব খারাপ কিছু? তাহলে সময়মত সিগন্যাল পেন কেন ব্যবহার করল না? এর মানে কি গাড়িতে ও ছিল না দুর্ঘটনার সময়? আর কেউ ছিল? কিন্তু তাই বা হয় কি করে? কাকে ধাওয়া করেছিল লেয়ার্ডের লোকজন?
ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। 'চেজের সময় গাড়িতে কে ছিল শিওর হওয়া যায়নি?'

'না,' মাথা দোলাল কমিউনিকেশনস অফিসার।

'আরগুয়েলোকে ফলোও করেনি রানা?'

'করেনি।'

'তার মানে ও ক্যাসেলেই আছে,' দৃঢ় আস্থা ধ্বনিত হলো তাঁর কণ্ঠে।

'মানে?'

'মানে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। রানা বন্দী।'

'ওয়ারেন্টসহ স্পেশাল ব্রাঞ্চকে পাঠানো যায় তাহলে, কি বলেন...'

'ওয়ারেন্ট! কোন্ গ্রাউন্ডে? বিদেশী এক এসপিওনাজ এজেন্টকে পাওয়া যাচ্ছে না?' মাথা দোলালেন বিএসএস চীফ। 'প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া... ফোর্স নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করে আনতে হবে, মাসুদ রানা সে চীজ নয়। হলে ওকে এ কাজে পাঠাতাম না আমি। তুমি বরং আমাদের ওয়াচ টীমকে সতর্ক করে দাও। নজর রাখতে বলো ক্যাসেলের ওপর। আই মীন, নজর রাখার চেষ্টা করতে বলো।'

লোকটা বেরিয়ে যেতে আবার ভাবতে বসলেন বিএসএস চীফ। রানার গাড়ি ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারটা যেন কেমন কেমন লাগছে।

ঠিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। কি ভেবে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি, ঢাকায় খবর দিতে হয়।

নয়

খেয়েদেয়ে অনেক সুস্থ বোধ হলো রানার। দেহে শক্তি ফিরে আসতে লাগল একটু একটু করে। তন্দ্রামত এল কয়েকবারই, কিন্তু ঘুম এল না, সারারাত প্রায় জেগেই কাটাল। শুয়ে শুয়ে টর্চার চেম্বারে শোনা লেয়ার্ড আর মের ছাড়া-ছাড়া কথাগুলোর ভেতরের অর্থ খুঁজে বের করতে চাইল ও, তাও হলো না।

ভোর হতে না হতে পিটার এসে হাজির। উঠে তৈরি হয়ে নিতে হুকুম দিল, নাস্তা খেয়ে বেরুতে হবে। ঠিক আটটায় হাতকড়া পরিয়ে ভ্যানে তোলা হলো রানাকে। ভ্যানের গায়ে অস্পষ্ট গোল্ড লেটারিঙে লেখা: রিচি গিলবার্ট, বেকার অ্যান্ড কনফেকশনার, মারকান্ডি। বোঝা গেল এ মুহূর্তে বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে চায় না লেয়ার্ড রজার সাইমুর। পিটারের নেতৃত্বে চার সশস্ত্র গার্ড উঠল ওর সঙ্গে।

ক্যাসেল থেকে প্রথমে গ্রাম পর্যন্ত এল ভ্যান, টের পেল ও। এখানে ভ্যান থেকে নামিয়ে তোলা হলো এক সিকিউরিটি ট্রাকে। সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল শব্দ দুটো স্টেনসিল করা ওটার গায়ে। এরপর শুরু হলো দীর্ঘ চলা। বাইরে দেখার মত একটা ফুটোও নেই ক্যাবের গায়ে, কাজেই কোনদিকে চলেছে অনুমানও করতে পারল না রানা। একটানা ছয় ঘণ্টা পথ চলে থামল ভ্যান। কিছু দেখা না গেলেও সময়ের সাথে গতি মোটামুটি মিলিয়ে একটা অনুমান করে নিয়েছে ও, এরমধ্যে কম করেও দুশো মাইল পেরিয়ে এসেছে ট্রাক।

ট্রাক থেকে নেমে দু'পা যেতেই একটা নিচু ছাদের বিল্ডিঙ। তার ভেতরে নিয়ে আসা হলো ওকে। হাতকড়া খুলে বাথরুমের প্রয়োজন সেরে আসার হুকুম দেয়া হলো। এরপর খাওয়া দাওয়ার পালা। পিটারসহ চার সশস্ত্র গার্ডের পাহারায় বসে খেতে হলো ওকে। ভেবেছিল খাওয়া শেষে আবার হাতকড়া পরানো হবে, কিন্তু হলো না।

চারটের দিকে বাইরে 'কপ্টারের আওয়াজ শোনা যেতে কাছে এসে দাঁড়াল পিটার। ঘাড়ে অস্ত্র দিয়ে জোর এক খোঁচা মেরে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'লেয়ার্ড এসে পড়েছেন। চলো। তবে সাবধান, কোনরকম চাল চালতে গেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব, মনে রেখো।'

চারটে অটোম্যাটিক অস্ত্রের কড়া পাহারায় বেরিয়ে এল রানা। পিটারের হাত এ মুহূর্তে খালি, ওর পাশাপাশি হাঁটছে সে। ট্রাক নেই আগের জায়গায়, সামনে খুদে একটা এয়ারস্ট্রিপ। ট্রাকটা সরাসরি বিল্ডিঙে ঢোকার মুখে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে তখন ব্যাপারটা চোখে পড়েনি। স্ট্রিপের এক মাথায় একটা চকচকে এগজিকিউটিভ জেট দাঁড়িয়ে আছে দেখল ও, কপ্টারটা তার কাছেই নেমেছে।

'হাঁটো!' পিছন থেকে মৃদু ঠ্যালা দিল ওকে পিটার। 'প্লেনের দিকে।'

ওটা একটা গ্রুমম্যান গালফস্ট্রীম, বুঝল ও, খুবই দামী এগজিকিউটিভ জেট। এঞ্জিন চালু রয়েছে। ওটার গায়ে অ্যালডান অ্যারোস্পেস ইনকর্পোরেটেড লেখা। হাঁটার ফাঁকে ঘুরে বিল্ডিংটার দিকে তাকাল ও। সেখানেও একই নাম। পাশে লেখা: ফ্লাইং ক্লাব, প্রাইভেট। রানার খেয়াল হলো, রজার সাইমুর যে সমস্ত কোম্পানির মালিক, এটা তার একটা।

ভেতরে, ফ্লাইট ডেক সংলগ্ন মোটামুটি বড় এক স্পেসে বসা লেয়ার্ড ও মে। সম্ভবত অফিস ওটা। বিজ্ঞানীর সামনের টেবিলে ম্যাপ ইত্যাদি অনেক হাবিজাবি। দ্বিতীয় সারিতে দুই পাশে দুই গার্ডের মাঝখানে নতমুখে বসে আছে রোজালিন। কোনদিকে নজর নেই। রানাকে দেখে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হলো না রজার বা মের, চোখ তুলে একবার তাকাল না পর্যন্ত। গল্পে মশগুল। প্লেনের পিছনদিকে বসানো হলো ওকে, প্রায় পরক্ষণে গড়াতে আরম্ভ করল গ্রুমম্যান। ছোটখাট এক দৌড় সেরে আকাশে উঠে পড়ল।

নিক আর ফ্রেড বসেছে রানার দু'দিকে। ব্যাটাদের জন্যে বাইরেটা দেখতে পাচ্ছে না ও, কোন্ ফ্লাইট পাথ অনুসরণ করছে জেট, মেঘের মধ্যে দিয়ে চলছে বলে বোঝার কোন পথ নেই।

প্রায় এক ঘণ্টা ওড়ার পর হাইট কিছুটা লুজ করল পাইলট জেটের বাঁদিকের পাখা কাত হলো। তখনই দূরে উপকূলরেখা দেখতে পেল ও। অনেক দূরে। তার একটুপর বিশাল সমতল জমি, পাহাড়, বীচ, বেশকিছু সাদা হলিডে বিল্ডিঙ ইত্যাদি ডিঙিয়ে ইনল্যান্ডের ওপর চলে এল জেট। এখানে-ওখানে ছাড়াছাড়া কিছু বাড়ি, ফার্মহাউস, সাপের মত আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখা গেল। ওগুলো ছাড়াতে দেখা দিল বড় এক পুরানো শহর।

দ্রুত স্মৃতির পাতা হাতড়াতে শুরু করল রানা। দৃশ্যটা চেনা। আগে এসেছে

ও এখানে। কোথায় জায়গাটা? কোথায়? জেট নামছে। দুই সারি সীটের মাঝের আইল জুড়ে বসে আছে পিটার। নিজের সীটে বসে কাত হয়ে ঝুঁকে অন্যপাশে বসা লেয়ার্ডের নির্দেশ শুনছে মন দিয়ে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে ঘন ঘন। কথার ফাঁকে থেকে থেকে ম্যাপে চোখ বোলাচ্ছে বিজ্ঞানী, নোট নিচ্ছে।

এরমধ্যে রোজালিনের সাথে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে রানার। মুখ শুকনো মেয়েটির, চোখের নিচে হালকা কালির প্রলেপ। যথেষ্ট মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে।

বাইরে তাকিয়ে থাকল রানা। আরও নেমেছে জেট। হঠাৎ করেই জায়গাটা চিনে ফেলল ও। পারপিগনান! ফ্রান্স! অতীতে স্বাধীন কিংডম ছিল পারপিগনান, কিংস অভ মাজোরকা ছিল এর শাসক। বর্তমানে ফ্রান্সের অধীন। আগে এসেছে রানা এখানে।

পাক খেয়ে পারপিগনান এয়ারপোর্টের দিকে এগোল জেট। শহর থেকে তিন-চার মাইল দূরে জায়গাটা। দৌড় শেষ করে টার্মিন্যাল ভবন থেকে একটু দূরে, পেরিমিটার ফেন্সের কাছাকাছি থামল। দরজা খোলার আয়োজন করছে পিটার, পাশ থেকে ফ্রেঞ্চ কাট নিক শক্ত মুঠোয় রানার এক বাহু চেপে ধরল। 'বাইরে আমার সাথে ভদ্রলোকের মত হাঁটবে, কেমন?' বলল সে নিচু গলায়। 'লেয়ার্ডের অনুমতি আছে, কোনরকম বেচাল দেখলেই তোমাকে গুলি করব। কথাটা মনে রেখো।'

দরজা খোলা হলো। উঠে পড়ল রজার সাইমুর, রানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসির ভঙ্গি করল। 'আশা করি আমাদের যাত্রা উপভোগ করেছেন আপনি, মিস্টার রানা। অবশ্য বাইরের কিছু যে দেখতে পাননি, তা জানি। মন খারাপ করবেন না। আমার কালকের ফ্লাইটে আপনি যাতে একটা রিঙসাইড সীট পান, সেদিকে খেয়াল থাকবে আমার।'

রানা হাসল। 'কালকের ফ্লাইট আরও উপভোগ্য হবে নিশ্চই?'

'তা হবে,' পাখি-নড করল বিজ্ঞানী। 'হাজার গুণ বেশি উপভোগ্য হবে, কোন সন্দেহ নেই।' তিড়িং বিড়িং পায়ে নেমে গেল সে প্লেন থেকে। মে অনুসরণ করল। পাশ কাটাবার সময় মুচকে হাসল ওর দিকে ফিরে। অনেকটা সৌজন্যের হাসি। একই সঙ্গে দুই গার্ড পাহারা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে গেল রোজালিনকে। তার উদ্দেশে চওড়া হাসি দিল রানা। বোঝাতে চাইল ঘাবড়িয়ো না, ধৈর্য ধরো।

বিশাল এক হ্যাঙ্গারের কাছে দাঁড়িয়েছে গ্রুমম্যান। তার সঙ্গেই একটা ছোট অফিস বিল্ডিঙ। মাথায় অ্যালডান অ্যারোস্পেস (ফ্রান্স) লেখা নিওন সাইন জ্বলছে। রানাকে নিয়ে সেদিকে এগোল ওর দুই গার্ড, পিটার সামনে। অফিসটা তারকাঁটার পেরিমিটার ফেন্সের মাত্র কয়েক গজ এপাশে। বেশ নিচু ফেন্স। কয়েক জায়গায় আবার ছেঁড়া। ওপাশে একটা রেললাইন, সোজা পারপিগনানের দিকে চলে গেছে। তারপরই চওড়া রাস্তা—রুট ন্যাশনেল। প্রচুর গাড়ি রাস্তায়, ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শহরের দিকে ছুটে চলেছে।

নিজের পাহারাদারদের দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। একদম সহজ স্বাভাবিকভাবে হাঁটছে লোকগুলো, দেখে মনেই হয় না ওকে গার্ড দিয়ে নিয়ে

চলেছে। টারমাকে কাছে-দূরে বেশ কয়েকজন গ্রাউন্ড ক্রুকে দেখা যাচ্ছে, নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত দেখাচ্ছে ওদের। কাছের ছেঁড়া ফেন্সের ওপর দিয়ে নজর ঘুরে এল রানার। ত্রিশ সেকেন্ড, ভাবল ও, সুযোগ পেলে মাত্র ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ওখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে ও। খুব সহজ হবে না কাজটা, সহজে হাল ছাড়বে না স্কটিশ হারামজাদাগুলো। তবু, রানা প্রায় নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত ও সফল হবেই। যদি সুযোগটা পাওয়া যায়।

লেয়ার্ড আর মে অফিসে ঢুকে পড়েছে, রোজালিনকে নিয়ে ঢুকছে তার দুই গার্ড, এমন সময়, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এল সুযোগটা। হ্যাঙ্গারের কোণা ঘুরে খোলা জায়গায় এসে পড়ল একদল লোক–কমার্শিয়াল এয়ার লাইনারের ইউনিফর্ম পরা। আট-দশজনের কম নয়। কথা বলছে, হাসছে। সন্ধের ম্লান আলোয় তাদের ক্যাপের গায়ে লেখা সোনালী অক্ষরগুলো পড়তে পারল রানা কোনরকমে। ই. এ. এস–ইওরোপিয়ান এয়ার সার্ভিসেস। ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চে কথা বলছে ওরা। দলটার পিছনে দুই ফ্রেঞ্চ কাস্টমস অফিসারও আছে। প্রায় একই মুহূর্তে মাইলখানেক দূরে লম্বা একটা ট্রেন দেখতে পেল ও। এদিকেই আসছে। শহরের দিকে যাবে ফেন্সের ওপাশ দিয়ে।

ঝুঁকিটা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে রসল ও চট্ করে। দারুণ এক সুযোগ, মিস্ করা কোনমতেই উচিত হবে না। অফিসের দরজার গজ দশেক দূরে থাকতে হাঁটার গতি কমিয়ে দিল রানা। দৃঢ় বিশ্বাস, এত মানুষের সামনে ওকে তেমন বাধা দিতে পারবে না ব্যাটারা। ব্যাপার খেয়াল হতে নিকও গতি কমিয়ে দিল, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। পিটারকে ডাকবে কি না ভাবল সে একবার, তারপর মত পাল্টে আঙুল দিয়ে খোঁচা মারল রানার পাঁজরে। 'হাঁটো!' ধমকে উঠল চাপা গলায়; 'জলদি!'

খেঁকিয়ে উঠল ও। 'আরে রাখো তোমার মীটিঙ!' এমনভাবে বলল, যেন অফিসারদের সবার কানে যায়। আঙুল তুলে দলটাকে দেখাল। 'আগে আমার বন্ধুর সাথে কথা বলব, তারপর অন্য কাজ।'

নিক আর কিছু বলার বা করার সুযোগই পেল না, চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, লম্বা পায়ে হাঁটা ধরল দলটার দিকে। 'হাই, জনি!' চেঁচিয়ে উঠল দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে। 'তুমি এখানে কি করছ?'

বিপদ টের পেয়ে আগেই থেমে গেছে পিটার, দ্রুত পিছিয়ে এল সে। ডান হাত পকেটে ভরে দিয়েছে, কিন্তু আসল জিনিস বের করার সাহস পাচ্ছে না। 'ফিরে এসো!' চাপা গলায় হুমকি দিল সে। 'এক্ষুণি! নইলে গুলি করব আমি।'

'কচু করবে তুমি, হারামজাদা!' মৃদু কণ্ঠে বলেই আবার হাঁক ছাড়ল ও। 'অ্যাই, জনি!' দ্রুত হাঁটছে।

ওদিকে অফিসারদের দলটাও প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে বিভ্রান্ত চোখে। সবার মুখে ভদ্রতার, ধৈর্যের হাসি। পিছনে লেয়ার্ডের 'ধরো ওকে, পিটার!' শুনেই দৌড় শুরু করল রানা, কয়েক লম্বা লাফে পৌঁছে গেল দলটার কাছে। আড়নজর ট্রেনের ওপর, প্রায় এসে পড়েছে ওটা। সুড়ুৎ করে দলের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা। সামনের বাধা সরিয়ে ওপাশে যেতে চাইছে।

হাত চালাবার ফাঁকে সবাই যাতে শুনতে পায়, এমনভাবে বলতে লাগল, 'খুব

দুঃখিত। বড় বিপদে পড়েছি। পিছনের ওরা গুণ্ডা, আমাকে ধরতে চায়। তাই একটু অভিনয় করতে হলো। কিছু মনে করবেন না,' ইত্যাদি বলতে বলতে দল থেকে বেরিয়ে পড়ল ও, তারপর ঝুঁকে যথাসম্ভব দ্রুত ছুটল ফেন্সের সবচেয়ে কাছের ছেঁড়া অংশের দিকে। ট্রেন তখন বড়জোর একশো গজ দূরে, বেশ জোরেই আসছে। পিছনে উঁচু গলার হাঁক-ডাক শোনা গেল, তর্ক বেধে গেছে অফিশিয়াল আর লেয়ার্ডের লোকদের মধ্যে। চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে।

কোনদিকে তাকাল না রানা, ফেন্স পেরিয়ে সোজা হয়েই ঝেড়ে দৌড় লাগাল রেললাইন এমব্যাঙ্কমেন্টের দিকে। লাইন, গ্র্যাভেল সব কাঁপছে ট্রেনের কাঁপুনির সাথে তাল রেখে। এঞ্জিনের আওয়াজের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে পিছনের সমস্ত হট্টগোল। ও জানে এখনই এসে হাজির হবে পিটার, এবং প্রয়োজন হলে গুলিও করবে। কেউ টের পাবে না গুলির আওয়াজ। কাজেই দেরি করার উপায় নেই। দৌড়ের ওপর পিছন ফিরে তাকিয়েই আঁতকে উঠল ও। ষাঁড়ের মত ছুটে আসছে পিটার।

লাইনের কিনারা ঘেঁষে আগুয়ান ট্রেনের দিকে দৌড় শুরু করল রানা। দশ পা এগিয়ে যেই বুঝল সময় হয়েছে, অমনি দুই লাফে কোনাকুনি লাইন পেরিয়ে অন্যপাশে চলে এল ও। পরমুহূর্তে ঠিক পিঠ ঘেঁষে হুস্ করে বেরিয়ে গেল এঞ্জিন, বাতাসের প্রবল তোড়ে কোটের দুই প্রান্ত ফত্ ফত্ করে উড়ল খানিক। এমব্যাঙ্কমেন্ট থেকে নেমে পিছনে তাকাল রানা। না, নেই পিটার।

সময় নষ্ট না করে রুট ন্যাশনেলের দিকে ছুটতে শুরু করল। ট্রেন যথেষ্ট লম্বা, বেশ কিছু সময় পাওয়া যাবে হাতে, এরমধ্যে সরে পড়তে হবে যত দূরে সম্ভব। দুই মিনিটে রাস্তায় পৌঁছে গেল ও। হাত তুলে একটা ঝক্কর মার্কা পিক-আপ্ ট্রাক থামাল হাঁপাতে হাঁপাতে।

'পারপিগনান যাচ্ছেন?' ফ্রেঞ্চে প্রশ্ন করল ড্রাইভারকে।

মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

'লিফট?'

'উঠুন,' মুখ নাচিয়ে পাশের সীট দেখাল সে।

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘন ট্রাফিকে মিশে গেল পিক-আপ্। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে পিছনে তাকাল রানা। নেই কেউ। থাকার কথাও নয়, ব্যর্থ হয়ে নিশ্চই তক্ষুণি ফিরে গেছে পিটার, ভাবল ও। অন্য কোন সংক্ষিপ্ত পথ ধরে হয়তো এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে পারপিগনানের দিকে। লেয়ার্ড এখানে নিঃসন্দেহে সুসংগঠিত, তার জন্যে এসব কোন ব্যাপারই নয়। হয়তো সামনে কোথাও ওর জন্যে ওঁৎ পেতে অপেক্ষা করবে তার লোকেরা। হয়তো ফুল-স্কেল কোম্বিং অপারেশন চালাবে ওকে ধরার জন্যে। মোটকথা এ পর্যায়ে রানাকে কোনমতেই মুঠোর বাইরে থাকতে দেবে না সে।

হেডলাইট জ্বেলে দিল ড্রাইভার। পাশ ফিরে রানাকে দেখল কিছু সময়। 'শহরে কোথায় যাবেন?'

জবাব এড়িয়ে গেল ও। 'ক'টা বাজে?'

'নয়টা।'

রানার খেয়াল হলো, অন্য টাইম জোনে আছে ও। ব্রিটেন থেকে ফ্রান্স এক ঘণ্টা পিছিয়ে।

'উৎসবে যোগ দিতে যাচ্ছেন?'

'উৎসব?' ঘুরে তাকাল ও।

হাসল ড্রাইভার। 'আপনি বিদেশী বলে জানেন না, আজ আমাদের বাৎসরিক আনন্দ-উৎসব আর ফীস্টের দিন। আপনাকে স্বাগতম। *লা ফ্রেমি অ্যারাইভ এন পারপিগনান!*'

'ধন্যবাদ। খুব বড় উৎসব?'

'খুব বড় মানে! চলুন না, ভিড়ে পা ফেলতেই হিমশিম খেতে হবে আপনাকে। হাজার হাজার মানুষের মেলা বসে গেছে এতক্ষণে।'

খুশি হলো রানা। খেয়াল হলো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রতিটি শহরেই বছরে একবার এই বিশেষ উৎসব হয়। রঙবেরঙের মিছিল, উদ্দাম নাচ-গান, পরস্পরকে ফুল উপহার দেয়া, কার্নিভাল শো আর বেহিসেবী খাওয়া-দাওয়া। মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। পারপিগনানে একে বলে দ্য গ্রেট ফীস্ট অভ সেইন্ট জন।

সন্ধের পর অলিম্পিয়ান সেরিমনির মত কয়েকজন রানার জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এখানকার সর্বোচ্চ পয়েন্ট মাউন্ট ক্যানিগোর চুড়োর নির্দিষ্ট বড় এক মশালে আগুন জ্বেলে দেয়ামাত্র অনুষ্ঠান শুরু হয়। চলে মাঝরাত পর্যন্ত।

ভালই, মনে মনে হাসল। এত ভিড়ের মধ্যে ওকে পাকড়াও করা লেয়ার্ডের পক্ষে বেশ কঠিনই হবে।

দশ

শহর কেন্দ্রের প্লেস দো লা রেজিসট্যান্সে নেমে পড়ল রানা। মানুষের ভিড়ে সত্যিই পেভমেন্টে পা রাখা দায়। রাস্তার ট্রাফিক শামুকের গতিতে এগোচ্ছে, প্রচুর পুলিস রয়েছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে। মহাব্যস্ত।

ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল ও। বেশ কয়েক বছর আগে এখানে এসেছে, পা বাড়াবার আগে কোনদিকে কি আছে মনে করে নেয়া দরকার। ওর সামনেই সেই বড় মশাল, রানার ওখানে আগুন ছোঁয়ানোমাত্র শুরু হবে অনুষ্ঠান। তার ওপাশে এক কাঠের ব্রিজ। শহর চিরে বয়ে যাওয়া টেট নদীর দু'পারের সংযোগ রক্ষা করছে ওটা। আপাতত গাড়ি আসা-যাওয়া বন্ধ ওর ওপর দিয়ে।

পদচারীদের জন্যে অল্প জায়গা রেখে বাকিটা জুড়ে তৈরি করা হয়েছে স্টেজ। মিউজিশিয়ানরা *সারডানা* বাজাচ্ছে ওখানে। ব্রিজের ওপারে মিনারের মত উঁচু লাল ক্যাসটেলাইট, বা পুরানো শহরের প্রবেশদ্বারের কাছেও প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছে। কিছু একটা হচ্ছে ওখানে, এতদূর থেকে বোঝার উপায় নেই। তাড়াতাড়ি আসল কাজ সারা দরকার, ভাবল রানা। ফোন করা দরকার লন্ডনে। কাছের ডিরেক্ট ইন্টারন্যাশনাল ডায়ালিঙ সিস্টেমের ফোন বুদটা কোথায়? কতদূরে?

কিন্তু এখানে ওই লাইন কতটা নিরাপদ? মোটেই নিরাপদ নয়। কাঁচের কফিনে আটকা পড়ার ইচ্ছে নেই ওর। তাছাড়া ওতে নগদ টাকা প্রয়োজন, পকেটে ফুটো পয়সাও নেই। সঙ্গে অবশ্য আছে, গোপন জায়গায়, বের করতে নিরিবিলি জায়গা দরকার।

এ মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে জরুরী কাজ, ভাবছে রানা, সেটা হচ্ছে জনসমুদ্রে মিশে থাকা। শুধু তাতেই চলবে না, চোখ দুটোকে সজাগ-সতর্কও রাখতে হবে। বলা যায় না, এরমধ্যে হয়তো লেয়ার্ডের লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে ওর খোঁজে, ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওকে। যদি দেখা পেয়েই যায়, কি করবে, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এত মানুষের মধ্যে থেকে ওকে যে ধরে নেয়া যাবে না, তা ওরা বোঝে। বোঝে বলেই সে সবের ধার দিয়েও যাবে না। সবার অলক্ষে কোন বিষাক্ত ড্রাগ পুশ করে কাজ সারতে চাইবে।

এ মুহূর্তে পুলিসের সাহায্য চাওয়ারও উপায় নেই মাসুদ রানার। কারণ সঙ্গে কোন কাগজপত্র নেই। এ অবস্থায় ধরতে পারলে বরং সোজা ওকে আটকে দেবে ব্যাটারা, অন্তত আজ রাতের জন্যে। তারপর, হয়তো ওর কথা শুনবে তারা, কাল, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে যাবে অনেক। পা বাড়াল ও, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে শুরু করল সামনে কোথায় সাইড স্ট্রীট আছে, তার খোঁজে।

সবে দু'পা এগিয়েছে, তখনই এক কালো মার্সিডিজের ওপর চোখ পড়ল। ওর মাত্র কয়েক গজ সামনে ব্রেক কষল ওটা ট্রাফিক পুলিসের ইঙ্গিতে। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যেতে বলছে সে ওদের–গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেয়া হবে এখনই। ড্রাইভারের পাশের আরোহীটিকে দেখামাত্র রানার হার্ট একটা বিট্ মিস করল। পিটার! অন্যদের দেখল। ড্রাইভ করছে ফ্রেড, অন্য তিনজন গায়ে গায়ে লেগে বসে আছে পিছনের সীটে। সেই পাঁচ স্কটিশ গুণ্ডা।

ফ্রেড মুখ বের করে ফ্রেঞ্চে কিছু বলল পুলিস লোকটিকে, জবাবে অধৈর্যের সাথে মাথা দোলাল সে। আঙুল তুলে ফিরে যাওয়ার পথ দেখাল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেমে পড়ল পিটার, সঙ্গে পিছনের আরও দু'জন। ফ্রেঞ্চ কাট আছে ওর মধ্যে। রাস্তার ওপাশের জনারণ্যে মিশে যাওয়ার আগে ফ্রেডকে কী সব নির্দেশ দিল পিটার। মাথা বারবার ঝাঁকিয়ে সায় দিল লোকটা, তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলল। দেখতে দেখতে চোখের আড়ালে চলে গেল সবাই।

ব্রিজে জোর ড্রাম বিটের তুফান উঠল। কেউ একজন ঘোষণা করল মশাল পৌছতে আর অল্প বাকি, পৌছলেই শুরু হবে নতুন *সারডানা*।

রানা ব্যস্ত নিজের কাজে, পরিচিত একটা জায়গা খুঁজছে। প্রাচীন এক স্কয়্যার–পথের পাশের কয়েকটা কাফের চেয়ার-টেবিল সাধারণ সময়ও প্রায় পুরোটাই দখল করে রাখে সন্ধের পর। আজ নিশ্চই আরও বহুগুণ বেশি ভিড় হবে ওখানে। বাঁ মুখী এক মোড়ে পৌছল ও। এখানে রাস্তা জুড়ে গোল হয়ে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে একদল নারী-পুরুষ। বিচিত্র রঙচঙে পোশাক সবার পরনে। নাচ শুরু করার জন্যে প্রস্তুত, মশাল পৌছেছে ঘোষণা হলেই শুরু করে দেবে। সবার মুখে নিরুদ্বেগ, নির্মল হাসি। চেহারা উদ্ভাসিত।

একটা রোডসাইড কাফে পেরিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে যাচ্ছিল কেবল রানা,

এমন সময় ওপাশের ভিড় ঠেলে উদয় হলো পিটার। ঝট করে পিছিয়ে এল ও। ভিড়ের পিছনের প্রান্তে এসে গলা উঁচু করে তাকিয়ে থাকল সামনে। রাস্তার মধ্যে দিয়ে গদাইলশকরী চালে হাঁটছে দানব, তীক্ষ্ণ চোখে দু'দিকের জনতার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। রানার ডানে, একটু দূরে দেখা গেল নিককে। সে-ও একই কাজে ব্যস্ত।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না, ভেবে আবার পা চালাল রানা। প্রায় পাঁচ মিনিট চলার পর পরিচিত সেই স্কয়্যারের ইন্টারসেকশন চোখে পড়তে খুশি হয়ে উঠল। আরও দু'মিনিট পর জায়গামত পৌঁছল। জায়গাটা এক সময় পারপিগনানের অর্থনীতির মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল—নাম লজ ভি মের। এখানকার বাড়িঘর-দালানকোঠা সব ভেনিশিয়ান কায়দায় তৈরি। সেই উঁচু খিলানওয়ালা চওড়া জানালা, খিলানে তেমনি কারুকাজের ম্যাসনরি।

থেমে দাঁড়িয়ে কিছু সময় পিছনদিকে নজর বোলাল ও। না, চেনা মুখ দেখা যায় না একটাও। নিশ্চিন্তে আবার এগোল। স্কয়্যারের এক কোণের পরিচিত বার টাবাকে ঢুকে সোজা *টয়লেটির* দিকে এগোল। বেশ কয়েকটা ক্যাবিনেট এখানে। তার একটায় ঢুকে ব্যস্ত হাতে বোল্ট লাগিয়ে দিল। পরক্ষণে ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল রানা।

জুতোর হীলের বেল্ট থেকে প্রথমে বের করল চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার ছুরিটা, তারপর কোমরের পুরু চামড়ার ডবল স্টিচড্ বেল্ট খুলে ফেলল। চার ইঞ্চি পর পর খাড়া স্টিচ আছে ওটার পুরোটা জুড়ে, দেখে ডিজাইন মনে হয়। আসলে তা নয়, ওগুলো ইমার্জেন্সি কারেন্সি ব্যাঙ্ক। এইরকম জরুরী পরিস্থিতির জন্যে রাখা হয়েছে এ ব্যবস্থা। ইওরোপের প্রায় সব দেশের কারেন্সি কিছু কিছু করে আছে প্রতিটি খোপে। আটটা খোপ।

ছুরির মাথা দিয়ে যথাসম্ভব নিখুঁত করে লেজের দিকের তিন নম্বর খোপের স্টিচ্ কেটে ফেলল রানা। ভেতর থেকে বের হলো ছোট-বড় নোট মিলিয়ে কিছু ফ্রাঁ, দুশো পাউন্ডের সমপরিমাণ। বিরাট কিছু নয় ঠিকই, তবে ওর বর্তমান প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট। টাকাটা কোটের পকেটে, আর ছুরি প্যান্টের পকেটে রাখল রানা। বেল্ট পরে বেরিয়ে এল। বার থেকে এক প্যাকেট ডিস্ক ব্লিউ সিগারেট ও দেশলাই কিনে ধীরেসুস্থে ধরাল একটা। কফি অর্ডার দিয়ে চারদিকে সতর্ক নজর বোলাতে লাগল। মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে ঝড়ের গতিতে।

কফি খেয়ে বের হয়ে পড়ল রানা। যে পথে এসেছে, সে পথে চলল। পোস্ট অফিসে যাবে, ওখান থেকে ফোন করবে প্রথমে লংফেলো, তারপর ঢাকায়, রাহাত খানকে। প্রথম ফোনটা খুবই জরুরী।

রাস্তার ভিড় আরও বেড়েছে ইতোমধ্যে। নাচ, হৈ-হল্লা, মিউজিক, সব মিলিয়ে পারপিগনানের পরিবেশ সরগরম। সবই দেখছে রানা, আবার কিছুই দেখছে না। ভিড়ের মধ্যে সন্দেহজনক মুখ খুঁজছে কেবল। উৎসবের মূল জায়গা ছেড়ে চলে এল ও, দ্রুত এগোল প্লেস আরাগোর দিকে। পোস্ট অফিসটা ওখানেই, খেয়াল হয়েছে পরে।

জায়গাটা অভিজাত এক বিপণী কেন্দ্র। প্রচুর দোকান আর বার, তবে

মানুষজন খুবই কম। একটুপর প্রায় নির্জন পোস্ট অফিসে পৌঁছে গেল ও, পাথরের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল। সামনেই একসার ফোন বুদ, ডিম লাইট জ্বলছে ভেতরে। কেউ নেই ওখানে। পকেটে হাত ভরে কিছু খুচরো বের করল রানা, ওর থেকে বাছাই করে আলাদা করল এক ফ্রাঁর ছয়টা। প্রথম কলের জন্যে যথেষ্ট।

স্লটে এক ফ্রাঁ ফেলে ডায়াল টোনের অপেক্ষায় থাকল ও, তারপর কান্ট্রি আর সিটি কোড ঘোরাল দ্রুত, সবশেষে আসল নম্বর। অটো ডায়ালিঙ সিস্টেমের নানারকম আওয়াজ আসছে ওর ডান কানে, বাঁ কানে দূরের হৈ-হল্লা। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে সিকোয়েন্স কমপ্লিট হওয়ার শব্দ শুনল রানা, তারপরই এল ও প্রান্তে রিঙ বাজার পরিষ্কার আওয়াজ।

দু'বার রিঙ হতে রিসিভার তুলল কেউ। 'ডিউটি ওয়াচম্যান, ট্রান্সওয়ার্ল্ড এক্সপোর্টস। কে বলছেন?'

'এম আর নাইন ফর মারভিন...' আর এগোতে পারল না রানা পাঁজরে শক্ত কিছুর চাপ অনুভব করে। চাপা গলায় বলে উঠল কেউ, 'উট (আউট), ফাস্ট! নইলে গুলি খাবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘুরে তাকাল ও। একেবারে গায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গার্ড দলেরই সদস্য, তবে এর নাম ও জানে না।

'ফাস্ট!' আবার দাবড়ি লাগাল লোকটা। 'জলদি রাখো টেলিফোন!'

মানুষটার জন্যে আফসোস আর করুণা, দুটোই হলো ওর। এসব ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা নিতে হয়, এ জানেই না। অস্ত্র হাতে শত্রুর খুব কাছে যে আসতে নেই, অন্তত তার পায়ের আওতা থেকে বাইরে থাকতে হয়, কেউ বোধহয় একে শেখায়নি।

হাসিমুখে ঘুরে লোকটার মুখোমুখি হলো রানা, পরক্ষণে ডান হাঁটু আর রিসিভার, দুটোই একযোগে চালাল, বিদ্যুৎগতিতে। একই সঙ্গে থাবা দিয়ে তার পিস্তল ধরা হাত সরিয়ে দিল এক পাশে। জানে, এরকম সময় ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে পড়া আঙুলের টানে গুলি এমনিতেই বেরিয়ে যায়। হলোও তাই। প্রায় বদ্ধ বুদের মধ্যে বিকট শব্দ হলো গুলির, বুদের পিছনের পারটেক্সের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। দলা পাকিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল লোকটা। গোঙাচ্ছে। হাত থেকে ছুটে গেছে পিস্তল। ব্যস্ত হয়ে দুই আঘাত পাওয়া জায়গা ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল ছটফটানির ফাঁকে, কোনটাই পৌঁছল না জায়গামত।

স্থির হয়ে গেল লোকটা। নাক বেয়ে রক্ত নামছে দরদর করে। হাতের ভাঙা হ্যান্ডসেট ছেড়ে দিল রানা। গুলির শব্দ নিশ্চই কারও না কারও কানে গেছে, অতএব এখনই সরে পড়তে হবে এ জায়গা ছেড়ে। ঝুঁকে ব্যাটার অস্ত্র তুলে নিয়ে অবাক হলো–ওরই ওয়ালথার! খুশি মনে ওটা ওয়েস্টব্যান্ডে ভরে রাখল।

বেরিয়ে পড়ল পোস্ট অফিস থেকে। জায়গাটা এখন আরও নির্জন। দোকানপাটে খদ্দের প্রায় নেইই বলা চলে, সবাই ছুটেছে উৎসব কেন্দ্রের দিকে। কয়েক পা মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় আচমকা তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল বেজে উঠল কাছেই কোথাও, পরমুহূর্তে সামনে থেকে একজোড়া হেডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় চোখ

ধাঁধিয়ে গেল ওর। ওয়াল্থার বের করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল চট্ করে, কিন্তু শেষ করা গেল না কাজটা। লাউড হেইলারে মোটা একটা গলা ফ্রেঞ্চে চেঁচিয়ে উঠল, 'পুলিস, মঁশিয়ে!'

ঘুরে পালাতে যাচ্ছিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে থেমেও পড়ল ভুলটা বুঝতে পেরে। সামনে থেকে নয়, আওয়াজটা এসেছে পিছন থেকে। গাড়ি থেকে নামল দুই ইউনিফর্মড পুলিস, পিছন থেকেও এল দু'জন। গাড়ির একজন হাত বাড়াল ওর দিকে। *'সি' এস্ট প্রিভি, মঁশিয়ে। আভেজ ভোয়া আন বিলেট?'*

'পাসপোর্ট?' সপ্রতিভ উত্তর দেয়ার চেষ্টা করল রানা, যদিও জানে সর্বনাশ যা ঘটার ঘটে গেছে। 'সরি। ব্রিটিশ এমবাসিতে ফেলে এসেছি। ভেবেছিলাম এত বড় এক উৎসবের রাতে দরকার হবে না ওটা।'

'ভুল ভেবেছিলেন। বিদেশীদের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা ও-জিনিস সঙ্গে রাখার নিয়ম, সব দেশে,' বলল লোকটা। হাত বাড়িয়ে ওর ওয়ালথারটা বের করে নিল। উল্টেপাল্টে দেখে মাথা ঝাঁকাল। 'ভারি আপত্তিকর! পিটারকে খবর দাও,' মুখ না তুলে সঙ্গীকে বলল সে।

চমকে উঠল রানা। এরা তাহলে লেয়ার্ডের হয়ে খুঁজছিল ওকে? জানে কিছু করার নেই, তবু এক পলক তাকাল পিছনে। হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে লাউড হেইলারধারী ও তার সঙ্গী। একজনের অস্ত্র ওর মেরুদণ্ড সই করে ধরা, অন্যজনেরটা ঘাড়। প্রথমজনের সঙ্গী ততক্ষণে ফিরে গেছে গাড়ির কাছে, কার ফোনে কথা বলছে।

দুই মিনিটের মধ্যে সামনের বাঁক ঘুরে তুমুল বেগে ছুটে এল সেই কালো মার্সিডিজ। পিটার আর ফ্রেড আছে ওতে। রানাকে দেখে চওড়া হাসি দিল দানব। প্রথমেই ওকে হাতকড়া পরাল সে, তারপর অফিসারের সাথে নিচু কণ্ঠে মিনিটখানেক কথা বলে গাড়িতে ঠেলে তুলল রানাকে।

টেপ বার বার রিওয়াইন্ড করে কথাগুলো শুনলেন মারভিন লংফেলো। সাতবারের বার নিশ্চিত হয়ে মুখ তুলে তাকালেন। ভীষণরকম গম্ভীর চেহারা, যেন পাথরে কুঁদে তৈরি। 'ঠিকই আছে,' বললেন তিনি। 'এটা রানারই গলা।'

'আমিও শিওর, স্যার,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডিউটি অফিসার।

'কোত্থেকে ফোন করেছে ও? কত নাম্বার?'

'নাম্বার এখনও জানা যায়নি, স্যার। তবে কলটা যে ফ্রান্স থেকে এসেছে, সে ব্যাপারে আমি শিওর। ইন কামিং কোড তাই বলে।'

'তো?' ভুরু চুলকালেন বিএসএস চীফ। 'নাম্বার ট্রেস করোনি?'

'চেষ্টা করছি, স্যার,' ডিউটি অফিসার বলল। 'তবে রাত একটু বেশি হয়ে গেছে বলে…'

'আবার যোগাযোগ করো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাম্বারটা জানার চেষ্টা করো। ওরা যদি ঠিকমত সহযোগিতা না করে, আমাকে জানাও। আমি দেখব।'

'জ্বি,' দ্রুত উঠে পড়ল লোকটা। বেরিয়ে গেল।

হাত বাড়িয়ে লাল ফোনটার রিসিভার তুলে নিলেন বৃদ্ধ।

*

একে আগেই শেষ করে ফেলা উচিত ছিল, লেয়ার্ড,' বলল পিটার। 'বাঁচিয়ে রাখাতেই ঝামেলা হলো। শেষ করে দিলে...'

'থামো!' বিরক্তির সাথে হাত ঝাপটা মারল রজার সাইমুর। 'বেশি কথা বলো। বলেছি তো সময় হলে...' থেমে সরু এক টুকরো হাসি দিল।

অ্যালডান অ্যারোস্পেসের অফিসের বড় এক রূমে লেয়ার্ডের মুখোমুখি বসিয়ে রাখা হয়েছে মাসুদ রানাকে। এখনও হাতকড়া পরানো। দু'জনের মাঝে বড় এক স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ডেস্ক। ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে আছে বিজ্ঞানী। ও ধরা পড়ায় সন্তুষ্ট। ইশারায় পিটার ও তার সঙ্গীদের বেরিয়ে যেতে বলল সে। তারপর ডেস্কে ভর দিয়ে রানার দিকে মন দিল। হাসছে। একটা হাতির দাঁতের বাঁটওয়ালা কোল্ট পাইথন নাড়াচাড়া করছে। বোঝাতে চাইছে, ও তেড়িবেড়ি করলে বিপদ ঘটবে।

'হাতে অনেক জরুরী কাজ ছিল, মিস্টার রানা, আপনি পালিয়ে যাওয়ায় শেষ করতে পারিনি,' বলল সে। 'তাতে অবশ্য বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। সেরে ফেলব এখন।' কয়েক মুহূর্ত পূর্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল। 'আপনার পরিণতির কথা ভেবে সত্যি ভারি আফসোস হচ্ছে, সাহেব। আমরা একজোট হয়ে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু হলো না। এয়ারপোর্ট থেকে যে কায়দা করে বেরিয়ে গেলেন, সে কথা ভাবলে এখনও তাজ্জব লাগে আমার। আপনি যে পেশারই হোন, মিস্টার রানা, সত্যিই করিৎকর্মা লোক।'

'ধন্যবাদ।' নিজের ওপর বিরক্তি লাগছে রানার। লেয়ার্ডকে ফাঁকি দেয়ার দু'দুটো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় কিছুটা হতাশও। ক'টা বাজে এখন? আর কত দেরি উন্মাদটার অপারেশন মেল্টডাউনের কাজ শুরু হতে? আর একটা সুযোগ কি পাবে ও একে বাধা দেয়ার? দান দান তিনদানে কি সাফল্য আসবে?

'যাকে ফোনের রিসিভার দিয়ে মেরে আধমরা করেছেন, তার সাথে কথা হয়েছে আমার। ও শুনেছে ফোনে কি বলেছেন আপনি। এম আর নাইন খুব সম্ভব আপনার কোড নেম, তাই না? কিন্তু মারভিনটা কে, মিস্টার রানা?'

মাথা নাড়ল ও। 'কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তাই?' হাসি চওড়া হলো বিজ্ঞানীর। 'আমি কিন্তু পারছি। একজন নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হওয়ার সুবাদে এক সময় আমাকেও ব্রিটিশ অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টে সই করতে হয়েছিল। তাতে নামটা দেখেছি। আমার যদি কোন ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে ভদ্রলোক ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ, মারভিন লংফেলো।'

'আচ্ছা!' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। ভাবছে, লন্ডন কি ওর ফোন কল ট্রেস্ করতে পেরেছে? পারার কথা। যদি তা হয়ে থাকে, সাইমুর এবং তার চ্যালা চামুণ্ডাদের খুঁজে বের করা কোন সমস্যাই হবে না লংফেলোর পক্ষে। অ্যালডান অ্যারোস্পেসকে সনাক্ত করাও খুব কঠিন কোন কাজ নয়, ব্যাপার শুধু সময়ের।

'আপনি তাহলে ওদের হয়ে কাজ করছেন, তাই না? অর্থাৎ ওরা আমার অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে জানে। আমি জানতাম জানে। পাত্তা দিইনি। বেশি কিছু বলার সুযোগ পাননি আপনি ফোনে, কেমন?' শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা।

'ভেবেছিলেন পালিয়ে বাঁচতে পারবেন, তাই না? আপনি জানেন না, এখানে আমি আমার নিজ গ্রামের মতই ক্ষমতাবান। যে মুহূর্তে পালালেন প্রায় এককুড়ি সিভিল ড্রেসড পুলিস ইনফর্মার সেই মুহূর্ত থেকে পথে নেমে পড়েছে আপনার খোঁজে। ইউনিফর্মড পুলিসও ছিল, তার নমুনা তো দেখেছেনই।'

রানা কিছু বলার প্রয়োজন মনে করল না।

পাখি-নড করল বিজ্ঞানী। 'বিএসএসের সাহায্য আসবে, সেই আশায় আছেন? ভুলে যান। স্বয়ং ঈশ্বরেরও এখন আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাওয়ার উপায় নেই, সে পথই রাখিনি আমি। আমার অপারেশন মেল্টডাউনের চেইন অভ ইভেন্টস শুরু হয়ে গেছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই প্যাট্রিকের ফ্যানাটিক, সো-কলড্ টেররিস্টরা দখল করে নেবে...'

'ছয়টা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর,' শান্ত গলায় বলল ও। সাইমুরের প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের দেয়ালে চিড় ধরাতে যতটা পারা যায় করতে হবে। খেপিয়ে তুলতে হবে ব্যাটাকে।

হাজার ওয়াটের বালব্ জ্বলে উঠল যেন বিজ্ঞানীর মুখের মধ্যে। উদ্ভাসিত চেহারায় ঘন-ঘন নড করতে থাকল। 'ঠিক, ঠিক ধরেছেন, ছয়টা।'

আরও খোঁচা মারো, ভাবল রানা। 'একটা ইংল্যান্ডে, একটা এ দেশে, দুটো জার্মানিতে, আর দুটো আমেরিকায়।'

কপট বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত হলো লোকটার। 'সাংঘাতিক, মাসুদ রানা! ভেরি ক্লেভার! তবে এখন সেসব জেনে লাভ নেই, ঠেকাতে পারছেন না আমাকে আপনি। কেউ পারবে না।'

চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপছে না ব্যাটার, কিন্তু রানাও সহজে হাল ছাড়ার বান্দা নয়। চালিয়ে যেতে থাকল খোঁচাখুঁচি। মুখস্থ নামগুলো বলে যেতে লাগল, 'হেইশাম ওয়ান, সেইন্ট-লরেন্ট-দ্য-ইয়ক্স, নর্ড টু-টু, এমেনহ্যাম, ইন্ডিয়ান পয়েন্ট থ্রী এবং সান ওনোফ্রি ওয়ান।'

'একসেলেন্ট!' টেবিলে চাপড় মারল লেয়ার্ড। 'দারুণ আপনার স্মৃতি শক্তি! সবই মুখস্থ করে ফেলেছেন দেখছি। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাল স্থানীয় সময় দুপুর একটা, ইংল্যান্ডের দুপুর বারোটায় যখন আমাদের যাত্রা শুরু হবে, তখনই প্যাট্রিকের কড়া মাড় দেয়া সুইসাইড স্কোয়াড শুরু করবে ইনডিভিজুয়াল অ্যাসল্ট, এবং তারপর...'

'গণ্ডগোল ঘটে যাবে।'

'হোয়াট?'

'বলছি পরিস্থিতি আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে,' মৃদু হাসল রানা।

'অসম্ভব! তেমন কিছুই ঘটবে না, কারণ মেল্টডাউনের পুরোটা আমি অনেক যত্নে, অনেক সময় নিয়ে সেট করেছি। কোথাও কোন লূজ এন্ড রাখিনি। কাজেই সে ধরনের কিছু ঘটার প্রশ্নই আসে না।'

'প্রস্তুতি যতই নিখুঁত হোক, টেরোরিস্ট অ্যাকটিভিটিজ শুরু হলে পাশার ছক উল্টে যেতে পারে।'

'কি করে?' কপট বিস্ময়ের সাথে জানতে চাইল সাইমুর। 'মাই ডিয়ার রানা,

আপনি নিশ্চই ছাগল মনে করেন না আমাকে! সে ধরনের সমস্ত সম্ভাবনার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করেছি আমি আগেই, এবং সব পথ সীলও করে রেখেছি। প্রথমে প্যাট্রিককে প্রায় এক কুড়ি রিঅ্যাক্টরের নাম দিয়েছিলাম আমি, তার মধ্যে যেগুলোকে সবচেয়ে ঝুঁকিহীন, নিরাপদ মনে হয়েছে, সেগুলোকেই ও বাছাই করেছে। তারপর ওগুলোর প্রতিটিতে নিজের চারজন করে মেয়ে-পুরুষ ঢুকিয়েছে। সে প্রায় একবছর আগে। এই সময়টা ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেছি, কারণ জানি, ধৈর্যের ফল সবসময় মিষ্টি হয়।

'প্রতিটি স্টেশনে প্যাট্রিকের, মানে আমার, যে চারজন করে অনুচর আছে, তারা প্রত্যেকে বিশ্বস্ত, অনুগত। যে যার কাজের ক্ষেত্রে ভারি কর্মঠ। স্টেশনের কর্মকর্তা, সিকিউরিটি পার্সোনেলদেরও প্রিয়পাত্র ওরা। কাজেই কালকের প্রয়োজনে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ভেতরে নিয়ে যেতে কোনই অসুবিধে হয়নি...'

'ওসব অনেক সময়ই ব্যাকফায়ার করে,' ভেতরের উদ্বেগ চেপে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা।

'উঁহু! সে ধরনের কোন অস্ত্র নয় ওগুলো। ছোটখাট।'

তার চোখে সেই অশুভ, সুপ্ত লাভার নড়াচড়া দেখতে পেল ও। অস্বস্তি লেগে উঠল। পাগলামির কোন লক্ষণই নেই ওখানে। তার মানে এক-আধটু নয়, পুরোই পাগল লোকটা। বদ্ধ উন্মাদ। কোন সন্দেহ রইল না তাতে রানার। এ ধরনের ঝুঁকি একমাত্র উন্মাদই নিতে পারে।

'সময়মত বড়জোর কয়েক মুহূর্তের জন্যে প্রয়োজন হবে ওসব,' বলে চলল বিজ্ঞানী। 'তাও দেখানোর জন্যে। কোনরকম রক্তপাত ঘটানোর জন্যে নয়। কন্ট্রোল রূম দখল করার সময় প্রয়োজন হবে বলে ওগুলো দেয়া হয়েছে ওদের।'

'এদের কতখানি চেনেন আপনি?'

'আমি? একটুও না! ওরা প্যাট্রিকের লোক, সেই ভাল চেনে ওদের। আমি যেভাবে বলেছি, ঠিক সেভাবেই লোকগুলোকে চালিয়েছে সে। খুবই বুদ্ধিমান মানুষ প্যাট্রিক। অনুমান করেছিল, আমার নির্দেশ ঠিকমত পালিত হচ্ছে কি না, অন্য কাউকে দিয়ে আমি তা হয়তো যাচাই করে দেখব। সত্যি সত্যি তাই করেছি আমি, এবং কোন খুঁত পাইনি তার কাজে। এতে কি প্রমাণ হয়?'

'প্রমাণ হয় মানুষটা খুবই বিশ্বস্ত,' বলল রানা। লেয়ার্ডকে খুশি হয়ে উঠতে দেখে যোগ করল, 'কাজে কোন ফাঁক রাখেনি সম্ভবত এইজন্যে যে সময়মত নিজের লোকেদের সাহায্যে পুরো অপারেশনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে সে। মুক্তিপণ যদি কিছু আদায় হয়, সব নিজের পকেটে ঢোকাবে বলে।'

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'সে সম্ভাবনার কথাও ভেবেছি,' চওড়া হাসি দিয়ে বলল। 'সেই জন্যেই আপনাকে দিয়ে অপারেশন শুরুর আগেই ওকে পরপারে পাঠাতে চেয়েছিলাম, তা আপনি তো...সে যাক্, বিকল্প ব্যবস্থা করেছি আমি। আজ রাতেই এখানে আসছে প্যাট্রিক, আমার কপ্টারে চড়ে। পথের মাঝে ওকে গুলি করে সাগরে ফেলে দেবে আমার লোক।'

'বাহ্, এ তো খুবই সহজ সমাধান। তাহলে আমাকে টাকা সাধাসাধির কি দরকার পড়েছিল?'

চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল তার। 'ভেবেছিলাম আপনি কত ওস্তাদ মার্সেনারি, তা পরখ করে দেখব। উপযুক্ত মনে হলে পরে পিটারের জায়গায় আমার সহকারী হিসেবে নিয়ে নেব আপনাকে। তখন কি আর জানতাম আপনি আসলে কে?'

চুপ করে থাকল ও।

'এ তো গেল একদিকের নিরাপত্তার কথা,' বলল বিজ্ঞানী কয়েক মুহূর্ত পর। 'আরও আছে। যে মুহূর্তে কন্ট্রোল রূমের দায়িত্ব ওরা নেবে, মাস্টার কন্ট্রোলের সাথে যোগাযোগও সেই মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, নিজেদের বন্দী করে ফেলবে ভল্টের মত কন্ট্রোল রূমের ভেতরে। একই সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সাথে নিজেদের কমিউনিকেশন লাইনও কেটে দেবে। তখন কেবলই আমার সাথে যোগাযোগ থাকবে ওদের, আমারই এক কোম্পানির তৈরি হাই-পাওয়ারড্ ট্রান্সিভারের মাধ্যমে। ফ্রিকোয়েন্সি সেট করা আছে বিশেষ ওয়েভলেংথে, বাইরের কেউ ইন্টারসেপ্ট করতে পারবে না। যদি পারেও; যদিও সে সম্ভাবনা একেবারেই নেই, আমার নির্ধারিত বিশেষ কোড না শোনা পর্যন্ত সাড়াই দেবে না ওরা।'

খানিক নিঃশব্দে হাসল লেয়ার্ড। 'একমাত্র আমি, আমিই পারি বিশেষ এক কোড ওয়ার্ড উচ্চারণ করে ওদের ঠেকাতে। যদি আমার দাবি সবাই মেনে নেয়, তাহলেই কেবল কাজটা করব আমি। নইলে...' শ্রাগ করে থেমে গেল।

'নইলে কোটি কোটি নিরীহ মানুষ মরবে।'

'সহজ যুক্তিতে সেরকমই বোঝায়। কিন্তু আসলে তা ঘটবে না। আমি যখন আমার দাবি পেশ করব, সারা বিশ্ব তা শুনবে। এবং জেনে রাখুন, বিশ্ব জনমত তখন আমার দিকে ঝুঁকবে। বিষয়টাকে অবহেলা করতে পারবে না এই চার দেশের সরকার। মেনে নেবে আমার দাবি, সে ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত আমি। জনমতের চাপে নয়, ভয়াবহ বিপর্যয়ের কথা ভেবে।' মাথা দোলাল লোকটা। 'ওরা বুঝবে, এ কোনও ছেলেখেলা নয়।'

'কি ভাবে দাবি পেশ করা হবে?' প্রশ্ন করল রানা। উন্মাদ মানুষটা যে কোথাও কোন ফাঁক সত্যিই রাখেনি, বুঝতে পেরে ভেতরে ভেতরে কাঁপুনি উঠে গেছে।

'সময় হোক, জানতে পারবেন। আপনার জন্যে রিংসাইড আসনের ব্যবস্থা করেছি আমি, ওখানে বসে সব দেখতেও পাবেন। তারপর, অপারেশন শেষ হলে...'

'আমার মৃত্যু নিশ্চিত করা হবে।'

'অবশ্যই। শুধু আপনার নয়, আমার বিশ্বাসঘাতিনী ভাইঝিরও। আপনি আমার ক্যাসেলে আসার পর মেয়েটি কি কি করেছে, সব জেনে গেছি আমি মের ওষুধের গুণে।' এক চোখ টিপল সে। 'আফটার অল, মেয়েদের নার্ভ পুরুষদের মত শক্ত নয়। আপনি যা পেরেছেন, ও তা পারেনি।'

'তুমি জানো তুমি একটা বাস্টার্ড, রজার?' খুব শান্ত গলায় বলল মাসুদ রানা। 'লেয়ার্ড উপাধী আর সম্পত্তির লোভে মেয়েটির বাবা-মাকে খুন করেছ তুমি। আপন ভাইকে খুন করেছ। এখন তার মেয়েকেও খুন করতে চাইছ। ইউ ব্লাডি সোয়াইন!'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো নিজের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাতে যাচ্ছে সাইমুর। দু'চোখের মণি জ্বলে উঠল। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত সামলে নিতে পারল সে। তারপর হাসল। 'কে বলেছে আমি খুন করেছি ওর বাপ-মাকে? প্রমাণ আছে? নেই। প্লেন দুর্ঘটনায় মরেছে ওরা। ওটার ফুয়েল লাইনে গোলমাল ছিল।'

ঝুঁকে এল সে। 'তবে হ্যাঁ, আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, অফ দা রেকর্ড অবশ্য। কাজটা আমিই করেছি, সত্যি।' ষড়যন্ত্রের হাসি ফুটল তার মুখে। 'জীবনভর এই করে এসেছি আমি, জানেন? শীর্ষে ওঠার পথে কোন বাধাকেই গ্রাহ্য করিনি, সব চুরমার করে এগিয়ে গিয়েছি। বাধা ভাই হোক, কি বাপ, দেখিনি।'

টেবিলে মৃদু চাপড় মেরে সোজা হলো বিজ্ঞানী। 'কথা অনেক হলো, আজ আর নয়। হাতে কাজ আছে কিছু, ওসব সেরে একটু বিশ্রামও নিতে হবে। তারপর কালকের দিনটা, না, বরং আজকের দিন বলাই ভাল। ভোর তিনটে তো বেজেই গেছে। সে যাক, আমার এখানে অবশ্য বিশ্রামের তেমন সুব্যবস্থা নেই, আমার ভাইঝির সঙ্গে একই সেলে বাকি সময়টা কাটাতে হবে আপনাকে। অসুবিধে হবে হয়তো, সে জন্যে আগেই দুঃখ প্রকাশ করে রাখছি। পিটার!' হাঁক ছাড়ল সে।

নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল দানব। পিছন থেকে দু'হাতে ধরে রানাকে দাঁড় করাল। 'যাওয়া যাক।'

'আর একটা প্রশ্ন,' তাড়াতাড়ি বলল রানা।

ওঠার আয়োজন করছিল বিজ্ঞানী। থেমে গেল। 'কি?'

'কাল, বা আজ আমরা এখান থেকে আর কোথাও যাচ্ছি?'

মাথা ঝাঁকাল লেয়ার্ড।

'কোথায়?'

তর্জনী খাড়া করে আকাশ দেখাল সে। 'শূন্যে।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ খুব বিরাট এক এয়ারক্রাফট আছে আমার, মিস্টার রানা। আমার উড়ন্ত টেস্টবেড। আমেরিকান বন্ধুদের তৈরি। এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক আছে বলে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারে ওটা। আমার প্রয়োজনের জন্যে সময়টা যথেষ্ট। ওই প্লেন নিয়ে আকাশে থাকব আমরা যতক্ষণ না আমার দাবি পূরণ হয়। প্রয়োজনের সময় নামব, আমার গোপন রিফুয়েলিঙ স্টেশন থেকে ফুয়েল নিয়ে ফের উঠে যাব। ওটায় আপনার জন্যে রিঙসাইড সীটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। না না, ভাববেন না, বেশি লম্বা সময় আপনাকে ধরে রাখব না আমি। নিচ থেকে পজিটিভ সাড়া পাওয়ামাত্র হিসেব চুকিয়ে ছেড়ে দেব। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'সন্তুষ্ট?' কানের কাছে মুখ এনে বলল পিটার। দরজার দিকে ঘোরাল ওকে। 'এবার যেতে মর্জি হোক।'

সরু প্যাসেজ ধরে ধাক্কা আর গুঁতো মারতে মারতে ওকে নিয়ে চলল লোকটা। বেশ কয়েকবার ডানে-বাঁয়ে করে ওক কাঠের পুরু এক বন্ধ দরজার সামনে কলার টেনে দাঁড় করাল। চাবি বের করে দরজা খুলে দিল ফ্রেড, পিটার হাতকড়া খুলে প্রায় গলা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিল ওকে। 'যান। শেষ ঘুম

ঘুমিয়ে নিন।'

হুমড়ি খেয়ে পড়া থেকে নিজেকে সামলাল রানা বেশ কসরৎ করে। সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দড়াম করে লেগে গেছে দরজা। ঘরটা ছোট, সরু। একটা অল্প ওয়াটের বালব জ্বলছে ভেতরে। সরু দুটো কট, মাঝে হাঁটাচলার জন্যে এক চিলতে জায়গা। ডানদিকের কটে বুক পর্যন্ত কম্বল টেনে ঝিম্ মেরে পড়েছিল রোজালিন, আওয়াজ শুনে চোখ মেলল। পরক্ষণে লাফ মেরে উঠে বসল রানাকে দেখে।

'রানা!' কট থেকে এক লাফে ওর বুকের ওপর এসে পড়ল সে। 'আমি···আমি ভেবেছিলাম তুমি এবার হয়তো···'

'না, রোজ। পারিনি। আগেরবারও ধরা পড়লাম, এবারও।'

'তুমি জানো না,' মুখ তুলল মেয়েটি। 'কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটাতে চলেছে আমার চাচা। রানা···'

'আমি জানি, রোজ।'

'সে···সে বলেছে, কাল আমাকে মেরে ফেলা হবে।' চোখের কোণে পানি টলমল করে উঠল তার। 'তোমাকেও। তার মানে···তার মানে···'

মুখ নামিয়ে আনল রানা, জোর করে ওর কথা বন্ধ করে দিল। একটু একটু করে কাঁপুনি থেমে এল রোজালিনের, ওর বুকের সাথে লেপ্‌টে থাকল। চোখ বন্ধ। পাতার ফাঁক দিয়ে পানি গড়িয়ে নামছে।

'এখনও সেরকম কিছু ঘটেনি, রোজ,' ওর কপালের চুল সরিয়ে দিল রানা। 'ভয় কি? মরলে তুমি একা মরছ না, আমিও তো থাকব তোমার সাথে।'

ওর চোখে কিছু খুঁজল হয়তো মেয়েটি, ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা ঝাঁকাল। বোঝা গেল পরিস্থিতি মেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। এবার নিজেই রানার মুখ টেনে নামিয়ে আনল সে।

বিএসএস। লন্ডন।

ভোর ছটায় চীফের অফিসে ঢুকল ডিউটি অফিসার। ঘুমের অভাবে চোখ লাল তার। মনও খারাপ। ভাল কোন খবর আনতে পারেনি। মারভিন লংফেলোর অবস্থা আরও খারাপ। ঢাকা থেকে লন্ডনের পথে রওনা হয়ে গেছেন রাহাত খান, পৌঁছতে বেশি দেরি নেই। তাঁর মুখোমুখি হবেন কি করে তাই ভাবছেন।

'কোনও খবর পেলে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'ন'টার আগে ওরা আমাদের কনফার্মড্ খবর জানাবে বলেছে, স্যার।'

চোখের তারায় রাগ ফুটল বৃদ্ধের। লাল চোখ আরও লাল হলো। 'আজকাল সবাই জরুরী ব্যাপারকে সিরিয়াসলি নিতে চায় না মনে হয়,' বললেন বিড়বিড় করে। 'আশ্চর্য! সামান্য একটা খবর জানাতে পুরো রাত লাগিয়ে দিল ওরা!'

রানা ফ্রান্সে কেন? কখন, কোন পথে গেল, সারারাত বসে বসে ভেবেছেন তিনি, জবাব পাননি। ওদেশের কোথায় কি করছে ও? রজার সাইমুরও ওখানে? কি ঘটছে ফ্রান্সে?

ওদিকে আরগুয়েলো পালিয়ে এসেছে আমেরিকা থেকে, এবারও তাকে

অল্পের জন্যে ধরতে পারেনি এফবিআই। সে-ই বা কোথায় গেল, ফ্রান্সে? এর অর্থ কি? যে জন্যে রজার সাইমুরের সাথে তার গোপন যোগাযোগ, তা কি শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে? খুব শীঘ্রি ঘটতে যাচ্ছে খারাপ কিছু?'

সাইমুরের ক্যাসেলে স্পেশাল ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করলে কেমন হয় এম আই ৫-এর ডিরেক্টর জেনারেলকে বলে?

আপনমনে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। জেনারেলকে ফোন করার আগে একটু চাঙা হয়ে নিতে হয়। 'কফির কথা বলো, প্লীজ!' ডিউটি অফিসারকে বললেন। 'কালো, গরম, মিষ্টি আর কড়া। মনে হচ্ছে দিনটা আজ খুব কঠিন যাবে।'

এগারো

সকালে আবার হাজির ওরা, পিটার ও তার দুই সঙ্গী। অস্ত্র হাতে প্রথমে ভেতরে ঢুকল দানব, পরের দু'জন এল দুটো উপচে পড়া নাশতার ট্রে নিয়ে। রানা-রোজালিনকে এক কটে দেখে প্রথমজন হাসল বিকট চেহারা করে। 'বেশ বেশ। মনে হচ্ছে রাতটা বেশ ভালই কেটেছে তোমাদের। এবার ওঠো, লেয়ার্ড তোমাদের জন্যে স্পেশাল ব্রেকফাস্ট পাঠিয়েছেন, খেয়ে নাও।'

ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল অন্য দুই গার্ড। পিটার রূম থেকে বেরিয়ে ঘুরে তাকাল রানার দিকে। 'ছুরি-কাঁটা চামচ এক-আধটা খোয়া যায় না যেন। ওগুলো যখন নিতে আসব, সব ক'টা গুণে বুঝিয়ে দেবে তুমি। কোনরকম চালাকি করলে হাড়ে হাড়ে তার ফল টের পাবে।'

'হাত-মুখ ধোয়ার কি ব্যবস্থা?' প্রশ্ন করল রানা।

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম।' দরজার বাইরে কোথাও একটা সুইচ টিপল বোধহয় সে, সেলের পিছন দিকের খানিকটা দেয়াল সরে ছোট একটা অ্যালকোভ দেখা দিল। পরক্ষণে দড়াম করে লেগে গেল দরজা। তালা লাগানোর শব্দ শোনা গেল।

উঁকি দিয়ে অ্যালকোভটা দেখল রানা। একটা ওয়াশবেসিন, শাওয়ার, তোয়ালে আর কমোড, এই হচ্ছে ভেতরের সাজ-সরঞ্জাম। 'চলো, পরিষ্কার হয়ে নেয়া যাক।' শেভিং কিট নেই, কাজেই ওকে কেবল গোসল করেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। রোজালিন বের হতে দুই ট্রের অরনেট কভার সরাল রানা। সত্যিই স্পেশাল।

প্লেট ভর্তি ধূমায়িত বীফ, ডিম, সসেজ, প্রচুর টোস্ট, লেয়ার্ড অভ মারকান্ডির প্রতীক আঁকা বড় এক চায়না বাটি ভর্তি বাটার ও মারমালেড এবং রূপার পট ভর্তি পর্যাপ্ত কফি। নিজের ট্রে ঠেলে সরিয়ে দিল মেয়েটি।

'আমি খেতে পারব না। গলা দিয়ে নামবে না।'

বাহু ধরে ওকে নিজের দিকে ঘোরাল রানা। 'এতক্ষণ তোমাকে কি বোঝালাম আমি? একটু আগের সাহস কোথায় গেল তোমার? বলেছি তো সময়মত মুক্তির

একটা উপায় ঠিকই বের করে ফেলব আমি, কেন ঘাবড়াচ্ছ! তুমি ভয় পেলে তোমার চাচা খুশি হবে, তাই চাইছে পাগলটা, কেন বোঝো না? ভয় পেলেও চেপে রাখো মনে, খেয়ে নাও। নইলে পরে শক্তি পাবে না। এসো, মুক্তির পথ বের করার চিন্তা আমাকে করতে দাও।'

বলল বটে, কিন্তু কি করে যে মুক্তি আসবে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। কেবল অভিজ্ঞতা থেকে জানে, শুভর কাছে অশুভর সবসময়ই হার হয়। আজও যে শেষ পর্যন্ত লেয়ার্ডের পরাজয় ঘটবে, তাতে মনে সন্দেহ নেই রানার। কেবল জানে না সেটা কি ভাবে।

'বেশ,' বলে করুণ হাসি হাসল মেয়েটি। 'এসো তাহলে।'

খাওয়ার সময় দেখা গেল রানা নিজেই গিলতে পারছে না, আটকে যাচ্ছে গলায়। প্রচুর চিনি মেশানো কাপের পর কাপ কফির সাথে যতটা পারল ধুয়ে নামাল ও নিচে। খেতে হবে, শক্তি জমা রাখতে হবে, নইলে পরে এনার্জি পাওয়া যাবে না। রোজালিনও ওর পথ অনুসরণ করল।

রানা ভরপেট খেয়ে শুয়ে পড়ল হাত-পা ছড়িয়ে। ভাবছে। এখন থেকে প্রতিটি মুর্হূত ওকে সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে, নিজেকে শোনাচ্ছে মনে মনে। নিজের চারপাশে কখন কি ঘটে, সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে, উন্মাদটার প্ল্যান, অথবা অ্যাকশনের কোথাও বিন্দুমাত্র ফাঁক চোখে পড়ামাত্র যাতে সুযোগটা নেয়া যায়। অবশ্য যদি তেমনটা ঘটে।

ক'টা বাজে জানার উপায় নেই, তবে ওর অনুমান দুপুর গড়িয়ে গেছে। ঘনিয়ে এসেছে সাইমুরের অপকর্মের ডেডলাইন। ভাবতে না ভাবতে দল নিয়ে পিটার হাজির। দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই ট্রেতে গুছিয়ে রাখা ছুরি-কাঁটা চামচগুলো দেখল সে, তারপর ইশারায় বের হতে বলল ওদের। প্যাসেজ ধরে এগোল রানা ও রোজালিন। পিটার সামনে, অন্যরা পিছনে।

সরু প্যাসেজ ছেড়ে অপেক্ষাকৃত চওড়া এক করিডরে পড়ল ওরা, তারপর সিঁড়ি বেয়ে কয়েক ধাপ উঠে দাঁড়াল এক বন্ধ ফায়ার ডোরের সামনে। ওটা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল পিটার, এগোবার নির্দেশ দিল। পিছনে মেয়েটির দম আটকে যাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। ধাক্কা ও নিজেও কম খায়নি সামনের দৃশ্য দেখে। সুবিশাল এক হ্যাঙ্গারে দাঁড়িয়ে আছে ওরা—কাল এখানে পৌঁছে এটাকেই দেখেছে রানা বাইরে থেকে।

এত উঁচু, মনে হয় ভেতরে দশতলা কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক ধরে যাবে বুঝি অনায়াসে। সামান্য আওয়াজও প্রতিধ্বনি তোলে ভেতরে। বাতাসে তেল আর রাবারের গন্ধ। ভেতরে দেখার মত দৃশ্য আরও আছে, এবং সেটাই আসল। হ্যাঙ্গারের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে দানবীয় আকৃতির প্রকাণ্ড এক প্লেন। আকাশ সমান উঁচু রোলার চালিত দরজার দিকে মুখ, হলুদ একটা ট্রাক্টর ওটাকে টো করার জন্যে তৈরি।

দেখামাত্র আকাশ দানবটাকে চিনল মাসুদ রানা। ওটা লকহীড-জর্জিয়া সি-১৪, স্টারলিফটার। আমেরিকান স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট বিমান-দেহ একশো বত্রিশ ফুট দীর্ঘ, দুই উইঙের পরিধি একশো চুয়াল্লিশ ফুট। মাটি থেকে নাকের উচ্চতা

একটা চারতলা বাড়ি সমান, প্রায় চল্লিশ ফুট। এমনকি হ্যাঙ্গারের বিশালত্ব পর্যন্ত ম্লান হয়ে গেছে ওটার উপস্থিতির কাছে।

টেইলে পেইন্ট করা আছে সাদা, লাল ও হলুদ রঙের ফ্রেঞ্চ আর্মি ডি ল'এয়ার ইনসিগনিয়া। ফিউজিলাজের পিছনদিকের এক জায়গায় অ্যালডান অ্যারোস্পেস শব্দ দুটোও লেখা রয়েছে। পিছনের র‍্যাম্পের দিকে নজর দিল রানা। হাইড্রলিক শক্তির সাহায্যে ওঠানো-নামানো হয় ওটা। লোডিঙ-আনলোডিঙ হয় ও পথে মাটিতে বা শূন্যে, দুই জায়গাতেই। ট্যাঙ্ক, সামরিক যান এমনকি হেলিকপ্টার পর্যন্ত ওখান দিয়ে অনায়াসে ঢুকে যায় পেটের ভেতরে।

'ঠিকই ধরেছেন, মিস্টার রানা,' ওর কনুইয়ের কাছ থেকে বলে উঠল রজার সাইমুর। 'ওটা স্টারলিফটার। নামটা চমৎকার, কি বলেন? স্পেশালি মডিফাইড। ভেতরে চলুন, আরও অনেক অবাক করা জিনিস দেখতে পাবেন।'

হ্যাঙ্গারের সামনের দিক থেকে ভারী লোহার গেট গড়াবার আওয়াজ উঠল। পিটার হাতের পিস্তল দিয়ে মৃদু গুঁতো লাগাল রানার পিঠে। প্লেনে চড়ল ওরা বিজ্ঞানীকে অনুসরণ করে। ফ্লাইট ডেকের জানালা দিয়ে ভেতরে কাজে ব্যস্ত ক্রুদের দেখতে পেল রানা–প্রি টেক্অফ চেক করছে লোকগুলো। পিটারের দুই সঙ্গী থেমে গেল দোরগোড়ায়, অন্য দু'জন নেতার সাথে অনুসরণ করল রানা ও রোজমেরিকে।

ফিউজিলাজের ভেতরে এক নজর চোখ বুলিয়েই রানা বুঝল, বিমানটা রজারের অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করেছে লকহীড কোম্পানি। প্রথমে একটা চমৎকার ডেকোরেশন করা খুদে ক্যান্টিন-কাম-বারে নিয়ে এল ওদের লেয়ার্ড। ভেতরে তিনটে ছোট গোল টেবিল আছে, প্রতিটিতে চারজন করে বসার ব্যবস্থা। মেঝের পুরু কার্পেটে পা ডুবে যায়। সামনের গ্যালিতে দুজন লোক রান্নার আয়োজন করছে মনে হলো।

'আমি দুঃখিত যে এখানে আমাদের সাথে বসে খানাপিনার সুযোগ হবে না আপনাদের কারও,' বলে হাসিমুখে প্রথমে রানা, পরে ভাইঝির দিকে তাকাল বিজ্ঞানী। 'আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটতে যাচ্ছে, সে সব নিয়ে প্রায়ই আলোচনার দরকার পড়বে আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমি চাই না সে সময় আপনারা এখানে বসে আমাদের কথা গিলুন। তবে আপনারা যাতে খিদে-তেষ্টায় কষ্ট না পান, সেদিকে কড়া নজর থাকবে আমার, তা নিয়ে চিন্তা নেই।'

ফিউজিলাজের পিছনদিকে যাওয়ার পাইডিং দরজা ইঙ্গিত করল লোকটা। 'ওই দরজার ওপাশে আছে আমার প্রজেক্টের যাবতীয় ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতির সেকশন। খুব স্পর্শকাতর। ওখান দিয়ে হাঁটার সময় একটু সাবধানে পা ফেলবেন দয়া করে। চলুন।'

দরজার ওপাশে কার্পেট নেই, ফিউজিলাজও বেশ সরু। প্রায় চল্লিশ ফুট দীর্ঘ এ সেকশন। দু'দিকের দেয়াল ডেক থেকে আপার বাল্কহেড পর্যন্ত হাই কেবিনেট ও অসংখ্য মেটাল ইউনিটে ঢাকা। ইলেক্ট্রনিক ইকুইপমেন্টে ঠাসা সেকশনের পুরো দৈর্ঘ্য। দুই দেয়ালের দিকে মুখ করে বসে আছে সাদা কভারল পরা সাইমুরের দুই এক্সপার্ট। জটিল কনসোলের ওপর ঝুঁকে কাজ করছে।

'বিটোফেনের ফিফথ্ বাজাও দেখি, বাছা!' তাদের একজনের উদ্দেশে বলল রানা। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল বিজ্ঞানী। এমন সিরিয়াস সময় ওর রসিকতা পছন্দ হয়নি। পরক্ষণে পাশ থেকে পালে পিটারের মাঝারি ওজনের এক থাবড়া খেয়ে প্রায় শুয়ে পড়ার দশা হলো রানার। 'শাট্ ইয়ের গব!' হুমকি দিল লোকটা। ঠেলে সামনে এগিয়ে দিল ওকে।

ইলেক্ট্রনিক গুহার শেষ মাথায় আরেক পাইডিঙ দরজা। ওটা যে বুলেট প্রুফ, দেখেই বুঝল রানার অভিজ্ঞ চোখ। ফায়ার প্রুফও বটে। পাইডিং ল্যাচে হাত রেখে ঘুরল সাইমুর। 'এটা আমার অফিস। একান্ত ব্যক্তিগত ভুবন,' টান মেরে একপাশে সরিয়ে দিল সে দরজা। 'আসুন।'

ভেতরে পা রাখল রানা। সামনে তাকিয়ে বুঝল, এয়ারক্র্যাফটের প্রায় অর্ধেকটা অতিক্রম করে এসেছে ওরা। সাইমুরের অফিসরূমে ঢুকতেই গোল একটা ফাঁকা স্পেস, মাথার ওপর থেকে আলো ছড়াচ্ছে শেডেড বালব্। সবুজ আলো। 'আমার অপারেশনের নার্ভ সেন্টার এটা,' ঘোষণা করল বিজ্ঞানী।

দুই হ্যাচওয়ের মাঝের জায়গাটা লম্বায় কম করেও বিশ ফুট হবে। দুই দিকে তিনটে করে ডিম সাইজ জানালা, সবগুলোর ব্লাইন্ড নামানো এ মুহূর্তে। মাঝে কয়েক ফুট চওড়া পথের দু'পাশে আধখানা চাঁদের মত দুটো বড় ডেস্ক, তার প্রায় পুরো টপ জুড়ে আছে জটিল সমস্ত ইলেক্ট্রনিক প্যানেল। প্রতিটা ডেস্কের পিছনে, সামনের দিকে মুখ করে আছে পুরু চামড়া মোড়া তিনটে করে সুইভেল চেয়ার। ওগুলোর পিছনে আরও চারটা করে চেয়ার, গদিমোড়া, তবে সাধারণ। যেন দর্শকদের জন্যে রাখা হয়েছে ওগুলো। সবকিছু মেঝের সাথে ফিক্স করা।

পিছনের হ্যাচওয়ের পাশে আরেকটা ছোট হ্যাচওয়ের আউটলাইন আঁকা আছে টকটকে লাল রঙে। বন্ধ। ওটার ওপরে বড় হাতের অক্ষরে স্টেনসিল করা আছে একটা বাক্য: DO NOT ENTER IF THE RED LIGHT IS ON. ওই দরজার পাশ দিয়ে পিছনে যাওয়ার সরু প্যাসেজ আছে একটা।

'এবার বসা যেতে পারে,' বলল লেয়ার্ড।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে দুই মস্ত থাবায় রানার বাহু চেপে ধরল পিটার। সঙ্গে আসা অন্য দুই গার্ড রোজালিনের দিকে এগোল।

'আপনি আমার বাঁদিকে বসবেন, মিস্টার রানা,' বলল সে। 'ওটা মের সীট। আপনার অসহযোগিতার জন্যে শেষ পর্যন্ত ওকেই যেতে হলো প্যাট্রিকের ব্যবস্থা করতে, তাই সঙ্গে থাকতে পারল না বেচারী। যা হোক, বসুন। এমনিতেও এ সময়ে ওকে সঙ্গে রাখার ইচ্ছে ছিল না আমার।' আনমনা হয়ে উঠল লোকটা। প্রায় বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু এতক্ষণে তো ওর ফিরে আসার কথা। আসছে না কেন?'

'দুটো কারণ থাকতে পারে,' চট্ করে বলে উঠল ও। 'হয় পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, নইলে আরগুয়েলোর সাথে সে-ও সাগরে পড়েছে। হাঙরের পেটে গেছে।'

ঘোলা চোখে তাকাল রজার সাইমুর। তবে পাল্টা কিছু বলল না। ডানদিকের

ডেস্কের বাঁ দিকের সুইভেল চেয়ারে বসানো হলো রানাকে, সাধারণ সীট বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। মাঝের চেয়ারে বসল বিজ্ঞানী। বসার সময় রানার দিকের কোটের প্রান্ত খানিকটা সরে গেল তার, ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল রাতে দেখা সেই কোল্ট পাইথন—হোলস্টার থেকে মাথা বের করে আছে। খুশি হয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, পরক্ষণে চেহারা অন্ধকার হয়ে গেল পিটার ওর হাত বাঁধার আয়োজন করছে দেখে। হাত চেয়ারের পিছনে টেনে নিয়ে ওয়েবিং বেল্ট দিয়ে দুই কব্জি বেশ শক্ত করে বাঁধল লোকটা। এরপর আরও দুই বেল্ট দিয়ে বুক-বাহু বাঁধা হলো চেয়ারের সাথে। পা ছাড়া আর কিছু নাড়ানোর উপায়ই রইল না ওর। রোজালিনকে বসানো হয়েছে ওপাশের ডেস্কের সামনে। ওকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে ব্যাটারা।

নিজের চেয়ারে বসে সীট বেল্ট বাঁধল লেয়ার্ড, তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল সামনের কনসোল অ্যাডজাস্ট করতে। কয়েক সেকেন্ড পেশাদারী দক্ষতার সাথে নেচে বেড়াল তার দুই হাতের আট আঙুল, কনসোলের অনেকগুলো পিন-লাইট আর ভিজুয়াল ইউনিট জ্বলে উঠতে শুরু করল এক এক করে। ডেস্কের মাঝখান থেকে সাপের মত উঠে আসা এক অ্যাডজাস্টেবল্ মাইক্রোফোনের 'স্পীক' লেখা বাটন টিপে দিল সে এরপর।

কনসোলের ওপরের দিকে ছয়টা ডিজিটাল ঘড়ি চলছে একমনে, সবগুলোর নিচে টাইম জোন আর জায়গার নাম লেখা। সাইমুরের ছয় টার্গেটের সময় নির্দেশ করছে ওগুলো। ব্রিটিশ টাইম দেখল রানা—বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

পাশের ডেস্কের দিকে তাকিয়ে ভীষণ অবাক হলো ও। রোজমেরিকে মাঝে বসিয়ে যে দুই গার্ড ওর দু'পাশে বসেছে, তারা আসলে অন্য কিছু। সাইমুরের মত ঝুঁকে সামনের কনসোলে কাজ করছে নিপুণ দক্ষতার সাথে। ট্রেইনড টেকনিশিয়ান ব্যাটারা, চরম বিস্ময়ের সাথে ভাবল ও। এমন সময় মৃদু এক টান অনুভব করল, দুলে উঠে খুবই ধীরগতিতে হ্যাঙ্গারের গেটের দিকে রওনা হলো স্টারলিফটার। হলুদ ট্রাক্টর টেনে নিয়ে চলেছে।

হাত তুলে রানার বাঁ দিকের ব্লাইন্ড টানা জানালা দেখিয়ে হাসল রজার সাইমুর। 'আমি কথা দিয়েছিলাম আজকের ফ্লাইটে রিঙসাইড সীটের ব্যবস্থা করব আপনার জন্যে, মিস্টার রানা। করেছি। আকাশে উঠে ব্লাইন্ড তুলে দেব, তখন বাইরের সবই দেখতে পাবেন।'

পিছনের সরু প্যাসেজ ধরে পিটারকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে তার দিকে ফিরল রানা। 'ওদিকে কি আছে, তা তো দেখা হলো না!'

'ওদিকে?' শব্দ করে হেসে উঠল বিজ্ঞানী। 'ওদিকে আছে এক্সিটওয়ে, বা র‍্যাম্প, দেখেননি ছবিতে? ও পথে ট্যাঙ্ক-গাড়ি-চপার স্টারলিফটারে ওঠানো-নামানো হয়, প্যারাশুট ট্রুপস্ জাম্প করে, আরও কত কিছু হয়। একবার ভেবেছিলাম ওই পথে জাম্প করতে বাধ্য করব আপনাকে, প্যারাশুট ছাড়া অবশ্য,' পাখির মত চকিত চাউনি দিয়ে হাসল লোকটা। 'পরে অন্য এক পথ বের করেছি ভেবেচিন্তে।'

'সেটা কোন্ পথ?' প্রশ্নটা শুনল ও কেবল, উত্তর কানে পৌঁছল না।

স্টারলিফটারের প্রচণ্ড শক্তিশালী চার প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি টার্বো ফ্যানের প্রথমটা হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল, কাঁপতে শুরু করল আকাশ-দানব, জ্যান্ত হয়ে উঠেছে যেন। সামান্য বিরতি দিয়ে একে একে অন্য তিনটেও স্টার্ট নিল অল্প সময়ের মধ্যে।

'সে সব এখন থাক,' গলা চড়িয়ে উত্তরটা পুনরাবৃত্তি করল বিজ্ঞানী। 'পরে শুভ সময়ে জানাব।'

ফিরে এসে মনিবের উদ্দেশে নড করল পিটার, কিছু একটা মেসেজ জানাল হয়তো। জবাবে মাথা ঝাঁকাল সে সন্তুষ্ট চেহারায়। 'গুড!'

প্রথমে কিছু সময় আলাদাভাবে সনাক্ত করা গেল চার এঞ্জিনের গর্জন, একটু পর সে উপায় রইল না। মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। হেলেদুলে ট্যাক্সিওয়ের দিকে এগোতে শুরু করল স্টারলিফটার। মেইন এন্ট্রান্সের কাছেই কোথাও একটা ধাতব ক্লিক্ শব্দ হলো, ফ্লাইট ডেকের সাথে যোগাযোগ চালু হলো সাইমুরের অফিসের।

'ক্যাপ্টেন বলছি অ্যালডান ফাইভ-সিক্সের সমস্ত ক্রু ও যাত্রীদের,' একটা মোটা কণ্ঠ বলে উঠল ঝরঝরে ইংরেজিতে। 'দয়া করে যার যার সীট বেল্ট বেঁধে ফেলুন প্রত্যেকে। সিগারেট নিভিয়ে ফেলুন। অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশে উড়তে যাচ্ছি আমরা। ধন্যবাদ।'

ব্রিটিশ সময় নির্দেশক ঘড়ি ১১·৫৪ মিনিটে প্রায় পৌঁছে গেছে। ট্যাক্সিইং শেষ করে থামল প্লেন, এঞ্জিনের সম্মিলিত আওয়াজ মুহূর্তের জন্যে একটু চাপা শোনাল, পরক্ষণে তুঙ্গে উঠে গেল। নড়ে উঠেই একযোগে চার এঞ্জিনের ৮৪ হাজার পাউন্ড স্ট্যাটিক থ্রাস্টের ধাক্কায় পলকে ঝড়ের গতিতে দৌড় শুরু করল, সীটের নরম গদিতে প্রায় সেঁধিয়ে গেল রানা আর সবার মত।

এক সময় লাফঝাঁপ থেমে গেল ওটার, সহজ-সাবলীলভাবে মাটি ছাড়ল সামনের হুইল, তার একটুপর পিছনেরগুলোও। তেরছা রেখা ধরে সাঁ-সাঁ করে উঠে যেতে থাকল আকাশ-দানব। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একজোড়া ফোম-প্যাডেড হেডফোন বের করে রানার কানে পরিয়ে দিল রজার সাইমুর। 'এটা দিয়ে এখন থেকে সবকিছু শুনতে পাবেন আপনি। আমার সব কথা, ওদের সব কথা–সব স্পষ্ট কানে যাবে আপনার।'

ঘড়ি দেখল লোকটা। রানাও তাকাল। দু'মিনিট বাকি বারোটা বাজতে। 'সময় হয়েছে,' খিক্ খিক্ করে হাসল উন্মাদ বিজ্ঞানী। 'এখনই শুনতে পাবেন আমার টেররিস্ট গ্রুপগুলোর রিপোর্টিং।'

লন্ডন।

স্টারলিফটার আকাশে ওড়ার আধ ঘণ্টা আগের কথা।

ভীষণ ব্যস্ত ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস চীফ মারভিন লংফেলো। এর মধ্যে তাঁর জানা হয়ে গেছে গতরাতের ফোনটা কোত্থেকে করেছিল মাসুদ রানা। ওর ফ্রান্স যাওয়ার সাথে রজার সাইমুরের কোন সংযোগ আছে কি না, তাও জেনে গেছেন খোঁজ-খবর করে। অ্যালডান অ্যারোস্পেস (ফ্রান্স) ইনকর্পোরেটেডের খবরও

অজানা নেই।

প্যারিস থেকে একের পর এক কল রিসিভ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বৃদ্ধ। নানান পুলিস আর সিকিউরিটি নেটওয়ার্কের তরফ থেকে প্যারিস হয়ে আসছে কলগুলো। লংফেলোর পাশে নীরবে পাইপ টেনে চলেছেন আরেক বৃদ্ধ, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের প্রধান—মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খান।

কেবল টানছেনই, ওটা যে নিভে গেছে বহু আগেই, সেদিকে খেয়াল নেই। ওটা তাঁর ভেতরের উদ্বেগের লক্ষণ। কাঁচাপাকা ভুরু কুঁচকে আছে। ভীষণরকম অন্যমনস্ক। ঘুরে তাঁকে দেখলেন লংফেলো. মুখ বাড়িয়ে নিচু কণ্ঠে কিছু বললেন।

মাথা ঝাঁকালেন রাহাত খান। গম্ভীর, ভরাট গলায় বললেন, 'মনে হচ্ছে দেরি হয়ে গেছে। সময়মত হচ্ছে না কিছুই। তবু, চেষ্টা করে দেখো।'

লাল টেলিফোন সেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন লংফেলো। দেড় মিনিটের মাথায় ফ্রেঞ্চ সিক্রেট সার্ভিস-SDECE-র প্রধানের সাথে সংযোগ চালু হতে কথা বলতে শুরু করলেন একনাগাড়ে। সার্ভিসের চার অপারেটর ও এক গাড়ি আর্মড পুলিস যখন তাদের চীফের নির্দেশে পারপিগনান এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হলো. তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাশূন্যে ডানা মেলেছে সাইমুরের স্টারলিফটার।

প্যারিসের ষাট মাইল দূরে, অর্লিয়ন্স শহরের কাছের সেইন্ট-লরেন্স-দ-ইয়ক্স এক, দুই ও তিন নামে পরিচিত নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের মাটির নিচের বিশাল কমপ্লেক্স। চার কর্মচারী রুটিন কাজ ছেড়ে হঠাৎ করে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল এখানে, প্রায় একই সময়। আগে বহুবার মহড়া দেয়া আছে তাদের এ ব্যাপারে।

স্থানীয় সময় বারোটা পঞ্চাশের দিকে প্ল্যান্ট টু-র দুই টারবাইন টেন্ডার নিজেদের পোস্ট ছেড়ে সরে এল। এক মেইন্টেন্যান্স কর্মী বসে তাস খেলছিল অন্য তিন সহকর্মীর সাথে, কাজের কথা বলে ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়ল সে। প্ল্যান্টের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম বহাল রাখার কাজ তার। ওদিকে পঞ্চাশ ফুট নিচে, মেইন কন্ট্রোল রুমের গেটের নিরাপত্তা কর্মী ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে শুরু করেছে।

প্রথম তিনজন নিচে নেমে এল। দু'পাশের অজস্র পাইপ-লাইনের মাঝের সরু প্যাসেজ ধরে সেদিকে এগোচ্ছে। কথা নেই কারও মুখে। হাঁটার মধ্যে এখানে-ওখানে থেমে পাইপের আড়ালে-আবডালে স্কচ টেপ দিয়ে আটকে রাখা প্রয়োজনীয় হালকা অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিচ্ছে। ফরাসী সময় একটা বাজার দু'মিনিট বাকি থাকতে কন্ট্রোল রুমের বাইরে, এলিভেটর শ্যাফটের কাছের ইমার্জেন্সি স্টেয়ারের মাথায় দলের অন্য সঙ্গী, নিরাপত্তা কর্মীর সাথে মিলিত হলো তারা। একটা বাজতে এক মিনিট বাকি তখন।

ভল্টের মত সম্পূর্ণ নিরাপদ, সুরক্ষিত রুমের ভেতরে আধডজন এক্সপার্ট কন্ট্রোলের অজস্র ডায়ালের ওপর সতর্ক নজর রাখছে। পাওয়ারের প্রবাহে কোন অপ্রত্যাশিত ওঠা-নামা বা পরিবর্তন ঘটতে দেখলে সময়মত সামাল দেবে তারা। রুটিন কাজ। ভীষণ পুরু লোহার বড় মেইন ডোর খুলে যাওয়ার ঘটাং শব্দে তাদের একজন ঘুরল, বাইরের নিরাপত্তা কর্মীকে ভেতরে ঢুকতে দেখে চোখ

কোঁচকাল। 'অ্যাই, তুমি কেন এখানে?' চেঁচিয়ে বলল সে। 'জানো না এখানে আসার অনুমতি···' কথা শেষ করতে পারল না, গলায় আটকে গেছে লোকটার হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল দেখে। লোলুপ দৃষ্টিতে তারই বুকের দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর জিনিসটা।

আরও তিনজন ঢুকল ভেতরে। একজনের হাতে ভাঁজ করা বাঁটের হেকলার অ্যান্ড কচ সাব-মেশিনগান দেখা গেল, রুমের হতভম্ব আর সবার ওপর দিকে এক চক্কর ঘুরে এল ওটা। 'মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও সবাই,' সহজ কণ্ঠে বলল প্রথমজন। 'সরে এসো ইকুইপমেন্টের সামনে থেকে, এখনই। এক নির্দেশ দু'বার দেব না, পরের বার সোজা গুলি করব।'

ভয়ে কাঁপুনি উঠে গেল ছয় এক্সপার্টের, ক্লিপবোর্ড-কলম ফেলে দু'হাত মাথার পিছনে বেঁধে দাঁড়াল তারা। পিছিয়ে গেল মনিটরিং প্যানেলের সামনে থেকে। প্রথমজনের ধমক আর দ্বিতীয়জনের সাব-মেশিনগান লোকগুলোকে এতই সম্মোহিত করে ফেলেছে, ওদের পাশ ঘেঁষে যে আরও দু'জন ভেতরে ঢুকে পড়েছে, সেদিকে নজরই পড়েনি কারও। রুমের দুই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল লোকদুটো, বুড়ো আঙুল তুলে ওকে ইশারা করল সতীর্থদের।

কমিউনিকেশনস্ কেবল কেটে বাইরের পৃথিবীর সাথে ভেতরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে তাদের একজন, অন্যজন অফ করে দিয়েছে এক্সটার্নাল কন্ট্রোল ওভাররাইড সুইচ। প্রথম দু'জন ছয় এক্সপার্টকে অস্ত্রের মুখে মেইন দরজায় নাক ঠেকিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করল। বলির পাঁঠার মত কাঁপছে লোকগুলো। এখনই যে মরতে হবে, তাতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু মিথ্যে প্রমাণ হলো তা।

সিকিউরিটি গার্ড বলে পরিচিত লোকটা বলে উঠল, 'তোমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই, আমরা এখানে অহেতুক রক্তপাত ঘটাতে চাই না। তোমরা তোমাদের অথরিটিকে জানাও, এই প্রজেক্ট কেন দখল করেছি আমরা, কয়েক মিনিটের মধ্যে সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানানো হবে বাইরে থেকে। তার আগে যদি কর্তৃপক্ষ কোন রকম অ্যাকশন নেয়ার চেষ্টা করে, কুলিং সিস্টেম অফ করে দেব আমরা। চায়না সিনড্রোমের আক্রমণে উজাড় হয়ে যাবে মানুষ-জন। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল প্রত্যেকে। কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। পিছনে দড়াম করে লেগে গেল ভারী দরজা, ভেতর থেকে লাগিয়ে দেয়া হলো চার চারটে সেফটি লক। দরজার চোখ বরাবর উচ্চতায় বসানো চৌকো রিইনফোর্সড কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরে তাকাল দলের নেতা, গার্ড। দেখল গ্যালারি ধরে সারবেঁধে হেঁটে চলে যাচ্ছে এক্সপার্টরা।

সঙ্গী দু'জনের একজন ক্যানভাস হ্যাভারস্যাকে করে নিয়ে আসা অপারেশনের এ পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, ট্রান্সিভার বের করল, অন্যজন ওটার প্লাগ ঢুকিয়ে দিল ওয়াল সকেটে। লীডার ছোট বাক্সের মত দেখতে ট্রান্সিভারের সুইচ অন করে দিতেই একটা লাল আলো জ্বলে উঠল ওটার গায়ে দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে উঠল আলোটা। এবার 'ট্রান্সমিট' লেখা সুইচ টিপল

সে, তারপর বাক্সটা মুখের কাছে ধরে দৃঢ়স্বরে বলল, 'নাম্বার থ্রী, ওয়ার।'

হেডফোনের মাধ্যমে শব্দ তিনটে একদম স্পষ্ট শুনতে পেল মাসুদ রানা। বেশ ভারী গলায় বলল বক্তা: নাম্বার থ্রী, ওয়ার।

'সেইন্ট-লরেন্স-দ-ইয়ক্স ওটা,' বিজয়ের গর্বে উদ্ভাসিত হাসিমুখে পাখি-নড করল রজার সাইমুর। ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'আমার ফ্রেঞ্চ টার্গেট।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই আরেকটা গলা শুনতে পেল রানা: নাম্বার ওয়ান, ওয়ার।

'ইংল্যান্ড,' কনসোলের ওপর ঝুঁকে বসল বিজ্ঞানী। সামনে শোয়ানো এক ক্লিপবোর্ডে দ্বিতীয় টিক্ চিহ্ন আঁকল।

'নাম্বার ফাইভ, ওয়ার।'

'নাম্বার ফোর, ওয়ার।'

'নাম্বার টু, ওয়ার।'

মেসেজ তিনটে পরপর এল, প্রায় বিরতিহীনভাবে। রানার মনে হলো ওর মাথার মধ্যে বসে কথা বলছে যেন অজ্ঞাত মানুষগুলো। আর মাত্র একটা মেসেজ আসা বাকি। সাইমুরকে দেখল ঘন ঘন দু'হাত মুঠো করছে আর খুলছে। শেষটার কনফার্মেশন আসতে দেরি হচ্ছে দেখে টেনশনে পড়ে গেছে হয়তো। চেহারা কঠোর। ভালই জানে, এ মুহূর্তে যে ভয়ঙ্কর খেলা সে শুরু করেছে, তার থেকে ফেরার কোন পথ নেই। অস্থির হয়ে উঠল সে, কনসোলের কিনারায় আঙুল দিয়ে তবলা বাজাতে শুরু করল।

তারপর, যেন এক যুগ পর শোনা গেল শেষ বার্তা: নাম্বার সিক্স, ওয়ার।

তিড়িং করে ছাগলের বাচ্চার মত লাফিয়ে উঠল উন্মাদ বিজ্ঞানী। 'ব্যস্! শেষ!' মাথা দোলাতে লাগল ভীষণ উত্তেজনায়। সুপ্ত লাভার টুকরো দুটো অকস্মাৎ জ্যান্ত হয়ে নড়াচড়া শুরু করেছে কোটরের মধ্যে। পরিষ্কার বদ্ধ উন্মাদের চাউনি।

'এইবার!' নিয়ন্ত্রণহীন গলায় বলে উঠল সে। 'এইবার বিশ্বকে আমার মেসেজ জানাব আমি। দেখলেন তো, যেভাবে চেয়েছি, ঠিক সেভাবেই ঘটেছে সব। পরিস্থিতি এখন বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, একমাত্র আমিই পারি ঠেকাতে। আর কেউ নয়। আর কেউ নয়, মাসুদ রানা। আমেরিকা-ইওরোপের সবখানে অজস্র মাইক্রো-ট্র্যান্সমিটার প্ল্যান্ট করেছি আমি, ওগুলোর মাধ্যমে এখন প্রচার হবে আমার দাবি, বিভিন্ন ভাষায়। ইওরোপের সমস্ত দেশসহ এশিয়ান-ইস্টার্ন অঞ্চলের অনেক দেশ তা শুনতে পাবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দেশের ব্রডকাস্টিং ফ্রিকোয়েন্সির সাথে লক্ করা আছে আমার ট্রান্সমিশন, আমি যখন বলতে শুরু করব, সব দেশের স্বাভাবিক ব্রডকাস্টিং স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যাবে, রেডিওতে কেবল আমার কথাই শুনবে বিশ্ববাসী। দেখুন।'

কনসোলের একটা ডায়াল অ্যাডজাস্ট করল সে। একজোড়া সরু কাঁটা ধীরগতিতে ঘুরে এসে নিচের বড় হাতে লেখা VU-র ওপর স্থির হলো। 'আমার আল্টিমেটাম নিজের ভাষায় শুনতে পাবেন আপনি, মিস্টার রানা। বাংলা ভাষায়। বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ কোটি, কাজেই ওটাকেও ছাড়িনি।'

সামনে ঝুঁকল সাইমুর। দুটো সুইচ অন করে আরেক লাল বাটনে টিপ দিতে গিয়ে থেমে গেল কি ভেবে। ঘুরে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল—আত্মবিশ্বাসের সাথে। 'আরেকটা কথা, আমার বলার সময় যে গলাটা আপনি শুনবেন, সবাই শুনবে, সেটা কিন্তু আমার নয়।' রানাকে চোখ কোঁচকাতে দেখে সন্তুষ্ট হলো সে। 'হ্যাঁ, যদিও আমার মুখ দিয়েই বের হবে কথাগুলো, কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে ওটা পুরুষের গলা। সবাই জানবে মেয়ের গলা।

'আমারই এক কোম্পানির তৈরি ইঞ্জিনিয়াস ডিভাইস ব্যাপারটা ঘটাবে। ওটার নাম রেখেছি আমি "ইলেক্ট্রনিক হ্যান্ডকারচিফ"। ওটা দিয়ে আপনিও আপনার কণ্ঠস্বর আমূল বদলে ফেলতে পারবেন, মিস্টার রানা।' হাসি একটু একটু করে দুই কানে গিয়ে ঠেকল উন্মাদটার। পাখি-নড করল। 'কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? শুনুন তাহলে।'

শুরু করে দিল রজার সাইমুর। মাসুদ রানা শুনছে এক মেয়ের চমৎকার, সম্মোহনী কণ্ঠ। বক্তব্য পরিষ্কার, উচ্চারণ ঝরঝরে। শুরুটা তীক্ষ্ণ, হুকুমদারী, তারপর কিছুটা শান্ত গলায় বলে চলল লোকটা। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হলো বক্তব্য। শুনতে শুনতে ওর দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল—পেটের মধ্যে ঘুলিয়ে উঠল ভীষণভাবে। রীতিমত অসুস্থ বোধ করল ও।

এক ঘণ্টা পর। লন্ডনের হোয়াইটহল ক্যাবিনেট অফিস ব্রিফিঙের আন্ডারগ্রাউন্ড রূমে দেশের সমস্ত নিরাপত্তারক্ষক সংস্থার মাথা হাজির। গোপন জাতীয় দুর্যোগ কমিটি বা কোবরার জরুরী বৈঠক বসেছে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে। বিএসএস চীফ লংফেলো আর বিসিআই চীফ রাহাত খানও আছেন ওখানে। সবাই স্তম্ভিত। যেন ঝোড়ো কাক একেকজন, এমন চেহারা।

একটু আগে রেকর্ড করা ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অবিশ্বাস্য আল্টিমেটাম সপ্তম দফার মত শুনছে সবাই। এক মেয়েকণ্ঠ বলে চলেছে:

'বিশ্ববাসী! আপনারা সবাই কাজ বন্ধ করুন। এখনই। নীরবে আমার কথা শুনুন। আপনাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি খুব জরুরী এক বার্তা নিয়ে এসেছি। অতএব কাজ বন্ধ করুন, চুপচাপ কান পেতে আমার কথা শুনুন। বিশেষ করে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি আর যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রধান, মন্ত্রী, আমলা ও উঁচু পদের অফিসাররা শুনুন। বিষয়টাকে কেউ হাল্‌কা করে দেখবেন না, কারণ এর ওপর নির্ভর করছে আপনাদের সবার জীবন-মৃত্যু।

'আজ ব্রিটিশ সামার টাইম ঠিক বারোটা, অর্থাৎ জিএমটি প্লাস এক ঘণ্টার সময় আমার ছয় গ্রুপ এক্সপার্ট সংশ্লিষ্ট চারটি দেশের ছয়টা পারমাণবিক প্রকল্পের মেইন কন্ট্রোল রূম দখল করে নিয়েছে। প্রকল্পগুলো হচ্ছে...' গড়গড় করে সব কটা নাম ঠিকানা বলে গেল মহিলা-কণ্ঠ। 'এ প্রসঙ্গে আপনাদের দুটো ব্যাপার খুব স্পষ্ট করে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি আমি। একটা হচ্ছে, যারা এই দখল প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে, সোজা কথায় তারা সবাই ফ্যানাটিক। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মরতেও পিছপা হবে না। অন্যটা হচ্ছে, ওই ছয় কন্ট্রোল রূমের সাথে বাইরের পৃথিবীর সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিয়েছে ওরা। একমাত্র আমার

সাথে ছাড়া আর কারও সাথে যোগাযোগ নেই ওদের। এবং ওরা আমার কথায় চলবে।

'ওদের ওপর আমার পরিষ্কার নির্দেশ আছে, যদি কোন সরকার সেনাবাহিনী বা অন্য কোন বাহিনীর সাহায্যে প্রকল্পগুলো মুক্ত করার জন্যে কোনও রকম অভিযান চালানোর চেষ্টা করে, সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্টর কোরের কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দেবে ওরা। একযোগে ছয় দলই। যদি সেরকম কিছু ঘটে যায় অর্থাৎ আমার লোকেরা কূলিঙ সিস্টেম অফ করে দিতে বাধ্য হয়, ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে বিশ্বে। চায়নাসিনড্রোমের অসহায় শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরবে।

'কূলিঙ সিস্টেম অফ হয়ে গেলে রিঅ্যাক্টরের কোর ভীষণরকম উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, মৃদু ভূমিকম্প ঘটবে, মেঘ ডাকার মত আওয়াজ হবে, তারপর মাটির তলায় ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ। কিন্তু মাটির তলায় থাকবে না ওসব, কোথাও না কোথাও দিয়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়বে, বাতাসে ভেসে বেড়াতে শুরু করবে, এরই ফলে ঘটবে চায়না সিনড্রোমের উৎপত্তি।

'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট চার দেশের সরকার আমার দাবি মেনে না নেয়, তাহলেও ঘটবে একই ব্যাপার। নির্দেশ দেয়া আছে, কাজেই দেরি করবে না ওরা, চব্বিশ ঘণ্টার পর এক মুহূর্ত দেরি না করে অফ করে দেবে সিস্টেম। মনে রাখবেন, ওরা ফ্যানাটিক, নিবেদিত প্রাণ। প্রয়োজনে এক সেকেন্ডও ইতস্তত করবে না মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে।

'মনে রাখবেন, আমার দাবি অগ্রাহ্য করার অর্থ হবে পৃথিবীর ধ্বংস ডেকে আনা। মাটির মানুষ-গবাদিপশু মরবে, গাছের পাখি মরবে, নদীর মাছ মরবে, জমি তার উর্বরাশক্তি হারাবে। এসবের ফল কি হবে, বিশ্ববাসীকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি আমি। চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে আমার দাবি পূরণ করতে হবে।

'এবার আমার দাবি ও নির্দেশ মন দিয়ে শুনুন। প্রকল্পগুলোকে মুক্ত করে দেয়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের সম পরিমাণ মুক্তিপণ চাই আমি। পাঁচ শূন্য বিলিয়ন, বি ফর বিউগল। নগদ নয়, হীরে চাই—কাট জেম ডায়মন্ড, কারেন্ট দর, আজকের বাজার দর অনুযায়ী। লন্ডন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম আর আমেরিকার বাজার থেকে ওগুলো জোগাড় করতে হবে। বড় ন্যাভাল ফ্লোটেশন ব্যাগে ভাল করে, যত্নের সঙ্গে প্যাক করতে হবে হীরে, ব্যাগের সাথে সাধারণ ন্যাভাল বা আর্মি রিকভারী হুপ জুড়ে দিতে হবে মজবুত করে। তারপর ওটাকে এয়ারক্র্যাফটে করে বয়ে এনে আমার নির্দেশিত জায়গায় ড্রপ্ করতে হবে।'

কোথায় ফেলতে হবে, কত অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশ, পরিষ্কার উচ্চারণে, থেমে থেমে তিনবার বলে গেল বক্তা, যেন বুঝতে কারও কোনও ভুল না হয়।

'ডায়মন্ড ডেলিভারি দেয়ার আগে ড্রপিং পয়েন্টের চতুর্দিকের পঞ্চাশ স্কোয়্যার মাইলের মধ্যে কোন জাহাজ বা ভেসেল, কিছুই আসতে পারবে না, এবং ব্যাগ ড্রপ্ করে বহনকারী এয়ারক্র্যাফটকেও জোনের বাইরে চলে যেতে হবে। ডায়মন্ড হাতে না পাওয়া পর্যন্ত, শুধু হাতে পাওয়া নয়, ওগুলোর খাঁটিত্ব, দাম ইত্যাদি সব ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত প্ল্যান্টগুলো আমার দখলেই থাকবে।

আমার নিজস্ব এক্সপার্টদের দিয়ে কাজটা করাতে দু'ঘণ্টামত সময় লাগবে। যদি ডায়মন্ডের কোয়ালিটিতে কোন ফাঁক না থাকে, ড্রপিঙের তিন ঘণ্টার মধ্যে সব প্ল্যান্ট ছেড়ে চলে যাবে আমার লোকেরা।

'যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমার দাবি পূরণ না হয়, যদি কোন পক্ষের তরফ থেকে আমার বিরুদ্ধে কোনরকম অ্যাকশনে নামার লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে বিনাদ্বিধায় হুমকি কার্যকর করবে আমার লোকেরা।

'আরেকবার স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, আমার এই মেসেজকে কেউ গুরুত্বহীন মনে করবেন না। তাহলে বাকি বিশ্বকে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ, মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক ঘটনার সাক্ষী হতে হবে। এটা আমার প্রথম ও শেষ মেসেজ, এরপর আর যোগাযোগ করব না। মনে রাখবেন, পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্যে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় আছে আপনাদের হাতে। কাজেই একটু তৎপর হোন, আমার দাবি পূরণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। মেসেজ শেষ।'

প্রধানমন্ত্রী হ্যাম্পশায়ারে ছিলেন, খবর পেয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে এসেই এই মীটিঙ ডেকেছেন। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও জার্মানি-ফ্যান্সের রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে কথা হয়েছে আমার,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ওঁদের সাথে আমিও একমত, এই টেররিস্ট অ্যাকশনের কাছে আমরা সম্পূর্ণ অসহায়, কিছু করার নেই। মুক্তিপণের অঙ্ক বিশাল, অবিশ্বাস্য, তবু কাজ শুরু করে দিয়েছি আমরা সবাই। ডায়মন্ড সংগ্রহ করা হচ্ছে। বিকেলের মধ্যেই প্যারিস পৌঁছে যাবে সব। ফ্রেঞ্চ এয়ারক্র্যাফট সময়মত ওগুলো নিয়ে ড্রপিঙ পয়েন্টে রওনা হবে। আপনারা জানেন, জায়গাটা ভূমধ্যসাগরে। সব যদি ঠিকঠাক থাকে, কাল ব্রিটিশ সময় সকাল ন'টায় ডায়মন্ড ড্রপ করা হবে।

'সমস্যা হচ্ছে, ওই সময় নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে সমস্ত জাহাজ, ভেসেলকে দূরে সরিয়ে রাখা নিয়ে। তবু, সেটাও সম্মিলিতভাবে দেখেছি আমরা। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ ব্যাপারে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত। এই প্রথম আমার দেশ কোন টেররিস্ট গ্রুপের ব্ল্যাকমেইলের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো! কিন্তু,' থেমে দু'হাত চিত করলেন প্রধানমন্ত্রী, 'এই পরিস্থিতিতে আর কী করার আছে আমাদের? নেই কিছু। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বিন্দুমাত্র অধিকার নেই কোনও সরকারের, অন্তত এই ক্ষেত্রে।'

এক-এক করে উপস্থিত সবার মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে এল তাঁর দৃষ্টি। 'কারও কোন পরামর্শ আছে?'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন মারভিন লংফেলো। 'আমার আছে, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার।'

'বলুন!'

'আমার ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিতভাবে জানে এই ঘটনার জন্যে দায়ী কে। সে এ-মুহূর্তে কোথায় আছে, কোত্থেকে কথা বলেছে, আমার বিশ্বাস তাও জানি আমরা। এয়ারক্র্যাফটে আছে সে, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, মেডিটারেনিয়ানের ওপর ফ্রান্সের পারপিগনান থেকে আকাশে উড়েছে ওটা, সঠিক খবর পেতে দেরি হওয়ায় অল্পের জন্যে ওটাকে ধরতে পারিনি আমরা, আই মীন, ফ্রেঞ্চ অথরিটি। ওটায়

বাংলাদেশের একজন এসপিওনাজ এজেন্টও আছে।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রধানমন্ত্রী। 'হ্যাঁ। আপনার কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট আমি পড়েছি এখানে আসার পথে। কি যেন নাম? মাসুদ রানা।'

'হ্যাঁ। আগেও অনেকবার অনেক বড় বড় বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ও আমাদের। এখানে মাসুদ রানার সংস্থার চীফ, রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল রাহাত খান আছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমাদের "স্ট্রাইক ফোর্স" প্রধান ছিলেন ইনি,' ঘুরে বৃদ্ধের দিকে তাকালেন লংফেলো। নীরবে পরস্পরের উদ্দেশে নড করলেন প্রধানমন্ত্রী ও রাহাত খান। 'আপনার আপত্তি না থাকলে ভদ্রলোক কিছু বলবেন।'

'অফ কোর্স, অফ কোর্স!' ঝুঁকে বসলেন তিনি। 'বলুন, মিস্টার খান।'

'আমি একটা পরামর্শ দিতে চাইছি, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' নড়েচড়ে বসে বললেন বদ্ধ। 'ফ্রেঞ্চ এয়ারফোর্স দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যদি এয়ারক্র্যাফটটাকে অনুসরণ করে, সবচে' ভাল হয়। আমি জানি, এ মুহূর্তে কারও কিছু করার নেই। তবে গ্রুপগুলো কাল যার যার স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর হয়তো ডায়মন্ড উদ্ধারের একটা সুযোগ পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে।'

খানিক ভাবলেন প্রধানমন্ত্রী। মাথা দোলালেন। 'আমার ধারণা ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন আপনি। কারও কোন আপত্তি?' অন্যদের দেখলেন তিনি। সবাই নীরব। বোঝা গেল নেই। 'ওকে, মিস্টার খান। আমি মীটিঙ সেরে কথা বলব ফরাসী প্রেসিডেন্টের সাথে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'আপনার মাসুদ রানা,' সামনের ফোল্ডারে চোখ রেখে বললেন তিনি। 'ওই এয়ারক্র্যাফটে আছে শিওর?'

'শিওর,' তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মারভিন লংফেলো। 'অলমোস্ট। ওর কাছে লিসনিঙ ডিভাইস পোরা বিশেষ এক প্যাকেট সিগারেট ছিল। প্যাকেটটা ওখানকার হ্যাঙ্গারে কুড়িয়ে পেয়েছে ফরাসীরা। আমার বিশ্বাস রানা ওটা ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে।'

'আই সী!' আনমনে কান চুলকালেন প্রধানমন্ত্রী। চিন্তিত মনে রাহাত খানের দিকে তাকালেন। 'আপনার কি মনে হয়, মিস্টার খান, মাসুদ রানা কি পারবে পরিস্থিতি সামাল দিতে?'

'ও যদি না পারে, তাহলে পৃথিবীর কেউ পারবে না, মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে।

বারো

চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা। মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করছে বাস্তব পরিস্থিতি। সমস্যা একটা অন্যটাকে ঠেলে লাইনের মাথায় এসে দাঁড়াতে চাইছে, টেনে

নামিয়ে দিতে চাইছে হতাশা সাগরের গভীর তলদেশে।

লক্ষণটা ওর চেনা। পানিতে পড়ে যাওয়া মানুষ যখন কূলের দেখা না পেয়ে হতাশ হয়ে বাঁচার আশা ছেড়ে দেয় সাঁতার কাটার ক্ষমতা হারিয়ে, অথবা তুষার মোড়া প্রান্তরে পথ হারিয়ে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাঁটতে হাঁটতে জমে যায়, ফেটিগে আক্রান্ত হয়, হাল ছেড়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে, তখন হয় এরকম।

এ পর্যন্ত যে সব চমক দেখিয়েছে রজার সাইমুর, তাতে ও পুরো নিশ্চিত, জিতে গেছে লোকটা। কোন সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে। প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে রানা। মৃত্যু এখন কেবলই সময়ের ব্যাপার। এখনও যে লোকটা ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে, তা কি দয়া করে? নাকি সে কতবড় ক্ষমতাধর তা প্রমাণ করার জন্যে? তাই হবে, ভাবছে ও, এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই। নিজের ক্ষমতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ইত্যাদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে বলে বাঁচিয়ে রেখেছে সে ওদের, বিশেষ করে রানাকে। মৃত্যুর আগে যাতে বুঝে যেতে পারে, কতবড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কি ভুল ও করেছে।

হাল ছেড়ো না, বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছে রানা এতকিছুর পরও, হতাশ হয়ো না। সতর্ক থাকো। কিছু একটা করো এই অপ্রতিরোধ্য দানবটার হাত থেকে নিজেকে, বিশ্বকে রক্ষা করতে।

প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা কম নয় ওর, তাই স্টারলিফটারের বর্তমান ফ্লাইট প্যাটার্ন বুঝে নিতে দেরি হয়নি। বিশাল এক বৃত্ত ধরে একই জায়গায়ই যে ঘুরে চলেছে ওটা, তাতে কোন সন্দেহ নেই রানার। সম্ভবত পঞ্চাশ মাইল ব্যাসার্ধের হবে বৃত্তটা। এবং সর্বোচ্চ উচ্চতায়, অবশ্যই। ফুয়েল খরচ কমাতে এর কোন বিকল্প নেই, সবাই জানে।

মুখ ঘুরিয়ে রোজালিন এদিকেই তাকিয়ে আছে দেখে হাসল। জবাবে ঠোঁট গোল করে চুমু খাওয়ার ভঙ্গি করল সে। সাহসী মেয়ে, ভাবল রানা। নিয়তিকে মেনে নিয়েছে, ভেতরের মৃত্যু-ভয়ের ছায়া চেহারায় ফুটতে দিচ্ছে না। রজার সাইমুর ওদিকে একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে।

'বুঝলেন, মিস্টার রানা, ডেডলাইন শেষ হওয়ার ঠিক দু'ঘণ্টা আগে নিচে নামব আমরা ডায়মন্ডের ব্যাগ তোলার জন্যে। যদিও রাডারের মাধ্যমে তার অনেক আগেই জানা হয়ে যাবে কখন ওদের এয়ারক্র্যাফট ওটা ড্রপ্ করে গেছে। ওরা যত আগেই করুক না কেন, আমি নামব শেষ সময়ে, কারণ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাটাদের টেনশনে রাখতে চাই আমি। ফ্লোটেশন ব্যাগ সাগর থেকে তুলে নেয়া কোন সমস্যা হবে না। আমার এয়ার ক্রুরা ও-কাজের আর্টও ভালই জানে। বেশ নিচু দিয়ে উড়ব তখন আমরা, পিছনের র‍্যাম্প খুলে লম্বা কেবলের মাথায় বাঁধা গ্র্যাপলিং হুক দিয়ে আমার লোক ওটাকে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার মত করে তুলে আনবে। ওটাকে তুলতে উইঞ্চ দরকার হবে অবশ্য, তাও রেডি।' হাসল বিজ্ঞানী। 'কেমন বুঝলেন?'

'ভালই তো!' বলল রানা। 'কিন্তু একটা মুশকিল আছে।'

'কিসের মুশকিল?' ভুরু কুঁচকে গেল সাইমুরের।

'এত ডায়মন্ড বেচতে গেলে বাজারের দফারফা ঘটে যাবে।'

'ও মাই ডিয়ার মাসুদ রানা,' হতাশ হওয়ার ভান করল লোকটা। 'সব সময় আপনি আমাকে এত আন্ডারএস্টিমেন্ট করেন কেন? আমি ধৈর্যশীল মানুষ, আজকের এই বিশেষ দিনটির জন্যে অনেক দিন ধরে রয়ে-সয়ে তৈরি হয়েছি, জানেন? আপনি ভেবেছেন ওগুলো হাতে পেলেই বোঁচকাটা একদল বয় স্কাউটের কাঁধে তুলে দিয়ে বলব: যাও, বাজারে গিয়ে বেচে এসোগে?' মাথা নেড়ে কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'আপনার বুদ্ধিশুদ্ধির গভীরতা দেখে সত্যিই বড় হতাশ হলাম, জনাব।

'বলেছি না, এ জন্যে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করেছি আমি? দরকার দেখলে আবারও করব, এক বছর, বা দু'বছর। কোন অসুবিধে নেই, তাড়াও নেই। তারপর আস্তে আস্তে বাজারে ছাড়ব। ততদিন পর্যন্ত নিজের টাকায় রিঅ্যাক্টর তৈরির কাজ চালিয়ে যাব। টাকা যথেষ্ট আছে আমার, তা দিয়ে কাজ বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।'

'কিন্তু ওরা যদি কঠোর অবস্থান নেয়?' বলল ও। 'যদি দাবি মানতে অস্বীকার করে বসে?'

চাউনি হিমশীতল হয়ে উঠল বিজ্ঞানীর। 'তাহলে এই পৃথিবী আর থাকবে না। অন্তত আকাশে ওড়ার আগে যেটাকে দেখে এসেছেন, সেটাকে আর কোনদিন দেখতে পাবেন না।'

'অর্থাৎ সত্যি সত্যি তাহলে টেররিস্টদের কুলিঙ সিস্টেম অফ করে দিতে নির্দেশ দেয়া হবে ?'

হাত নাড়ল সাইমুর অধৈর্য হয়ে। 'তার কোন প্রয়োজনই হবে না। কাঁপতে কাঁপতে এসে ডায়মন্ড দিয়ে যাবে ওরা।'

'কিন্তু...' থেমে গেল রানা। কি লাভ কথা বাড়িয়ে? তবে উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা সহজে রেহাই দিতে চায় না। যদি কোন টেররিস্ট স্কোয়াড কন্ট্রোলের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে ভুল করে? অথবা যদি কোন দেশের আহাম্মক, মাথামোটা সিকিউরিটি ফোর্সের নীতি নির্ধারক পরিস্থিতির গুরুত্ব ভালমত বুঝতে না পেরে কমান্ডো অভিযান চালিয়ে বসে? তাছাড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্মাদটার দাবি পূরণ করা যদি কোন কারণে সম্ভব না হয়? কি হবে তখন?

অযথা মাথা গরম করে তোলা হচ্ছে, ভাবল রানা। এসব অকাজের দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে বরং কাজের কথা ভাবা যাক। যেভাবে হাত বাঁধা আছে, তাতে নিজেকে মুক্ত করতে পারার সম্ভাবনা প্রায় নেইই বলা চলে। আর পারা গেলেও নিরস্ত্র অবস্থায় এত শত্রুর বিরুদ্ধে কি এমন ঘোড়ার ডিম করতে পারবে ও? হায় খোদা! হারামজাদার প্ল্যানে কোথাও কি বেহুলার বাসর ঘরের মত একটা ছোট্ট ফুটোও নেই?

শূন্য দৃষ্টিতে তার সামনের ইলেক্ট্রনিক জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ঘন ঘন নজর যাচ্ছে অ্যাডজাস্টেবল্ মাইক্রোফোন আর ওটার 'স্পীক' লেখা বাটনের দিকে ওটার মাধ্যমেই খুব সম্ভব টেররিস্ট স্কোয়াডগুলোর সাথে কথা বলার ব্যবস্থা আছে সাইমুরের। তাই হবে। দাবি মেনে নেয়া হলে ওটার সাহায্যেই স্কোয়াডগুলোকে নিরস্ত করবে সে। কিন্তু কি বলে? সাঙ্কেতিক কোডটা কি? কিছু

একটা খোঁচাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে, কি যেন মনে পড়ব পড়ব করছে, অথচ পড়ছে না। কি সেটা?

'কাজ শেষে টেররিস্টদের ভাগ্যে কি ঘটবে?' প্রশ্ন করল ও সহজ কণ্ঠে।

ভুরু কুঁচকে চকিত চাউনি দিল বিজ্ঞানী। 'কি ঘটবে মানে?'

'কাজ শেষ হলে আপনি নিশ্চই চলে যাবেন নিজের নিরাপদ ঘাঁটিতে। তখন লোকগুলোর কি হবে?'

'ও,' হেসে উঠল সে। 'যাই ঘটুক, দেখার জন্যে ততক্ষণ বেঁচে থাকছেন না আপনি। কাজেই তা নিয়ে ভেবে লাভ কি?'

রানা মাথা দোলাল। যেন এর চাইতে বড় সত্যি আর হতে পারে না। 'সে আমিও বুঝি। তবু, জানতে ইচ্ছে করছে আর কি!'

'তাহলে শুনুন। ওরা প্যাট্রিকের ডিপার্টমেন্টের,' গলা খাদে নামিয়ে বলল লেয়ার্ড। 'এবং সে আমাদের সাথে নেই এ-মুহূর্তে, আমার বিশ্বাস দুনিয়াতেই নেই। সে যাই হোক, ওরা কাজ করছে সরাসরি প্যাট্রিকের নির্দেশে। এবং জানে, অ্যাকশনের সময় মৃত্যু ঘটতে পারে সবার। জেনেশুনেই নেমেছে কাজে। এখন ওদের নেতা বলতে আছি একমাত্র আমি, গায়েবী নেতা। যদি আমি ওদের বলি, সারেন্ডার করো, সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যান্ট ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে প্রত্যেকে। প্যাট্রিক তাই শিখিয়ে গেছে মানুষগুলোকে। মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসবে ওরা, ধরা দেবে পুলিসের হাতে। কারণ ওদের দৃঢ় বিশ্বাস পুলিস কিছু করতে পারবে না, জামিনে ছাড়া পেয়ে যাবে সবাই। অচেনা কেউ একজন মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢালবে সে জন্যে।

'কিন্তু?' পাখি-নড়ের সাথে এক চোখ টিপল সে। 'আসলে ঘটবে উল্টো। কাস্টডি, জিজ্ঞাসাবাদ, বিচার ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'ওদের নিরস্ত্র করতে নিশ্চই কোন কোড উচ্চারণ করতে হবে?' বলল ও।

'হ্যাঁ, অবশ্যই। সেইম কোড।'

'ছ'টার জন্যেই?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'সেরকম আয়োজনই আছে। তবে তা উচ্চারণ করার দরকার পড়বে না।'

চট করে বুঝে ফেলল রানা সঙ্কেতটা কি হতে পারে। সহজ যুক্তির ব্যাপার। এবং এই কথাটাই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত খোঁচাচ্ছিল ওকে, মনে পড়ব পড়ব করছিল। ইচ্ছে হলো খানিক উল্লাস প্রকাশ করে নেয়, গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। কিন্তু কোনটাই করল না। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে একদম স্বাভাবিক রাখল নিজেকে। কি করে মুক্তি পাওয়া যায়, তার পিছনে মাথা খাটাতে লাগল ফুল স্পীডে।

একবার যদি হাত দুটো ছাড়ানো যেত, সাইমুরের পিস্তলটা কেড়ে নেয়া কোন সমস্যা হত না। ব্যস্ত হয়ো না, নিজেকে বোঝাল ও, ধীরেসুস্থে উপায় খোঁজো। তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই, প্রচুর সময় আছে হাতে।

ওর এয়ারফোনে ক্লিক আওয়াজ উঠল। পরক্ষণে কথা বলে উঠল ক্যাপ্টেন। 'ক্যাপ্টেন টু দা লেয়ার্ড অভ মারকান্ডি, স্যার। কাউকে অল্প সময়ের জন্যে এখানে

পাঠিয়ে দিন দয়া করে।'

রানার ঠিক পিছনের চেয়ারে বসা পিটারকে ডাকল সাইমুর। 'ফ্লাইট ডেকে যাও। শুনে এসো।'

দশ মিনিট পর ফিরল দানব। চাউনি দ্বিধাগ্রস্ত। ঝুঁকে দেহের অর্ধেক দৈর্ঘ্য কমিয়ে মনিবের কানে কানে কি যেন বলল। চোখ কুঁচকে শুনল সে, তারপর মৃদু শ্রাগ করল। 'ঠিক আছে। বসো তুমি।' সুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে ওপাশের ডেস্কের দুই এক্সপার্টের দিকে তাকাল লোকটা। 'ক্যাপ্টেন বলছে তার রাডারে খানিক পর পর কিছু একটা ধরা পড়ছে। উত্তরদিকে, ফ্লাইট ডেক রাডার স্কোপের একেবারে শেষ সীমারেখার কাছাকাছি। প্রথমে ওটা কমার্শিয়াল প্লেন হবে ভেবেছিল ক্যাপ্টেন, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে দুটো ব্লিপ। নিয়মিত বিরতি দিয়ে কাছে চলে আসছে, আবার সরে যাচ্ছে। টিকটিকি হবে বোধহয়। দেখো তো কি করা যায়।'

'ওপরের স্কোপের রেঞ্জ কত?' জানতে চাইল রানা দুই এক্সপার্টকে কাজে লেগে পড়তে দেখে। বুঝে ফেলেছে ওর সিগারেটের প্যাকেট ফেলে রেখে আসার ব্যাপারটা জেনে গেছেন মারভিন লংফেলো, এবং সেইজন্যেই সম্ভবত ছায়ার মত অনুসরণ করা হচ্ছে স্টারলিফটারকে।

'প্রায় একশো মাইল,' বলল সাইমুর। এ মুহূর্তে মুখে হাসি নেই। ওপাশের ডেস্ক দেখাল হাত ইশারায়। 'ওদেরটা দেড়শো মাইল, প্রায়।'

'ঠিকই আছে, লেয়ার্ড,' স্ক্রীন থেকে চোখ তুলে সোজা হলো এক টেকনিশিয়ান। 'দুটো ডট্। রেঞ্জের মধ্যে এসেই বেরিয়ে যাচ্ছে খুব দ্রুত।'

কোন মন্তব্য করল না লোকটা। সবাই চুপ। পাঁচ মিনিট পর একই লোক কথা বলে উঠল ফের। 'আবার এসেছে! খুব সম্ভব শ্যাডো এয়ারক্র্যাফট। রেঞ্জের বাইরে ঘুরছে, হঠাৎ হঠাৎ কাছে এসে আমাদের অবস্থান দেখে নিচ্ছে হয়তো।'

'দেখুক,' গভীর আত্মগত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল বিজ্ঞানী। 'তাতে ওদের কোন উপকার হবে না। কোন অ্যাকশন নিতে পারবে না ব্যাটারা।'

'পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো ঝুঁকিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পারবে না ঠিকই, কিন্তু তারপর?' বলে উঠল মাসুদ রানা।

'কি তারপর?' ঘুরে তাকাল সে।

'তারপর আসবে ওরা। ভয় দেখিয়ে হোক, গুলি করে হোক, স্টারলিফটারকে বাধ্য করবে ল্যান্ড করতে।'

'আবারও আন্ডারএস্টিমেট করছেন আপনি আমাকে, মিস্টার রানা,' আফসোস প্রকাশ পেল তার গলার স্বরে। মাথা দোলাল সে। 'আপনার আবোল-তাবোল কথা শুনে বড় হতাশ আমি। ভেবে পাই না এমন এক জড়বুদ্ধির মানুষকে কি ভেবে আমার পিছনে লাগানো হলো!'

থমকে গেল ও। পেটের মধ্যে আবার গুলিয়ে উঠল। হারামজাদা! মনে মনে বলল, সাক্ষাৎ শয়তান। কোথাও ফাঁক রাখেনি।

'না,' বলল লেয়ার্ড। 'সময় যখন হবে, ওরা তখন স্টারলিফটারকে খুঁজেই পাবে না। ওদের রাডার জ্যাম করে দেব আমি। সে ব্যবস্থা আছে। ওরা কাছে আসার সাহস সঞ্চয় করে ওঠার আগেই বহুদূরে চলে যাব আমি। এবং যতক্ষণ

পর্যন্ত আমি আমার গোপন ঘাঁটিতে সম্পূর্ণ নিরাপদে পৌঁছতে না পারছি, ততক্ষণ রিঅ্যাক্টরগুলোর দখল ছাড়ার নির্দেশ দেব না আমি ওদের।

নিচের ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবল লোকটা। এই প্রথম তাকে এমন কাজ করতে দেখল রানা। 'অবশ্য আমরা যা ভাবছি, ওরা তা নাও হতে পারে। রুটিন, বা দৈব-সংযোগ, অনেক কিছুই হতে পারে।'

তা পারে, নিজের মনে বলল রানা।

স্টারলিফটারের বহু মাইল উত্তরে, ফরাসী ফোর্থ ফাইটার উইঙের দুই সুপার মিরেজ ফাইটার একযোগে বাঁক নিল দুনিয়া কাঁপানো বিকট আওয়াজের সাথে। নিচে আরও দুটো ফাইটার দেখতে পেল প্রথম দুই পাইলট, ধেয়ে আসছে বিদ্যুৎগতিতে। প্রথম জোড়ার দায়িত্ব নেবে এখন ওরা।

ওপরের লীডার তার ট্রান্সমিটার অন করল। 'ওয়াচডগ ফাইভ।'

জবাব এল এক মুহূর্ত পর। নিচের লীডার বলল, 'ওয়াচডগ ফাইভ, দিস ইজ ওয়াচডগ সিক্স অন রুটিন পেট্রল। উই টেক ওভার নাউ। ইন্সট্রাকশনস্ ইউ রিটার্ন টু বেজ অ্যান্ড রিফুয়েল। ওভার।'

'ওয়াচডগ ফাইভ। ইন্সট্রাকশনস্ আন্ডারস্টুড। অল কোয়ায়েট। হেডিঙস অ্যাজ বিফোর। গুড লাক্।'

মেসেজ অ্যাকনলেজ করল ওয়াচডগ ছয়। পাইলট ও অন্য আরোহীরা দেখল আচমকা কাত হয়ে গেল ওপরের দুই মিরেজ, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল ওদের চকচকে ফিউজিলাজ। তারপর পেট ভাসিয়ে দিয়ে দ্রুত এক পাক খেয়ে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে শুরু করল। ও দুটোর স্তরে উঠে এল সদ্য আসা দুই মিরেজ, শুরু হলো তাদের চক্কর। এরা কেউই জানে না কেন এই চক্করের আয়োজন করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'এক্সারসাইজ', কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে ওয়াচডগ ছয়ের লীডারের। তার ধারণা এরমধ্যে আরও কোন ব্যাপার আছে।

সেটা যাই হোক, স্কোয়াড্রন কমান্ড্যান্ট ব্যাটা চেপে গেছে। বলেছে, এটা নাকি স্ন্যাপ ডিফেন্স এক্সারসাইজ। তাই যদি হবে, তাহলে কামান থেকে শুরু করে রকেট পর্যন্ত এতসব বোঝাই দেয়ার কি দরকার ছিল?

মুখ নামিয়ে নিজের খুদে রাডার স্ক্রীনে চোখ বোলাল সে, ব্লিপ ঠিক জায়গায়ই আছে দেখে সন্তুষ্ট হলো। ঘুরে গেল দুই মিরেজ, নতুন করে আরেক দীর্ঘ চক্কর শুরু করল।

দক্ষিণে, পারপিগনান এয়ারপোর্টের মূল রানওয়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া সেপক্যাট জাগুয়ার। খুব অল্প সময়ের নোটিশে আকাশে ওড়ার জন্যে তৈরি। ওদিকে এয়ারপোর্টের অপারেশন রুমে কয়েকজন সিনিয়র-জুনিয়র আর্মি ডি ল'এয়ার অফিসার নির্ধারিত ফরমে অ্যালডান অ্যারোস্পেস কর্তৃপক্ষের লিখে রেখে যাওয়া তাদের স্টারলিফটারের ফ্লাইট প্ল্যান পরখ করে দেখছে।

ঠিকই আছে। আর সব বিষয়ের মত ওখানেও কোন ফাঁক রাখেনি সাইমুর। ফরমে লেখা আছে, অ্যালডানের নিজস্ব কিছু সিভিল এভিয়েশন ইকুইপমেন্টের কার্যকারিতা পরখ করে দেখার জন্যে কম করেও একুশ ঘণ্টা একনাগাড়ে উড়বে

তারা মেডিটারেনিয়ানের ওপর, ত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। তারপর প্রায় সী লেভেলে নেমে আসবে স্টারলিফটার, এবং সবশেষে, কাল দুপুর একটার দিকে পারপিগনান এয়ারপোর্টে ফিরে আসবে।

'ঠিকই তো আছে দেখছি,' বলল চিন্তিত, কিছুটা বিভ্রান্ত এক জুনিয়র অফিসার। 'এর মধ্যে কোন ফাঁক নেই মনে হচ্ছে।'

'আছে হে!' মাথা দোলাল দলের সিনিয়রমোস্ট অফিসার। 'এত বড় ফাঁক আছে যার মধ্যে দিয়ে আস্ত তোমাকে সেঁধিয়ে দেয়া যাবে।'

ওদিকে লন্ডনে নিজের অফিসে বন্ধু রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছেন মারভিন লংফেলো। ফ্রান্স থেকে রেডিওর মাধ্যমে আসা কয়েকটা রিপোর্টে চোখ বোলাচ্ছেন দু'জনে পালা করে। রজার সাইমুরের স্টারলিফটার ফিল্ড ফ্লাইট প্ল্যান অনুসরণ করছে, শেষ বার্তায় আছে তথ্যটা।

দু'জনেই পড়লেন ওটা, তারপর নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। চিন্তিত, গম্ভীর চেহারা ওঁদের।

'লোকটা মানুষ নয়, খান,' ক্ষোভের সাথে বলে উঠলেন লংফেলো। 'একটা আস্ত শয়তান, হাড় হারামজাদা। মানুষ কখনও এত নির্ভুল হতে পারে?'

জবাব দিলেন না তিনি, শুনতে পাননি হয়তো। আনমনে এইমাত্র আসা আরেকটা মেসেজ নাড়াচাড়া করছেন। ওটা স্প্যানিশ উপকূলের কাছের এক ফ্রেঞ্চ শহর থেকে এসেছে প্যারিস হয়ে। বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট শহরের কাছের পাহাড়ী এলাকায় আজই সকাল দশটা নাগাদ এক কপ্টার দুর্ঘটনা ঘটেছে। পাইলটসহ চারজন যাত্রীর সবাই নিহত হয়েছে দুর্ঘটনায়। এদের একজন মেয়ে। অ্যালডান অ্যারোস্পেসের কপ্টার ছিল ওটা।

আরোহীদের পরিচয় এখনও জানা সম্ভব হয়নি। সে চেষ্টা চলছে।

কয়েক যুগ পর অবশেষে আঁধার নেমেছে ভূমধ্যসাগরে। সামনে অনেক লম্বা রাত। অসহ্য লাগছে মাসুদ রানার। জীবন-মৃত্যুর মাঝের অনিশ্চিত এই প্রতীক্ষার যদি একটা সুরাহা হয়ে যেত, এখনই, বড় ভাল হত। চুকে যেত ঝামেলা। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এত সহজে তা হবে না।

দম দেয়া পুতুলের মত মুখ বুজে কাজ করে চলেছে সাইমুরের স্টাফ-ক্রুরা। কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই, রুটিন অনুযায়ী চলছে সবকিছু। বাঁধা নিয়ম. কোথাও তিল পরিমাণ বিচ্যুতি নেই। সময়মত খাবার, পানীয়, কফি এমনকি সিগারেট পর্যন্ত না চাইতেই হাজির পাচ্ছে রানা ও রোজালিন। এবং সবকিছু সেরা জিনিস। অন্য সবাই সময়মত ক্যান্টিনে গিয়ে খেয়ে আসছে। তবে একা থাকার সুযোগ একদম দেয়া হচ্ছে না ওদের–সাইমুর গেলে পিটার পাহারায় থাকে, অথবা পরেরজন গেলে আগেরজন।

মাঝেমধ্যে এটা-ওটা নিয়ে এক আধটা মন্তব্য বিনিময় হচ্ছে রানা ও বিজ্ঞানীর মধ্যে। অবশ্য কথা বলার আগ্রহে এরইমধ্যে বেশ ভাটা পড়েছে লোকটার, আগের মত সুযোগ পেলেই বক্ বক্ করে না। বলে, তবে দু'চার কথায় বক্তব্য শেষ করে চুপ মেরে যায়। খাওয়ার সময় হাতের বাঁধন খুলে দেয়া হয়

ওদের, বাথরুমে যাওয়ার সময়ও। পরেরটার বেলায় একজন সশস্ত্র গার্ড থাকে সঙ্গে। ক্লজিটের দরজা বাইরে থেকে আটকে দিয়ে অপেক্ষা করে। কাজ শেষ হলে ফিরিয়ে এনে আবার কষে বাঁধে।

কঠিন ব্যবস্থা, কোথাও কোন খুঁত নেই। তবু হাল ছাড়েনি রানা। আশা ছাড়েনি। লেগে আছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, লেগে থাকলে একটা না একটা সুযোগ আসবেই। মুক্তির কোন না কোন পথ পাওয়া যাবেই। অবশেষে ওর ধৈর্য আর আত্মবিশ্বাসের জয় হয়েছে, নিজেকে মুক্ত করার একটা পথ পেয়ে গেছে রানা। কাজও শুরু করে দিয়েছে সেই লাইনে।

শেষবার বাথরুমে গিয়ে টিসু পেপার দিয়ে টিপে টিপে মোটামুটি তিন ইঞ্চি লম্বা, মজবুত এক রোল তৈরি করেছে ও। ফিরে চেয়ারে বসার সময় জিনিসটা ছিল ডান হাতের মুঠোয়, হাত বাঁধার আগে কৌশলে ওটাকে দুই কব্জির মাঝখানে লম্বালম্বি আটকে রেখেছিল, চোখে পড়েনি গার্ড লোকটার। রোলসহ বেঁধে ফেলেছে হাত। এস্কেপোলজির পুরানো একটা ট্রিক্ এটা, তবে যথেষ্ট কার্যকর।

এ মুহূর্তে ট্রিকের বাকিটুকু সারার কাজে লেগে আছে রানা, মজবুত বাঁধনের ফাঁক গলিয়ে ওটা আবার মুঠোয় নিয়ে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজটা কঠিন, দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। অবশেষে প্রায় ঘণ্টাখানেক কব্জি ঘষাঘষির পর যখন বেরিয়ে এল ওটা, বাঁধন দু'ইঞ্চিমত ঢিলে হলো। এবার হাত ঘুরিয়ে ওয়েবিঙ বেল্টের গিঁঠ ধরতে পারল রানা। আনন্দে অস্থির হয়ে পড়লেও তখনই বাকি কাজে হাত দিল না, ধৈর্য ধরে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকল।

এখন নয়, নিজেকে বোঝাল। না ঘুমাক, ক্লান্ত হয়ে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও ঝিমিয়ে পড়বে সবাই ভোরের দিকে, তখন। হ্যাঁ, তাই। সবাই সে সময় ক্লান্ত থাকবে, দেহ-মনের শক্তিতে ভাটা চলবে, সেই সময়। যদি এর মাঝে সুযোগটা কোনমতে বরবাদ না হয়।

ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে উঠে গিয়ে ক্যান্টিন থেকে কফি খেয়ে এল বিজ্ঞানী। রানা তখন চোখ বুজে ঝিম মেরে পড়ে আছে। সুযোগের অপেক্ষায় আছে আসলে। লোকটা ফিরে আসতে পিটার আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল, কফি খেতে যাওয়ার অনুমতি চাইল মনিবের কাছে।

মাথা ঝাঁকাল সে কনসোল থেকে চোখ না তুলে। বেরিয়ে গেল দানব। চোখের পাতা ইঞ্চির দশভাগের একভাগ মেলল ও, বিজ্ঞানীকে দেখল। নিজের কাজে আছে ব্যাটা, অন্য কোনদিকে বিশেষ খেয়াল নেই। সিদ্ধান্ত নিল ও, কাজ সারতে হবে খুবই দ্রুত, এবং আঘাতের লক্ষ্য হতে হবে নির্ভুল। চট্ করে মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলে ওপাশের ডেস্কের দুই টেকনিশিয়ানকে দেখে নিল রানা। একজন চোখ বুজে বসে আছে, তবে ঘুমায়নি, বোঝা যায়। অন্যজনের চোখ রাডার স্ক্যানারের ওপর। রোজালিন ঘুমাচ্ছে কি না বোঝা গেল না। চোখ বন্ধ। এদিকে সাইমুরের মনও সম্পূর্ণ ব্যস্ত সামনের ইকুইপমেন্টসের জঙ্গলে।

এইবার!

দু'হাত প্রার্থনার ভঙ্গিতে জোড় করে কয়েক ঝাঁকি দিতেই বাঁধন নেমে গেল

নিচে, আঙুলের সহজ নাগালে। বাকি কাজ অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে সারল ও, বেল্ট আস্তে করে পায়ের কাছে ফেলে দিল, সাইমুরের উল্টোদিকে। হাত মুঠো পাকাল কয়েকবার, খুলল, শেষবারের মত আরেকবার ভেবে ঠিক করে নিল প্ল্যান অভ অ্যাকশন।

তারপর নিঃশব্দে চেয়ারসহ ঘুরে গেল বিজ্ঞানীর দিকে। ডান হাত বিদ্যুদ্বেগে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উঠে গেল পিছন দিকে, কিনারা দিয়ে সর্বশক্তিতে ভয়ঙ্কর এক জুডো চপ মেরে বসল রানা সাইমুরের ঘাড়ে। চরম আঘাতই হেনেছিল, কিন্তু লক্ষ্য থেকে সামান্য নিচে লাগায় প্রাণে বেঁচে গেল লোকটা। মুখ দিয়ে ঘোঁৎ জাতীয় একটা আওয়াজ করে কনসোলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল নাক-মুখ দিয়ে, প্রচণ্ড সংঘর্ষে থর থর করে কেঁপে উঠল যন্ত্রপাতি।

দেরি করেনি ও, প্রায় একই সঙ্গে বাঁ হাতও চালিয়ে দিয়েছে, একটানে লোকটার হোলস্টার থেকে বের করে এনেছে কোল্ট পাইথন। কেউ কিছু বুঝে ওঠার সময় পেল না, কিসের সাথে কিসের সংঘর্ষ হলো দেখার জন্যে মুখ ঘুরিয়েই ঠিক মাঝ কপালে গুলি খেলো এপাশের টেকনিশিয়ান। মারা গেল চোখের পলকে। গুলির শব্দে আঁতকে উঠল রোজালিন, টকটকে লাল দুই বিস্ফারিত চোখে ঘুরে তাকাল। পরক্ষণে হাঁ হয়ে গেল সামনের দৃশ্য দেখে।

'মাথা নিচু করো!' চেঁচিয়ে বলল রানা। দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়ল প্রায় একই মুহূর্তে। দুটো গুলির মাঝে সময়ের ব্যবধান অল্পই ছিল, তবু এরইমধ্যে নিজের অস্ত্র বের করে ফেলেছিল দ্বিতীয় টেকনিশিয়ান। কানের পাশে গুলি খেয়ে ভীষণ জোরে ঝাঁকি খেলো তার মাথা, চেয়ারসহ আরেকদিকে ঘুরে গেল দেহটা, নিথর হয়ে গেছে। আলগা মুঠো থেকে ঠক করে মেঝেতে পড়ল তার পিস্তল। প্রথমজন হাঁ করে চিত হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, কপালে ছোট্ট একটা লাল ফুটো। এদিকে উন্মাদ বিজ্ঞানী নিথর—মাথা ডেস্কের কিনারায়, দু'হাত মরা সাপের মত ঝুলছে দু'পাশে। কপাল ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে। উল্টে গেছে পাশার ছক্।

অদ্ভুত নীরবতা চেপে বসেছে কেবিনে। রোজালিনের চমক কাটেনি এখনও, হাঁ করে আছে, চাউনিতে রাজ্যের অবিশ্বাস। এমনভাবে রানাকে দেখছে যেন ও ভিন্ গ্রহবাসী, অদ্ভুত একটা কিছু।

'ইট'স ওকে, রোজ,' বলল রানা। 'আর ভয় নেই। শান্ত হও।'

চোখে পলক পড়ল এবার মেয়েটির, অবিশ্বাসের জায়গা দখল করল আতঙ্ক। মুখ ঘুরিয়ে দুই মৃতদেহ দেখল খানিকক্ষণ, তারপর ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'সরি, রানা। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি করে…?'

'এখন না। পরে বলছি,' বুকের মজবুত বাঁধনটা খোলার চেষ্টা করল ও কিছুক্ষণ। কিন্তু কাজ হলো না। চেয়ারের পিছনে এমন জায়গায় গিঁঠ দিয়ে বাঁধা হয়েছে, হাত পৌঁছাচ্ছে না সেখানে। কাজেই সে চেষ্টা আপাতত বাদ দিয়ে আসল কাজে মন দিল। রিভলভার বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাতে অ্যাডজাস্টেবল্ মাইক্রোফোনের মাথা মুখের যথাসম্ভব কাছে টেনে আনল। ওর ধারণা কতদূর সত্যি এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, ভাবতে ভাবতে 'স্পীক্' লেখা বোতাম টিপে দিয়ে সামনে ঝুঁকল। ভেতরের অস্থিরতা চেপে রেখে শান্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করল:

'নাম্বার ওয়ান···লক্।'
'নাম্বার টু···লক্।'
'নাম্বার থ্রী···লক্।'
'নাম্বার ফোর···লক্।'
'নাম্বার ফাইভ···লক্।'
'নাম্বার সিক্স···লক্।'

সুইচ অফ করে ফোঁস করে দম ছাড়ল ও। কাজ কি হয়েছে? হবে? হবে খুব সম্ভব। ওয়ারলক নাম নিয়েছিল রজার সাইমুর তার অপারেশন মেল্টডাউনের জন্যে। শুরু যদি 'ওয়ার' দিয়ে হয়, শেষ 'লক্' দিয়েই হওয়ার কথা। সহজ যুক্তি তাই বলে।

মুখ তুলে রোজালিনকে দেখল। 'প্রার্থনা করো যেন কাজ হয়।' ডান হীল ঘুরিয়ে ওপরে নিয়ে এল ও। গোপন কম্পার্টমেন্ট থেকে ছুরিটা বের করে বেল্ট কাটতে লেগে পড়ল।

'তাড়াতাড়ি করো, রানা,' ভয়ে ভয়ে একবার পাইডিঙ ডোরের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল মেয়েটি। 'পিটার এসে পড়তে পারে।'

'চেষ্টা করছি।' ছুরি নিয়ে ওয়েবিঙ স্ট্র্যাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। জিনিসটা বেশ পুরু আর চওড়া, তারওপর এত শক্ত করে বাঁধা হয়েছে, চামড়ার ভেতরে গেঁথে আছে। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে তীক্ষ্ণধার ব্লেডের খোঁচায় নিজেকে আহতই করা হবে কেবল, তাই সাবধানে কাজ করছে। দেরি হচ্ছে দেখে বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে মেয়েটি, ঢোক গিলছে।

'এত দেরি হচ্ছে কেন?' বলল সে ব্যস্ত, চাপা গলায়।

'এই তো, হয়ে গেছে। *নিক্স প্যানিকাস*, ভয় পেয়ো না।' কাজের ফাঁকে অজ্ঞান লেয়ার্ডের দিকে তাকাল রানা। পাইডিঙ দরজা দেখল কয়েকবার, রোজালিনকে আড়াল করে। নিজেও যে পিটারের যে-কোন মুহূর্তে হাজির হওয়ার আতঙ্কে আছে তা ওকে বুঝতে দিতে চায় না। একটু একটু করে বেল্ট কেটে চলেছে ও, একইসাথে ঘামছে ভেতরে ভেতরে। অবশেষে কাজটা শেষ হলো একসময়, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। এখন কেবল সীট বেল্ট খোলা বাকি।

এক ঝটকায় ওটা খুলে সেকেন্ডের মধ্যে উঠে দাঁড়াল রানা, তিন লম্বা পায়ে পৌঁছে গেল রোজালিনের পাশে। হাঁটু গেড়ে বসে ওর বাঁধন খুলতে লেগে গেল।

'ওটা ওখানে ফেলে এলে কেন?' সাইমুরের ডেস্কে রেখে আসা কোল্ট পাইথন দেখাল সে। 'নিয়ে এসো।'

চিন্তা কোরো না,' রানা বলল। 'এই তো, হয়ে গেছে। ও ব্যাটা আসতে আসতে···' মুখ তুলে থেমে পড়ল মেয়েটির চোখ বড় হয়ে উঠেছে দেখে। পাইডিঙ ডোরের দিকে তাকিয়ে আছে।

পাঁই করে ঘুরল ও। ভেতরে ঢুকছে স্কটিশ দানব, এক হাতে এখনও ধরে আছে দরজা। রানার শূন্য চেয়ার দেখেই চোখ কুঁচকে উঠল লোকটার, পরমুহূর্তে দেখল রক্তাক্ত লেয়ার্ডকে। দেরি না করে পাইথন লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল রানা, যদিও বুঝল পিটারের আগে ওটার কাছে পৌঁছতে পারবে না।

এক মুহূর্ত লাগল লোকটার চমক কাটতে, উন্মত্ত রাগে দানবীয় এক হুঙ্কার ছেড়ে সে-ও ডাইভ দিল।

ভয়ে কুঁকড়ে গেল রোজালিন, চিৎকার করে উঠল গলা ফাটিয়ে।

তেরো

লন্ডন। ভোর পাঁচটা। স্থানীয় রানা এজেন্সির অপারেশনস্ রুমে ঝিম্ মেরে বসে আছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ঢাকা থেকে ছুটে আসার পর প্রায় দু'দিন পেরিয়ে গেছে, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তার চাপে এক মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে চোখ বোজার সময় পাননি এরমধ্যে। মাসুদ রানার খবর না পাওয়া পর্যন্ত ও কাজ তাঁকে দিয়ে হবে না, জানেন। তাই সে চেষ্টা করছেনও না বৃদ্ধ।

বসে আছেন লাল টেলিফোনের কাছে, কখন কোন্ খবর আসে তা তৎক্ষণাৎ জানার জন্যে। বিএসএসের মত রানা এজেন্সি এবং বিসিআইয়েরও সমস্ত সোর্স এ মুহূর্তে ভীষণ তৎপর স্টারলিফটারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের কাজে। প্রথমে মারভিন লংফেলোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রানা ওটাতেই আছে, কিন্তু পরে যখন অ্যালডান অ্যারোস্পেসের এক কপ্টার দুর্ঘটনায় চার যাত্রীর মারা যাওয়ার খবর এল, ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল দু'জনেরই। আশঙ্কা জেগেছিল ওর মধ্যে রানাও হয়তো আছে ভেবে। কিন্তু পরে যখন মৃতদের পরিচয় জানাল ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস, শুধু হাঁপই ছাড়েননি ওঁরা, নতুন আশায় বুকও বেঁধেছেন।

জানা গেছে পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিল কুখ্যাত সন্ত্রাসী প্যাট্রিক অলিভিয়েরো আরগুয়েলো। মেয়েটি আর কেউ নয়, রজার সাইমুরের বান্ধবী, মে হরোইৎজ। অন্য দু'জনের একজন পাইলট, অন্যজন সাইমুরের পোষা কুকুর। দুর্ঘটনা সম্পর্কে ফরাসী পুলিসের ধারণা, আকাশে ওঠার পর ওটার মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় পাইলটের মৃত্যুই এর কারণ। মাথার পিছনে গুলি লেগে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে লোকটার। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাননি রাহাত খান বা লংফেলো, ওর মধ্যে রানা ছিল না জেনেই খুশি।

তারপর থেকে চলছে অপেক্ষার পালা। ঠিক পাঁচটা দশে এল ফোন। করেছেন বিএসএস চীফ। 'ইয়েস?' দ্বিতীয় রিঙ বাজার সুযোগ না দিয়ে রিসিভার তুললেন রাহাত খান।

'সুখবর আছে, খান। ওরা সারেন্ডার করেছে,' উচ্ছ্বসিত গলায় বললেন তিনি। 'সবগুলো গ্রুপ।'

'কারা?' গলা চড়ে গেল বৃদ্ধের।

'টেররিস্টরা। এখানে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, আমেরিকায়, সবখানে সারেন্ডার করেছে ওরা হঠাৎ। রিঅ্যাক্টর ছেড়ে মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এসেছে সবাই একসাথে। বলছে, ওদের কাজ নাকি হয়ে গেছে।'

'সেকি!' চোখ কুঁচকে উঠল তাঁর।

'হ্যাঁ। একটু আগেই ঘটেছে ব্যাপারটা, প্রায় একই সঙ্গে। রিপোর্ট এখনও আসছে। ওরা বলছে, ওদেরকে নাকি কন্ট্রোল রূমের দখল ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে। হেইশাম ওয়ান ছেড়ে আসা এক সন্ত্রাসীর ধারণা, তাদের অপারেশন সফল হয়েছে বলেই বেরিয়ে আসতে বলা হয়েছে তাদের। এক ইন্টারোগেটর অবশ্য অন্য কথা বলছে।'

'কি?' ভেতরের উত্তেজনা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করলেন না রাহাত খান। 'কি বলছে সে?'

'সে বলছে, সারেন্ডারের অর্ডার ভুল করে দেয়া হয়েছে তাদের।'

'এমন এক ইঞ্জিনিয়াস, ব্রিলিয়ান্টলি অর্গানাইজড স্ট্রাটেজিতে ভুল!' চরম বিস্ময় ফুটল তাঁর কণ্ঠে। 'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'আমি তোমার সাথে একমত, এ নিশ্চই...'

'হ্যাঁ। ওরই কাজ।' নিঃশব্দ, চওড়া হাসিতে ভরে উঠল রাহাত খানের ক্লান্ত চেহারা। খানিক চুপ থেকে কার উদ্দেশে যেন অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। 'স্টারলিফটারের কি খবর?'

'একই। ঘুরছে। ফ্রেঞ্চ এয়ারফোর্স ওটার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। রিঅ্যাক্টরগুলো ঠিক ঠাক আছে নিশ্চিত হওয়া গেলেই...'

'কি?' বাধা দিয়ে বললেন তিনি। 'কি করতে যাচ্ছে ওরা? জোর করে ল্যান্ড করাতে যাচ্ছে ওদের?' রিসিভারে মুঠো শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে।

'প্রথমেই তা করবে না ওরা,' বললেন বিএসএস চীফ। গলা একটু দ্বিধাগ্রস্ত। 'তবে বাধ্য করা হলে হয়তো করতেও পারে।'

থমকে গেলেন বৃদ্ধ। 'ডিসিশনটা কাদের?'

'ফ্রেঞ্চদেরই। ওরা নিজে থেকেই করতে চাইছে কাজটা।'

'আই সী!' বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি।

'দুশ্চিন্তা কোরো না, খান। আমি খবর পেয়েই কথা বলেছি প্রাইম মিনিস্টারের সাথে। ওরা যাতে এ কাজ এখনই না করে, সে জন্যে তিনি ওদের অনুরোধ করবেন। হয়তো এতক্ষণে করেও ফেলেছেন অলরেডি। কাজেই ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

বলার মত কিছু পেলেন না রাহাত খান, আলতো করে রিসিভার রেখে দিলেন।

বিপদটা দেখেই রানা বুঝে ফেলেছিল হবে না, হলোও না। অর্ধেক পথও পার হতে পারল না, আহত, ক্ষিপ্ত হাতীর মত কোনাকুনি ছুটে এল রজার সাইমুরের চীফ লেফটেন্যান্ট, গতি আর বিশাল বপুর মিলিত কয়েক টন ওজন নিয়ে বুলডোজারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। লোকটার ভয়াবহ চিৎকারে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। ঝড়ে উপড়ানো গাছচাপা পড়লে মানুষের কেমন অনুভূতি হয় জানা নেই, তবে এর সাথে যে তার বিশেষ তফাত নেই, তা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

অস্ত্রটা সঙ্গে না রাখার আহাম্মকির জন্যে নিজেকে অভিসম্পাত করতে করতে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা, পরক্ষণে চোখে আঁধার দেখল পাঁজরের কাছে ক্রুদ্ধ দানবের হাঁটুর গুঁতো খেয়ে। ভোঁশ করে বুকের সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল। আঘাত এত জোরে লেগেছে যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবির হয়ে থাকল ও বোধ হারিয়ে। পলকে বুকের ওপর চেপে বসল পিটার, মনিবের জন্যে বেদনা আর রাগের মিলিত তাড়নায় গর্জন করছে, গোঙাচ্ছে। অনবরত কি সব বকে চলেছে ক্ষিপ্ত গলায়। বোধজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে লোকটা পুরোপুরি।

রোজালিনের সাহায্যের আশায় চিৎকার করে উঠল ও, কিন্তু আওয়াজটা বের হওয়ার সুযোগ পেল না, তার আগেই ঘ্যাক করে পুরো গলা চেপে ধরল দানব ডান হাতের প্রকাণ্ড থাবায়। দু'পাশে হাঁটু রেখে চেপে বসল ওর পেটের ওপর। গলায় চাপ খেয়ে অন্তরাত্মা উড়ে গেল রানার। কিন্তু ওটা যে আসলে চাপ ছিল না, ছিল মহড়া, বুঝল একমুহূর্ত পর। চাপের চোটে লালচে কুয়াশার হালকা একটা পর্দা দুলে উঠল ওর চোখের সামনে, জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা।

আরেকবার চিৎকার দেয়ার চেষ্টা করল রানা, দুর্বোধ্য একটা গোঙানি বের হলো কেবল, তাও অস্ফুটে। ততক্ষণে শক্তি প্রায় ফুরিয়ে গেছে, চেষ্টা করেও কিছুই করতে পারছে না ও। আশা নেই বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল, ধোঁয়াটে দৃষ্টি পিটারের বিকট মুখের ওপর স্থির- জানালা দিয়ে আসা কচি রোদের আলো পড়ে ঘর্মাক্ত চেহারা চক্ চক্ করছে তার।

হঠাৎ করে পাল্টে গেল দৃশ্যটা, আউট অভ ফোকাস হয়ে গেল দানব, গলার ওপর থেকে সরে গেছে সাঁড়াশী। কি ঘটছে বোঝার চেষ্টা করল রানার ধোঁয়ার বৃত্তে বন্দী মন। স্টারলিফটার কি লাফ দিল? হ্যাঁ, তাই তো! এঞ্জিনের একটানা গুঞ্জনও অন্যরকম শোনাচ্ছে এখন। পিটার হারামজাদা গেল কোথায়? ও কি দোলনায়? কুয়াশা কেটে যেতে শুরু করল ধীরে ধীরে। স্পষ্ট হয়ে উঠল ব্যাপারটা। একই সময় প্লেনের সামনের দিকে ছেঁচড়ে কয়েক ফুট এগিয়ে গেল ও।

রোজালিনের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে সচকিত হলো, ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করল, তখনই আবার দুলে উঠল আকাশ-দানব। ঠিক দুলে নয়, অনেকটা যেন হোঁচট খেলো। বেশ জোর ছিল হোঁচটে। প্রথম হোঁচটই ওকে বাঁচিয়েছে– স্টারলিফটার বিনা নোটিশে ডাইভ দেয়ায় ভারসাম্য হারিয়ে পিছনদিকে উল্টে পড়ে যাচ্ছে দেখে রানাকে ছেড়ে ওপাশের ডেস্ক আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল দানব।

দ্বিতীয় হোঁচটের ধাক্কা সামলে স্টারলিফটার সোজা হতেই আবার ছুটে এল, যদিও চেহারায় আগের সেই আত্মবিশ্বাসের অনেকটাই গায়েব এ মুহূর্তে। চোখ রানার ওপর থাকলেও মনটা যে বাইরে, তা বোঝা যায়। অনেক কষ্টে ঢোক গিলল রানা, হাঁটুর ওপর দাঁড়িয়ে সাইমুরের কনসোলের ওপর রাখা অস্ত্রটা খুঁজল হন্যে হয়ে। নেই। বিজ্ঞানী পড়ে আছে ফ্লোরে, ডেস্ক আর চেয়ারের মাঝখানে আটকে গেছে।

এসে পড়েছে স্কটিশ দানব। পাইথনের আশা ছেড়ে নিজের ছোট ছুরিটা

খুঁজল রানা, সেটাও নেই। অতএব খালি হাতেই বোঝাপড়া করার জন্যে তৈরি হলো। এসে পড়েছে। চোখের কোণ দিয়ে রোজালিনকে দেখল ও, চেয়ার আঁকড়ে ধরে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বাইরে কি যেন দেখছে।

আবার ডাইভ দিল স্টারলিফটার–বড় ঢেউয়ের ফাঁকের মধ্যে পড়লে ছোট বোট যেভাবে নাক নিচু করে ঝাঁপ দেয়, অনেকটা তেমনি করে। সুযোগটা লুফে নিল রানা। পিটার ক্র্যাফটের সামনের দিক থেকে আসছে, ও রয়েছে ডেস্কের কাছে, ফলে প্লেন ডাইভ দিতেই সামনের দিকে ছুটে যাওয়ার যে ঝোঁক দেখা দিল, তার সাথে নিজের গতি যোগ করে লাফ দিল রানা দুই পা এক করে।

লোকটার বুকের ওপর পড়ল ওর জোড়াপায়ের লাথি। তবে রানার ইচ্ছেমত জোর হলো না ওটায়, কারণ ওর ঝোঁক যেমন ছিল সামনের দিকে, তেমনি পিটারের ছিল পিছন দিকে। তবু যেটুকু লাগল, তাতেই বুকের বাতাস বেরিয়ে গেল তার, হুঁক্! করে আছড়ে পড়েই এক ডিগবাজি দিয়ে দড়াম করে পড়ল গিয়ে পার্টিশনের ওপর। থর থর কেঁপে উঠল ওটা।

ফ্লোরে পড়েই উঠে দাঁড়াল রানা, চেহারা বিকৃত করে ঢোক গিলে তৈরি হলো আবার। ওদিক থেকে চিৎকার করে উঠল রোজালিন, 'রানা! ফাইটার! ওরা…ওরা রকেট ছুঁড়ছে!'

তাকাবার সুযোগ হলো না ওর, উঠে পড়েছে ওদিকে পিটার। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়েছে রাগে। অবশ্য গতি অনেক কম, কারণ এখনও নাক সোজা হয়নি স্টারলিফটারের, সাঁই-সাঁই করে নিচের দিকে নেমে চলেছে। ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত, আর্তনাদ করছে ফিউজিলাজ। হঠাৎ চোখ পড়ল ওর সাইমুরের পাইথনের ওপর, পিটার আর ওর মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে আছে ফ্লোরে। প্রায় একইমুহূর্তে দানবও দেখল জিনিসটা।

বিকট আওয়াজ উঠল বাইরে, সঙ্গে সঙ্গে জোর এক ঝাঁকি খেয়েই ডানদিকে কাত হয়ে গেল প্লেন। পিটার লাফ দিল অস্ত্রটা লক্ষ্য করে। ঝাঁকি খাওয়ার আগমুহূর্তে লাফটা দিয়েছে সে, ফলে বিশেষ একটা অসুবিধে হলো না। জায়গামতই পড়ল, থাবা দিয়ে রিভলভার ধরে ফেলল, সবে গড়াতে শুরু করেছিল তখন ওটা। রানা অল্পের জন্যে মিস করল। লাফ দিতে সামান্য দেরি হওয়ায় প্লেনের ঝাঁকি লক্ষ্য থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে ফেলেছে ওকে। কোল্ট মুঠোয় পুরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠল দানব, প্রকাণ্ড মুখে উল্লাস। রাগের জায়গা দখল করেছে বিকট হাসি।

'কাজটা আমি অন্যভাবে সারব, মাসুদ রানা,' ওর চোখে ভীতি ফুটতে দেখে চেঁচিয়ে বলল পিটার। মুঠোর মধ্যে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোল্ট দোলাল। 'গুলি করলে ফট্ করে মরে যাবে, কিন্তু আমি তা চাই না। ওদিকে,' অস্ত্র দুলিয়ে লাল রঙে আঁকা পিছনের বন্ধ হ্যাচওয়ে দেখাল। 'ওদিকে চলো।'

কয়েক পা এগোল লোকটা ভারসাম্য বজায় রাখার কসরৎ করতে করতে। এখনও সোজা হয়নি স্টারলিফটার, কাত হয়ে নেমেই চলেছে তুমুল গতিতে। এঞ্জিনের আর্তনাদে কান পাতা দায়। 'হাঁটো!' হুঙ্কার ছাড়ল সে আবার।

উপায় নেই, ভাবল ও। নির্দেশ না মানলে গুলি অবশ্যই করবে লোকটা,

কোন ভুল নেই। তারচেয়ে বরং মেনে দেখা যাক কি করাতে চায় সে ওকে দিয়ে। সময় পেলে আরেকটা সুযোগ পাওয়া যেতেও পারে। ঢালু পথ দিয়ে কাঁকড়ার মত এগোল রানা ধরে ধরে। যেন পাহাড়ে চড়ছে। টেনেহিঁচড়ে কোনরকমে পৌঁছল এসে জায়গামত। পিটারও এল পিছন পিছন।

তবে খুব কাছে এল না। রানাকে আর কোন সুযোগ দিতে চায় না। 'এইবার,' বলে উঠল সে। 'দরজাটা খোলো। ধরে রাখো আমি এসে না ধরা পর্যন্ত।'

তাই করল ও। এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ধরে থাকল পাইডিঙ হ্যাচওয়ে। একটু পর পিঠে পাইথনের খোঁচা খেয়ে বুঝল এসে গেছে লোকটা। এক হাতে দরজা ধরে জোর এক ধাক্কায় রানাকে ভেতরে পাঠিয়ে নিজেও ঢুকল। দরজা ছাড়েনি এখনও। সামনে তাকাল রানা। বেশ বড় এক স্পেস, স্টারলিফটারের মাল রাখার জায়গা। ওপরে মালপত্র র‍্যাম্প পর্যন্ত ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার লম্বা লম্বা রেইল। দরজা ছেড়ে রানার কলার ধরতে হাত বাড়িয়েছিল পিটার, এমনসময় খুব দ্রুত বাঁক নিল প্লেন, অল্পের জন্যে তার হাত থেকে ছুটে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল ও। পড়ে যাচ্ছিল, সময়মত থাবা দিয়ে এক রেইল ধরে সামলে নিল।

'আমি এখনও তোমার দিকে জিনিসটা ধরে আছি, রানা,' নিজেকে স্থির করে বলল পিটার। 'চালাকি করতে যেয়ো না কোন।'

নিজের চারদিকে তাকাল রানা। জায়গাটা ঠাণ্ডা, ফুয়েলের গন্ধ ভাসছে। তার সাথে আছে প্লাস্টিকের গন্ধ, সব এয়ারক্র্যাফটে পাওয়া যায় এই অদ্ভুত গন্ধটা। রেইল ছাড়ার সুযোগ পেল না ও, স্টারলিফটার ঘন ঘন ডানে-বাঁয়ে করছে, নামছে এখনও। থেকে থেকে ঝাঁকি খাচ্ছে ভীষণভাবে। ঝাঁকির কারণ এখন বুঝতে পারছে ও। ভয় দেখিয়ে এটাকে অবতরণ করানোর চেষ্টা চলছে, খুব সম্ভব ফরাসী ফাইটার লেগেছে পিছনে। সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেদ করে ওগুলো বারবার কাছে চলে আসছে বলে বাতাসের অস্বাভাবিক কম্পনের ফলে ঝাঁকি খাচ্ছে স্টারলিফটার।

পিছনে বড় কোন সুইচ অন করার শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণে হাইড্রলিক মেশিনের গুঞ্জন উঠল, সার্বক্ষণিক কাঁপুনি শুরু হলো ফ্লোরের। ঘুরে তাকাল রানা। দেখল হ্যাচওয়ের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে দানব হেলান দিয়ে, ডান হাতে রিভলভার, বাঁ হাতে ধরে আছে দেয়ালের এক ধাতব বক্স থেকে বেরিয়ে আসা দুই ফুট লম্বা নাইফ-সুইচ। সুইচটা 'অন' করেছে সে। আরেক ডাইভের ধাক্কা সামলে হাসল।

'লেয়ার্ডের ইচ্ছে ছিল কেব্‌লের সাথে তোমাকে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেবে নিচে, র‍্যানসমের ব্যাগ তোমাকে দিয়ে তোলাবে,' বলল লোকটা। 'পরে বাদ দেয় সে প্ল্যান। আমি তাই করতে যাচ্ছি এখন, রানা। তবে কেব্‌ল্ ছাড়া অবশ্য।'

ভেতরটা আলো হয়ে উঠছে দেখে পিছনদিকে তাকাল রানা, ফিউজিলাজের শেষ মাথার বড় একটা অংশ ধীরে ধীরে দেহ থেকে আলগা হয়ে নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। ওটা র‍্যাম্প। ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে পেল ও।

'ওটা পুরো খুলতে দু'মিনিট লাগবে, রানা,' আবার বলে উঠল সে। 'তারপর তোমার জন্যে চমৎকার এক স্কি-পোপ তৈরি হবে। অপেক্ষা করো।'

ভেতরে গরম একটু একটু বাড়ছে টের পেল রানা। হাইড্রলিকের গুঞ্জন বেড়ে গেছে অনেক। ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে প্রবলবেগে পাক খাচ্ছে বাতাস। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা চলছে ওর। মরতে যদি হয়ই, গুলি খেয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বরণ করবে, ভাবছে ও। হ্যাচওয়ে দিয়ে লাফিয়ে নয়। দু'জনের মাঝখানের ব্যবধান বিশ ফুট হবে অনুমানে বুঝল। দূরত্বটা বেশিই।

স্টারলিফটার এখনও নামছে। ওটার নিম্নগতি রানার কাজে লাগতে পারত, যদি পিটার নিরস্ত্র হত, দুই লাফে ওর কাছে পৌঁছে যাওয়া কোন সমস্যা হত না। কিন্তু এখন তা হওয়ার নয়। বেশিরভাগ মানুষেরই অন্তরের গভীরে উচ্চতা সম্পর্কে কিছু না কিছু ভয় থাকেই। রানারও আছে। তাই এত উঁচু থেকে পড়ে মরার কোন ইচ্ছে নেই। মৃত্যুকে পরোয়া করে না ও, এ পেশায় ওটা যে-কোন সময় ঘটতেই পারে। কিন্তু সে-মৃত্যু হানা দেয় মুহূর্তে, প্রাণ কেড়েও নেয় পলকে। তার সাথে এর তফাত আছে।

পিছনের ফাঁক খুব দ্রুত বড় হচ্ছে এখন। বাইরে ধোঁয়ার মত মেঘ ভাসছে, পরিষ্কার দেখা যায় না কিছু। কপালে ভয়ের চিকন ঘাম ফুটছে টের পেল ও। একটু পর খুব ভারী এক ধাতব আওয়াজের সাথে লক হলো র‍্যাম্প, পুরো খুলে গেছে। ফাঁক গলে আস্ত একটা বাড়ি ঢুকে যাবে এখন অনায়াসে।

সেদিকে ইঙ্গিত করল পিটার কোল্ট নাচিয়ে। 'গো ডুন টায় হেল্, রানা।' হাসছে দাঁত বের করে।

'তোমার হারামীর বাচ্চা লেয়ার্ডকে নিয়ে তুমি যাও,' চেঁচিয়ে বলল ও। 'বাইরে কি ঘটছে বুঝতে পারছ কিছু? ওরা তোমাদের জামাই আদর করতে এসেছে, বুঝলে?' কথার ফাঁকে দ্রুত একটা কিছু করার চিন্তা ঘুরছে ওর মাথায়।

পিছনে আকাশ কাত হলো আবার, হঠাৎ ডানে ঘুরতে শুরু করেছে স্টারলিফটার। রেইল ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়াল রানা, ঠিক করে ফেলেছে ঝাঁপ দেবে পিটারকে লক্ষ্য করে, যা থাকে কপালে। মরতে যদি হয়ই, গুলি খেয়ে মরবে, চেষ্টা করবে ওটাকেও সঙ্গে নিয়ে মরতে। স্টারলিফটারের নাক থেকে লেজ পর্যন্ত ভয়াবহ এক ঝাঁকি খেলো।

এত জোর ঝাঁকির জন্যে তৈরি ছিল না রানা, রেইল থেকে ছুটে গেল হাত, ছুটে গিয়ে দেয়ালে বাড়ি খেলো দড়াম করে। পিটারের দিকে চোখ রেখে হাচড়েপাঁচড়ে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। জায়গা থেকে নড়েনি লোকটা, নড়ার জায়গাও নেই। এক হাতে সুইচটা ধরে পিছনের পার্টিশনের সাথে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর দুর্দশা দেখে আবার হাসল সে। কোল্ট দোলাল। 'যাও, রানা। লাফ দাও। ওড়া প্র্যাকটিস করোগে ডানা ছাড়া।' হাসি পূর্ণ বিস্তৃতি পেল দানবের, অস্ত্র তুলল রানার বুক সই করে। 'মুভ!'

জমে গেছে মাসুদ রানা। বুঝতে পারছে সময় শেষ, যা হোক এই মুহূর্তেই করতে হবে ওকে। এমন সময় পিটারের পিছনের পাইডিঙ দরজা সামান্য ফাঁক হলো। প্লেনের লাফঝাঁপের জন্যে ব্যাপারটা ঘটছে ভেবে চোখ ফিরিয়ে নিতে যাচ্ছিল রানা, তখনই দেখতে পেল রোজালিনকে। হাতে লম্বা ফলার এক ছোরা।

জিনিসটা দেখামাত্র চিনল ও—কপালে গুলি খাওয়া টেকনিশিয়ান মেঝেতে পড়ে যাওয়ার পর ওটা তার মোজার মধ্যে গোঁজা দেখেছে ও। ট্রাউজার উঠে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছিল। হাত তুলল রোজালিন, কোপ মারতে যাচ্ছে।

এভাবে ওদিকে তাকিয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না বুঝে পিটারের দিকে নজর ঘোরাতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে, কিছু একটা সন্দেহ হতে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল পিটার। দুই হাত পিছনেই দাঁড়ানো মেয়েটিকে দেখামাত্র রাগে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। কোল্ট ঘোরাতে শুরু করল। আঁতকে উঠে দ্রুত কয়েক পা এগোল রানা। পিটার গুলি করতে যাচ্ছে রোজালিনকে, ঠিক সেই মুহূর্তে আবারও বেমক্কা আচরণ করল স্ট্যারলিফটার। হঠাৎ করেই সোজা হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পিছনমুখী থেকে অভ্যস্ত পিটার ঘুরে দাঁড়াতেই এই পরিবর্তন সামলে উঠতে পারল না, পড়ে যাচ্ছে ভেবে দ্রুত এক হাত বাড়াল ওপরের রেইল ধরবে বলে। প্রায় একই সঙ্গে ঝিকিয়ে উঠল রোজালিনের ছোরা, রেইল দেখার জন্যে অজান্তেই পলকের জন্যে মুখ তুলেছিল দানব, এই সুযোগে সর্বশক্তিতে ছোরা চালাল সে তার উন্মুক্ত গলায়। লম্বা ফলার প্রায় সবটুকু গেঁথে দিল ঘ্যাচ্ করে।

ঘূর্ণি বাতাসের গোঙানি আর এঞ্জিনের বিকট গর্জন ছাপিয়ে উঠল লোকটার গরগরা করার মত বিচিত্র, গোঁ-গোঁ আওয়াজ। কোল্ট ফেলে ছোরার বাঁট মুঠো করে ধরল সে, উইন্ডপাইপ কাটা পড়ায় দম নিতে পারছে না বলে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে দু'চোখ। হাঁ করে দম নেয়ার বৃথা কসরৎ করার ফাঁকে টান মেরে ছোরা বের করে ফেলল, অমনি ফিনকি দিয়ে ছুটল রক্ত। দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠল শার্ট।

গলা চেপে ধরে পাক্ খেয়ে পড়ে গেল দানব, গুঁড়ির মত গড়াতে শুরু করল হোল্ডের এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল পর্যন্ত। ক্ষত থেকে দমকে দমকে রক্ত বেরিয়ে এসে বন্যা বইয়ে দিচ্ছে ফ্লোরে। ওদিকে এঞ্জিনের আওয়াজ আবার বদলে গেছে, চড়া, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। নাক উঁচু করে হারানো অলটিচ্যুড ফিরে পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করছে স্টারলিফটার, উঠছে একটু একটু করে। তার সাথে তাল মিলিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে র‍্যাম্পের দিকে এগোতে শুরু করেছে নিয়ন্ত্রণহীন দানব, পথে রেখে যাচ্ছে রক্তের মোটা ধারা।

এক হাতে কলার ধরে লোকটার পতন ঠেকাতে চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না, ভীষণ ভারী দেহটা পিছলে ছুটে গেল। আরও কয়েক গড়ান দিয়ে লেজের কাছে ডেক যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেখানে গিয়ে থামল, তারপর আরেক গড়ান দিয়ে র‍্যাম্পে নেমে গেল। পতন শুরু হওয়ার আগমুহূর্তে ক্ষণিকের জন্যে ইতস্তত করল যেন। তখনও একই রকম বিচিত্র গর-গর আওয়াজ করে গোঙাচ্ছে লোকটা।

শেষ মাথায় পৌঁছে অনেক কষ্টে উপুড় হলো পিটার, থাবা দিয়ে র‍্যাম্প ধরে ঠেকানোর চেষ্টা করল নিজেকে। লাভ হলো না, সর সর করে ছেঁচড়ে নেমে যাচ্ছে ভারী দেহ, বাইরের এলোমেলো বাতাসে চুল উড়ছে তার প্রবল বেগে। একদম শেষ মুহূর্তে চোখ তুলল সে মেঝেতে খামচি মারতে মারতে, এক সেকেন্ডের জন্যে রানার চোখের ওপর আটকে থাকল ঘোলাটে হয়ে আসা দৃষ্টি। সে চোখে তীব্র ঘৃণা

আর হতাশা দেখতে পেল ও। পরমুহূর্তে হাত দু'দিকে বাড়িয়ে পাখির মত ভেসে পড়ল পিটার। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল মেঘের আড়ালে।

তার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল রোজালিন। চেহারা ফ্যাকাসে। কোনমতে বলল, 'আমি···আমি ওকে খুন করেছি।'

'না,' কাঁধ ধরে মেয়েটিকে নিজের দিকে টেনে আনল রানা। 'আসলে তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কাজটা তুমি না করলে এখন ওর জায়গায় আমাকে ভাসতে হত আকাশে।' নাইফ সুইচটা ঠেলে ওপরে তুলে দিল ও, আবার শুরু হলো গুঞ্জন–উঠে আসতে শুরু করেছে র‍্যাম্প। কাজ সেরে কেবিনে ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে থেমে পড়ল রানা পিছনের ফাঁক দিয়ে একজোড়া ডাসাল্ট সুপার মিরেজের ওপর চোখ পড়তে। দু'দিক থেকে তীরের মাথার মত মিলিত হওয়ার ভঙ্গিতে ছুটে আসছে বিদ্যুৎগতিতে, সোজা স্টারলিফটারের দিকে।

এসে পড়ল চোখের পলকে। দুটোরই নাকের কাছে উজ্জ্বল আলোর ঝলক দেখা গেল, পরক্ষণে বাতাসে কানের তালা ফাটানো বিকট আওয়াজ তুলে হারিয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। প্রায় একইসঙ্গে পর পর কয়েকটা ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেলো আকাশ-দানব। ফিউজিলাজ ছেঁড়ার, বিস্ফোরিত হওয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। পায়ের নিচে ডেক টানা, দীর্ঘ ঢেউয়ের মত নাচতে শুরু করল। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো শূন্যে থেমে পড়েছে বুঝি প্লেন, ঝুলে রয়েছে।

নাকে আগুনের গন্ধ পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পাইডিঙ হ্যাচ খুলে ফেলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে নাকেমুখে ধাক্কা মারল ধোঁয়া। ওর মধ্যেও ছাদে কয়েকটা ফুটো দেখতে পেল দু'জনেই–স্মল ক্যালিবার শেলের কীর্তি। একটা এসে সোজা ঢুকে পড়েছে সাইমুরের কনসোলের মাঝখানে, আগুন ধরে গেছে ওটায়। উদ্বাহু নৃত্য করছে। প্রচণ্ড ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার অবস্থা ভেতরে।

চেঁচিয়ে মেয়েটিকে পিছিয়ে যেতে বলল রানা। মনে পড়েছে, কেবিনের ভেতরে দুটো বড় ফায়ার এক্সটিংগুইশার দেখেছিল ও। পিছনের হ্যাচওয়েের কাছেই দু'দিকে দুই র‍্যাকে রাখা আছে। তার একটা টেনে নামাল, খুব ভারী সিলিন্ডার। ডেস্কের কোণায় বাড়ি মেরে তার অ্যাকটিভেটিং প্লাঞ্জার ভেঙে ফেলল রানা, সশব্দে বের হতে থাকা ফোম ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি আগুন নেভাবার কাজে লেগে পড়ল। দুই এক্সটিংগুইশার পুরো শেষ করার পর নিভল আগুন। ধোঁয়া বের হওয়ার পথ করার জন্যে হ্যাচওয়ে খুলে ধরে থাকল ও কিছুক্ষণ।

এর মধ্যেও টের পেয়েছে, স্টারলিফটার এখন সোজা চলছে, স্বাভাবিক গতিতে। স্বাভাবিক ফ্লাইং প্যাটার্ন অনুসরণ করছে। একটু পর আবার মেঝে কেঁপে উঠল ওটার, বিকট শব্দ উঠল নিচে। ল্যান্ডিঙ গিয়ার নামাচ্ছে, টের পেল ও। আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক সংকেত ওটা–মিরেজগুলোকে বোঝাতে চাইছে আর শেল ছোঁড়ার প্রয়োজন নেই। ভাল হয়ে গেছি।

আরও কিছু সময় পর ভেতরে ঢুকল ওরা। ধোঁয়া খুব সামান্যই আছে তখন, পোড়া গন্ধও কম। সামনে তাকিয়ে সাইমুরকে দেখতে পেল না রানা। তার পড়ে থাকার জায়গাটা খালি। অন্য দু'জন যে যার জায়গাতেই আছে। গেল কোথায় ব্যাটা?

'রানা!' পোর্ট সাইডের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠল রোজালিন। 'দেখে যাও, এদিকে দুটো ফাইটার দেখা যাচ্ছে। আমাদের সাথে সাথে এগোচ্ছে।'

কি ভেবে স্টারসাইডের জানালা দিয়ে উঁকি দিল ও। যা ভেবেছিল, এদিকেও আছে দুটো ডাসাল্ট সুপার মিরেজ। আরও একটা ব্যাপার চোখে পড়ল রানার, ওরা নামছে। অনেকটা জায়গা নিয়ে পাক্ খাচ্ছে স্টারলিফটার, বেশ দ্রুত উঠে আসছে উপকূলরেখা। নিচে ল্যান্ডমার্ক দেখা দিতে ঘুরল ও, প্রথম টেকনিশিয়ানের হোলস্টার থেকে তার স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বের করে নিয়ে সামনের দিকে পা বাড়াল রোজালিনকে অপেক্ষা করতে বলে।

'কোথায় যাচ্ছ?' বলল মেয়েটি।

'তোমার চাচাকে ধরতে। আসছি এখনই।'

কিন্তু ধরা তো দূরের কথা, লোকটার দেখাই পাওয়া গেল না সারা প্লেন তন্নতন্ন করে খুঁজেও। নেই তো নেইই। অথচ পাইলট লোকটা দিব্যি করে বলছে, একটু আগেই ককপিটে গিয়েছিল সে। সন্দেহ হতে তাকে তার লকার চেক করতে বলল রানা, দেখা গেল ঠিকই ধরেছিল ও। এক সেট প্যারাশুট নেই ওখানে। পালিয়ে গেছে উন্মাদ বিজ্ঞানী।

একটু পর পারপিগনান এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল স্টারলিফটার ও চার মিরেজ। আর্মি বোঝাই তিন ট্রুপ ক্যারিয়ার আর দুই জীপ সাদা পোশাকের পুলিস, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ছুটে এল। প্রথম দল নিচে থাকল, অন্যরা উঠে এল ভেতরে। সরগরম হয়ে উঠল স্টারলিফটার। গ্রেফতার করা হলো ক্রুসহ অন্যদের।

একটুপর ব্রীফিঙের সময় এক মিরেজ পাইলট জানাল, সে সম্ভবত একজনকে বেল আউট করতে দেখেছে। শিওর নয় সে, প্রচুর ধোঁয়া বের হচ্ছিল তখন স্টারলিফটারের পিছন দিয়ে। আরেকজন দেখেছে অন্য একজনকে পড়ে যেতে। প্যারাশুট ছিল না তার।

'সাইমুর যদি সত্যিই সাগরে বেল আউট করে থাকে,' মন্তব্য করল এক ফরাসী সিক্রেট সার্ভিস অফিসার। 'তাহলে তার উদ্ধার পাওয়ার কোন চান্স নেই। নির্ঘাত মরেছে।'

কিন্তু রোজালিনের ধারণা অন্যরকম। তার লাশ নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত সে যে মরেছে, মানতে রাজি নয় মেয়েটি।

চোদ্দ

বিকেল চারটা। বিএসএস, লন্ডন। মারভিন লংফেলো ও রাহাত খানের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা।

এতক্ষণ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিচ্ছিল ও মুখে মুখে, লংফেলোর পি.এস নোট করে নিয়েছে শর্টহ্যান্ডে। নিয়ম অনুযায়ী টাইপ করে কম্পিউটরের রেকর্ড ব্যাঙ্কে

তুলে রাখা হবে পরে।

ফ্রান্স থেকে ব্রিটিশ এয়ারফোর্সের বিশেষ প্লেনে চড়ে একটু আগে ফিরেছে রানা ও রোজালিন। এখানে আসার পথে মেয়েটিকে হিলটন হোটেলে তুলে দিয়ে এসেছে ও, কথা দিয়ে এসেছে কাজ সেরেই ফিরে আসবে। রানার বহাল তবিয়তে ফিরে আসায় দুই বৃদ্ধই যে মোটামুটি খুশি, তা বেশ পরিষ্কার। তবু, সাইমুরের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ভুলতে পারছেন না কেউ। পারছে না রানা নিজেও। বারবার একই কথা ভাবছে, শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

এক সময় মনের খেদ প্রকাশ করেই বসলেন রাহাত খান। পাইপে তামাক ভরার ফাঁকে বললেন, 'তবু, লোকটার পালিয়ে যাওয়াটা...' থেমে গেলেন কথা শেষ না করে। রানার মনে হলো বুড়ো হয়তো 'ঠিক হয়নি, বা ধরা দেয়া উচিত ছিল তার' ধরনের কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন।

'বুঝি, স্যার,' রানা বলল। 'কিন্তু...' টেলিফোনের শব্দে থেমে পড়ল। লাল ফোনটা বাজছে।

রিসিভার তুললেন লংফেলো, 'ইয়েস?' বলে নীরবে ওপ্রান্তের কথা শুনতে লাগলেন। ঝাড়া পাঁচ মিনিট শুনে গেলেন। থেকে থেকে এমনভাবে রানার দিকে কয়েকবার তাকালেন, ওর নিশ্চিত ধারণা জন্মাল বিষয়টা ওর অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কিতই হবে। ভুল হয়নি রানার। ঠিকই ধরেছিল। রিসিভার রেখে চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি, রাহাত খানকে একপলক দেখে নিয়ে ওর দিকে ফিরলেন। 'সাইমুর মরেনি, রানা। বেঁচে আছে।'

পাইপ টানা বন্ধ হয়ে গেল মেজর জেনারেলের, কুঁচকে উঠল কাঁচাপাকা ভুরু। রানা সোজা হয়ে বসল। 'সাগর থেকে তাহলে উদ্ধার করা হয়েছে লোকটাকে?'

'ও সাগরে পড়েইনি, রানা।'

'কিন্তু তাহলে...'

'প্যারাশুটে বোঁচকা বেঁধে ফেলে দিয়েছিল হয়তো। ব্যাটা আসলে স্টারলিফটারেই ছিল, ফাঁকিটা কেউ ধরতে পারোনি তোমরা।'

'মানে?'

'ফোন করেছিল আমাদের পারপিগনান এজেন্ট। ও বলল ফ্রেঞ্চ অথরিটি প্লেন তল্লাশী করতে গিয়ে এক কনসোল ডেস্কের নিচে গোপন একটা কুঠুরি খুঁজে পেয়েছে। একজনের লুকিয়ে থাকার জন্যে যথেষ্ট ওটা। তলা দিয়ে বের হওয়ার পথ আছে কুঠুরির, খুঁজতে গিয়ে ওটা খোলা পেয়েছে তারা।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল রানা। 'সাইমুর ক্যাসেলের কি অবস্থা, স্যার?'

'মানে?' প্রশ্ন করলেন লংফেলো।

'ওপেন আছে, না গার্ড দেয়ার-ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'না, ওপেন আছে। কাল একবার ভেবেছিলাম অবশ্য স্পেশাল ব্রাঞ্চ পাঠাব, পরে আর পাঠাইনি। কেন?'

'আমি যাব,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'আজ রাতেই।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্নটা করলেন এবার রাহাত খান।

'স্যার, এতবড় একটা কাণ্ড যে ওই লোকই ঘটিয়েছে, আমরা জানি, কিন্তু তা কোর্টে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। কোথাও কোন প্রমাণ রাখেনি সাইমুর। সে-সব আছে ক্যাসেলে। লোকটার স্টাডিতে, টর্চার চেম্বারে, আর আমার রেকর্ড করা মাইক্রো ক্যাসেটে, যে ক্যাসেটে আরগুয়েলোর সাথে তার আলাপের খানিকটা রেকর্ড করেছি আমি। সাইমুর তা ভালই জানে। কাজেই ওসব ধ্বংস করতে সে আসবেই, খুব সম্ভব গভীর রাতে। ওগুলো নষ্ট করে দিতে পারলে আবার বুক ফুলিয়ে বাইরে বের হবে লোকটা, একটা টোকাও কেউ দিতে পারবে না ওর গায়ে। আমি চাই প্রমাণগুলো উদ্ধার করে আনতে, সম্ভব হলে সাইমুরকেও ধরে নিয়ে আসব।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক,' বললেন লংফেলো। 'কিন্তু…'

'যে ফ্লাইঙ ক্লাব থেকে সেদিন পারপিগনান গিয়েছিলাম, সেখানে অ্যালডান কোম্পানির আরও দুটো কপ্টার দেখেছি। আমার বিশ্বাস কপ্টার নিয়ে আজ রাতেই মারকান্ডি যাবে ও। আমার জন্যেও একটা কপ্টারের ব্যবস্থা করুন। ইনফ্রা-রেড ফিট করা একটা চিপমাঙ্ক হলে ভাল হয়। তা না হলে গ্যাযেল।'

'কিন্তু দুর্গে ঢুকবে কি করে? ওখানে যে বললে সব দরজায় ইলেকট্রনিক তালার কারবার!'

'একটা পথ আছে, স্যার। আমি চিনি। ওটায় সাধারণ তালা।'

খানিক মাথা ঘামালেন বৃদ্ধ। 'তাহলে তো ওভারফ্লাইটের ব্যবস্থাও করতে হয়। যদি সে আসেই, তোমার আগেই পৌঁছল কি না সেদিকে নজর রাখবে ওটা। ল্যান্ড করার আগে খবর জেনে নিতে পারবে তুমি।'

'সে তো আরও ভাল হয়।'

'আমার মতে রানার ধারণাই ঠিক,' বলে উঠলেন রাহাত খান। 'লোকটা আসবে প্রমাণ নষ্ট করতে। ওর যাওয়া উচিত।'

মাথা দুলিয়ে ফোনের দিকে হাত বাড়ালেন বিএসএফ চীফ।

ভোর চারটায় মারকান্ডি পৌঁছল মাসুদ রানাকে নিয়ে গ্যাযেল। সঙ্গে বিএসএসের এক অপারেটর আছে, ল্যারি ডুগান। একে জোর করে সাথে গছিয়ে দিয়েছেন লংফেলো ওর একা আসা উচিত হবে না বলে। আগেও এর সাথে দুয়েকটা কাজ করেছে রানা। এ কাজে একেই বাছাই করা হয়েছে এই জন্যে, যে ক্লীনারকে হিথ্রোয় খুন করেছিল আরগুয়েলো, সে ডুগানের ছোট ভাই। যেখানে স্যাব ডিচে পড়েছিল, তার কাছে ল্যান্ড করল কপ্টার। জায়গাটা ঢালু, ক্যাসেল থেকে দেখা যায় না। অবশ্য দেখার মত কেউ ওখানে আছে বলেও মনে হয় না রানার। তবু, সতর্ক থাকল।

ল্যান্ড করার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ওভারফ্লাইটের সাথে কথা বলেছে গ্যাযেলের পাইলট। ওটা ছিল একটা চিপমাঙ্ক। 'অল ক্লিয়ার' জানিয়েছে ওটা গ্যাযেলকে। মাঝ রাত থেকে ক্যাসেলের ওপর লটকে আছে ওটা, এরমধ্যে কোন গাড়ি বা কপ্টার ক্যাসেলের ধারেকাছেও ঘেঁষেনি। তল্পিতল্পা নিয়ে নিশ্চিন্তে ক্যাসেলের দিকে হাঁটা ধরল রানা ও ডুগান। ভোরের বাতাস পরিষ্কার, ঠাণ্ডা।

আড়াআড়ি চলেছে ওরা গ্রাম এড়িয়ে, মাঝেমধ্যে পেন্সিল টর্চের আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে পথ।

পুরো আধঘণ্টা লাগল ওদের দুর্গের কাছে পৌঁছতে। হুকওয়ালা দড়ির লাইনের সাহায্যে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়তে কোন সমস্যা হলো না। সামনের বিশাল লনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল ওরা ভাল করে। গায়ের মধ্যে ছমছম করে উঠল রানার দুর্গের প্রকাণ্ড, অন্ধকার কাঠামোটা দেখে। কোথাও প্রাণের বিন্দুমাত্র সাড়া নেই। ভেতরের হলরুম, ড্রইংরুম, ইস্ট গেস্ট রুম, স্টাডি, টর্চার চেম্বার, সব এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠল রানার।

ট্রেডমেনস এন্ট্রান্সটা খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না। এই দরজা চেনে রানা, কারণ এ পথেই সেদিন ওকে বের করে এনেছিল পিটার, ভ্যানে তুলেছিল। সঙ্গে আনা বড় এক গোছা চাবি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। নিতান্তই সাধারণ তালা, তার ওপর বহু ব্যবহারে নড়বড়ে অবস্থা, মাত্র দু'মিনিটের চেষ্টাতেই খুলে গেল। চাবিটা রিঙ থেকে খুলে ফেলল ও। ভেতরে ঢুকে পড়ল। মাত্র কয়েকদিন হলো লোকজন নেই বাড়িতে, অথচ এরইমধ্যে ভেতরের বাতাসে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ চেপে বসেছে।

এগোতে শুরু করল রানা ও ডুগান। কথা আছে প্রথমে অপারেশন মেল্টডাউনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখবে ওরা। পেয়ে গেলে ভাল, না পেলে রজার সাইমুরের পৌঁছার আশায় ঘাপটি মেরে থাকবে। এলে তার ঘাড় ধরে আদায় করবে সে সব। বাইরে এতক্ষণে নিশ্চই আলো ফুটতে শুরু করেছে, ভাবল রানা। লোকটা কি আসবে? যদি আসে, হয় এখনই আসবে, নয়তো কাল রাতে। দিনে আসার প্রশ্নই আসে না।

হাঁটার মধ্যে হঠাৎ ওর বাহু চেপে ধরল ল্যারি ডুগান। কথা বলতে নিষেধ করল আঙুল তুলে। 'একটা শব্দ!' বলল ফিসফিস করে।

কান পাতল রানা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, কোথায় কি! লোকটা ভুল শুনেছে ভেবে এগোবার জন্যে পা তুলেছিল ও, থেমে পড়ল চট্ করে। হ্যাঁ, আওয়াজ আসছে একটা, অনেক দূর থেকে, ভোমরার গুঞ্জনের মত।

'সাইমুর!' বলে উঠল ও। 'হারামজাদা এসেছে তাহলে!' ভেবে দেখল, তার আসাটা অসময়ে হয়ে গেছে। এতক্ষণে আলো নিশ্চই ফুটেছে, চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে লোকটার। কাজেই বেশিক্ষণ থাকবে না, প্রমাণপত্র যা যা নেয়ার, নিয়ে এখনই আবার ভেগে যাবে।

ভালই হলো। ওদের আর কষ্ট করে কোথায় কি আছে খোঁজার দরকার হবে না। সে-ই এসে সব এক জায়গায় করুক, তারপর রয়ে-সয়ে ধরা যাবে ব্যাটাকে।

'হলের দিকে চলো,' বলে হাঁটা ধরল ও। ততক্ষণে অনেক কাছে এসে পড়েছে গুঞ্জন। হলরুমের এক অন্ধকার কোণে এসে দাঁড়াল দু'জনে, আওয়াজ শুনছে কান পেতে। একটু পর মনে হলো নেমেছে কপ্টার। মন দিয়ে ওটার রোটর ব্লেডের আওয়াজ শুনতে লাগল রানা। যদি পাইলট এঞ্জিন অফ না করে, তাহলে বোঝা যাবে ওর অনুমানই ঠিক, এখনই পালাবে। আর যদি উল্টোটা হয়...

চাপা একটা ক্লিক শব্দ উঠল, ওরা যেটা দিয়ে ঢুকেছে, সেই দরজার তালা খোলার। ভেতরে ঢুকছে সাইমুর। বন্ধ হলো না আর তালা, দরজা ভিড়িয়ে রেখেই এগিয়ে আসতে শুরু করল সে। ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও বেশ দ্রুত পায়ে হাঁটছে। স্বাভাবিক। এটা তারই বাড়ি, সে জানে কোন পথ দিয়ে কোনদিকে যেতে হয়। ছোট ছোট, দ্রুত পদক্ষেপের আওয়াজ শুনল রানা মন দিয়ে। ওদিকে তখনও অফ হয়নি কপ্টারের এঞ্জিন।

স্টাডির দিকে চলে গেল সাইমুর ওদের কয়েক হাত সামনে দিয়ে। ডুগানের কাঁধে টোকা দিয়ে ফিরতি পথ ধরল রানা। নিঃশব্দে পা চালিয়ে বেরিয়ে এল খোলা দরজা দিয়ে। দেয়ালে পিঠ দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকল অস্ত্র বাগিয়ে। কপ্টারের আওয়াজ একদম কাছেই শুনতে পাচ্ছে ওরা, কিন্তু কয়েকটা গাছের জন্যে দেখা যাচ্ছে না ওটাকে।

বড়জোর সাত কি আট মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তাতেই মনে হলো যেন কয়েক যুগ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা এক জায়গায়। ভেতর থেকে পাথরের মেঝেতে খুব দ্রুত ছুটে আসার আওয়াজ উঠল হঠাৎ করে। আসছে বিজ্ঞানী। একটু পর দড়াম করে খুলে গেল দরজা, বেরিয়েই দৌড় শুরু করল লোকটা। বাঁ হাতে একটা ফোল্ডার দেখা যাচ্ছে তার, অন্য হাতে লম্বাটে কি যেন একটা, বোঝা গেল না।

মৃত টেকনিশিয়ানের পিস্তলটা তুলল মাসুদ রানা, ডুগানও তুলল নিজেরটা। ওদের ছাড়িয়ে আট-দশ পা এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানী, এই সময় পিছন থেকে হাঁক ছাড়ল রানা, 'থামো, সাইমুর! তোমার খেলা শেষ।'

থামল না লোকটা, কেবল গতি সামান্য কমাল, ওরইমধ্যে ডান হাতে ধরা লম্বাটে জিনিসটাকে ওপরে তুলল সে। রানার গলার স্বর লক্ষ্য করে ট্রিগার টেনে দিল। গুলি ফুটল, পরক্ষণে একটা তীব্র হিশ্‌শ্ আওয়াজের সাথে উলকার মত পিছনে আগুনের লেজ রেখে কি যেন একটা ছুটে এসে বিকট শব্দে আছড়ে পড়ল রানা ও ডুগানের মাঝের দরজার ওপর। দেয়াল কেঁপে উঠল দুর্গের, দরজাসহ পাথরের দেয়ালের বেশ বড় একটা অংশ চুরমার হয়ে সেঁধিয়ে গেল ভেতরে।

মুহূর্তে রানা বুঝে ফেলল জিনিসটা কি। ওটা এম.বি.এ. জাইরোজেট রকেট পিস্তল–হ্যান্ড লঞ্চার। জিনিসটা সেদিন দেখেছে রানা বিজ্ঞানীর মাটির নিচের অফিসের দেয়ালে। এক সাথে পাঁচটা খুদে রকেট ছুঁড়তে পারে ওটা। আরেকবার হাঁক দেবে কি না ভাবল ও, পরক্ষণে সে চিন্তা বাতিল করে পিস্তল তুলল। ওর দেখাদেখি ডুগানও, লোকটা ততক্ষণে বেশ এগিয়ে গেছে। আর কয়েক পা যেতে পারলেই গাছের আড়ালে চলে যাবে।

গুলি করল রানা। ওর এবং ডুগানের গুলি এক মুহূর্তেরও অল্প সময়ের ব্যবধানে আঘাত করল সাইমুরকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, পরক্ষণে উঠে পড়ল হাঁচড়েপাঁচড়ে। ফোল্ডারটা বুকের সাথে চেপে ধরে এলোমেলো পায়ে ছোটার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, দু'তিন পা গিয়েই বসে পড়ল। আস্তে করে শুয়ে পড়ল কাত হয়ে।

দৌড় দিল রানা। ওকে দেখে দুর্বোধ্য গলায় কি যেন বলতে বলতে আবার

উঠে পড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করল সাইমুর, তারপর আচমকা শিথিল দেহে এলিয়ে পড়ল। হাত থেকে ছুটে গেছে ফোল্ডার, রক্তে একাকার। ওটা সরিয়ে রেখে লোকটার ক্ষত দুটো পরীক্ষা করল রানা, এক মুহূর্ত পর চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাথা নাড়ল। গুলি একটা লেগেছে ঘাড়ে, অন্যটা ডান পিঠ দিয়ে ঢুকে খুব সম্ভব লাংস ফুটো করে ঢুকে গেছে। ঠোঁটের কোনায় রক্তের বুদ্বুদ দেখা যাচ্ছে তার।

অল্প সময়ের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল বোধহয় বিজ্ঞানী, হঠাৎ এক ঝাঁকি খেয়ে চোখ মেলল। হাত বাড়িয়ে কিছু খুঁজল যেন মাটিতে। পরক্ষণে খোলা, মৃত্যুর পরশ লাগা চোখের ভেতরের সুপ্ত লাভা একবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

চুপ করে কিছুক্ষণ মৃত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে দুর্গের দিকে তাকাল।

ভোরের প্রথম আলোর স্পর্শে একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে বিশাল কাঠামোটা। তিনশো বছরের পুরানো দুর্গ-সাইমুর ক্যাসেল। অভিজাত লেয়ার্ড অভ মারকান্ডির ক্যাসেল।

* * *

কুহেলি রাত

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

এক

বন্দর নগরী ম্যাকাও।

হারবারের পাশে পর্তুগীজ গির্জায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। রাত দুটো।

বন্দর সংলগ্ন ক্যাসিনো পাড়ায় উপচে পড়েছে লোকজন। রাস্তায় রাস্তায় ঝকঝকে দামী গাড়ির প্রদর্শনী শুরু হয়েছে যেন। আলোকসজ্জায় টোকিও আর লাস ভেগাসের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, তেমন নাম শোনা না গেলেও প্রতিযোগিতায় ম্যাকাও-ও খুব একটা পিছিয়ে নেই। পকেটে মাস্টারকার্ড, প্রয়োজনে পাঁচ কোটি টাকা ক্যাশ করতে পারবে; জেমস হার্ডির সেভেন স্টার ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। দক্ষিণ চীন সাগরের তাজা ও ঠাণ্ডা বাতাস প্রাণ জুড়িয়ে দিল, কালো লেদার জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম খুলে চারদিকে চোখ বুলাল ও।

রানা ম্যাকাওয়ে এসেছে হেরোইন কেনার জন্যে।

সেভেন স্টার ক্যাসিনো সাততলা বিল্ডিং; এক পাশে পার্কিং লট, আরেক পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। পার্কিং লটে মার্সিডিজ, পাজেরোই বেশি, রোলসরয়েসও আছে। চওড়া রাস্তা, দু'পাশের প্রতিটি বহুতল দালান রংবেরঙের নিওন সাইনে প্রায় মোড়া। এটা চিয়াং ফুয়া চিয়াং অ্যাভিনিউ; ক্যাসিনো, নাইটক্লাব, রেস্তোরাঁ, বার, বিউটি পার্লার, হোটেল-মোটেল, ম্যাসাজ পার্লার ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিওন সাইনগুলো ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে–টপলেস শো, টপ অ্যান্ড বটমলেস ন্যুডিস্ট ক্লাব, সেক্স বাজার, ক্যাসিনো-প্লাস-সেক্স শপ, লাইভ সেক্স; সেক্স অল দা ওয়ে। চিয়াং ফুয়া চিয়াং অ্যাভিনিউয়ে সেক্স সবচেয়ে বেশি বিকোয়, আর বিকোয় দুনিয়ার সবচেয়ে দামী মদ। পকেটে টাকা থাকলে ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারে যে-কেউ, এক রাত জুয়া খেলে কোটিপতি বা ভিখারি বনে যাওয়া নিত্য দিনের ঘটনা এখানে।

একটা বাঁক ঘুরে ফুটপাথ ধরে অলস পায়ে হাঁটছে রানা, রেন্ট-আ-কার থেকে নেয়া মার্সিডিজটা এক মাইল দূরে রেখে এসেছে। এদিকের রাস্তায় পথিক প্রায় নেই বললেই চলে, তবে দামী গাড়ি আর ট্যাক্সির ছুটোছুটি বন্ধ হয়নি। দুশো গজ সামনে আরও একটা চৌরাস্তা, ছ'জন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, পরনে সদ্য ভাঁজ ভাঙা সবুজ ইউনিফর্ম। প্রত্যেকের কোমরে হোলস্টার, ভেতরে ভারী পিস্তল। এরা গ্রীন ব্রিগেড-এর সদস্য। গ্রীন ব্রিগেড বেসরকারী পুলিস। সবাই তারা চীনা, এবং অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী। ট্যুরিস্টদের নিরাপত্তার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখে ওরা। দেখতে পেলেই ছুটে আসে, হাসিমুখে জানতে চায় কোন সাহায্য দরকার কিনা।

ম্যাকাও-এর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছিল। পর্তুগীজ গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন পাঁচ বছরের জন্যে নির্বাচিত হয়েই আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডেকে বন্দর নগরীকে অপরাধ-মুক্ত রাখার সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন বেসরকারী পুলিসের হাতে। আর মাত্র পাঁচ বছর পরই ম্যাকাও ফেরত পাবে চীন, মাঝখানের এই সময়টায় সৎ ও আদর্শ প্রশাসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি, ম্যাকাওয়ের ইতিহাসে তাঁর নাম যাতে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

অবশ্য দুর্মুখেরা বলে, বেসরকারী পুলিস আসায় লাভ হয়েছে কচু। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আগে সিন্ডিকেটের সংখ্যা ছিল এক ডজন, এখন ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড একাই রাজত্ব করছে। শোনা যায় গ্রীন ব্রিগেড আর ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের শক্তি নাকি সমান সমান। গ্রীন ব্রিগেড-এর ডিরেক্টর কর্নেল ম্যাট হিথ, আইরিশ-আমেরিকান, সাবেক সিআইএ অফিসার। হিথ ঘোষণা দিয়েছেন, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের মাথা রেড ড্রাগন কোথায় আছে জানতে পারলে তিনি নিজে তাকে ধরতে যাবেন। আর ওদিক থেকে রেড ড্রাগন দম্ভভরে জানিয়ে দিয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া গ্রীন ব্রিগেডের কম্মো নয়, কারণ সে নাকি একটা মরীচিকা।

রানাকে দেখে ঠিকই ছুটে এল দু'জন অফিসার। একজন সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'স্যারের কি ট্যাক্সি দরকার?' সে থামতে না থামতে আরেকজন জানতে চাইল, 'স্যার কি পথ হারিয়ে ফেলেছেন? ঠিকানা বলুন, প্লীজ, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিই।'

'ধন্যবাদ, ওদিকে আমার গাড়ি আছে,' বলে নিজের পথে এগোল রানা।

তিন মিনিট পর সামনে একটা বাঁক পড়ল, সেখানেও দু'জন পুলিসকে দেখা গেল, এক মাতালকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছে। বাঁক ঘুরে দুশো গজ গেলেই পড়বে পার্কিং লট, সেখান থেকে মার্সিডিজ নিয়ে নিজের হোটেলে ফিরবে রানা। কিন্তু বাঁকটা ঘোরার আগেই তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের চিৎকার শুনে চমকে উঠল ও। চীনা নয়, পরিষ্কার ইংরেজিতে চিৎকার করে বলছে, 'কে আছ, আমাকে সাহায্য করো, প্লীজ! ওহ্ গড! ওরা আমাকে মেরে ফেলছে!'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। মাতাল তরুণকে তার নিসান পেট্রলে তুলে দিতে ব্যস্ত গ্রীন ব্রিগেডের দুই সদস্য। রানার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ কি ছয় গজ দূরে ওরা, মেয়েটার চিৎকার শুনতে না পাবার কথা নয়। অথচ কোন প্রতিক্রিয়া নেই। 'এদিকে আসুন, প্লীজ। শুনতে পাচ্ছেন না, একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে?'

পুলিস দু'জন ওর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্ত-হীনতায় ভুগল রানা, তারপর ছুটে বাঁকটার মুখে চলে এল। পঁচিশ গজ দূরে, নির্জন রাস্তায়, পাঁচ-ছয়জন চীনা তরুণের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে একটা মেয়ে। ফুটপাথ ঘেঁষে একটা টয়োটা দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটাকে টেনে-হিঁচড়ে সেদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলছে। ছুটে যাবার ইচ্ছেটাকে অনেক কষ্টে দমন করল রানা। কাছাকাছি পুলিস থাকা সত্ত্বেও একটা মেয়েকে অপদস্থ করার চেষ্টা করছে, তারমানে নিশ্চয়ই ছোকরাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে রুখে

দাঁড়াতে হলে আগ্নেয়াস্ত্র দরকার, কিন্তু ওর সঙ্গে তা নেই।

মেয়েটা নিজেকে ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। নির্জন রাস্তায় হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে তার শক্তি যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। মরিয়া হয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'প্লীজ, আমাকে বাঁচান! পুলিস ডাকুন...'

এত রেগে গেল রানা, গলা থেকে যেন বাঘের হুঙ্কার বেরিয়ে এল। 'এই যে! এদিকে তাকান!' একজন পুলিস এরইমধ্যে নিসানের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসেছে। তরুণ মাতালকেও তুলে দেয়া হয়েছে ব্যাকসীটে, তার পিছু নিয়ে দ্বিতীয় পুলিস ভেতরে ঢুকছে। 'একটা মেয়ে বিপদে পড়েছে, অথচ আপনারা ভান করছেন কিছুই ঘটছে না! গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে আমি অভিযোগ করব, আপনারা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করছেন!'

দ্বিতীয় পুলিস নিসানে না উঠে রানার দিকে এগিয়ে এল। 'স্যার, আপনি দেখছেন না, আমরা একটা কাজে ব্যস্ত রয়েছি? তাছাড়া, ওরা ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের লোকজন, আশপাশে ওদের আরও লোক আছে। আমরা মাত্র দু'জন, ওদের বিরুদ্ধে কি করতে পারব, বলুন? তারচেয়ে আপনিও সরে পড়ুন, শুধু শুধু কেন বিপদে জড়াবেন...'

ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটাকে দেখছে রানা, এখনও হার মানেনি সে। পাঁচ গুণ্ডার একজন মোবাইল ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। ঘাড় সোজা করে পুলিসকে কিছু বলতে যাবে রানা, চোখ পড়ল নিসানের ভেতর। ড্রাইভিং সীটে বসা প্রথম পুলিসের কানেও একটা মোবাইল। 'আমাকে আপনারা দু'জন সাহায্য করুন, আসুন অন্তত চেষ্টা করে দেখি কিছু করা যায় কিনা...'

রানার কথা শেষ হলো না, মাথা নেড়ে দ্বিতীয় পুলিস বলল, 'দুঃখিত, স্যার। আপনি হয়তো জানেন না, আমাদের এলাকা ভাগ করা আছে। আমাদের ডিউটি এই মোড় পর্যন্ত।'

রানা বুঝতে পারল, গ্রীন ব্রিগেড কোন সাহায্যে আসবে না। ইতিমধ্যে চার গুণ্ডা কাবু করে ফেলেছে মেয়েটিকে, চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলেছে শূন্যে। অপর লোকটা এখনও কথা বলছে মোবাইলে। ও যদি এখনও দেরি করে, মেয়েটিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। 'থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন,' বিড়বিড় করল ও, তারপর কিডন্যাপার তরুণদের লক্ষ্য করে ছুটল। 'এই! নামাও ওকে! ছেড়ে দাও!'

চারজন গুণ্ডা মেয়েটাকে নিয়ে টয়োটার দিকে এগোচ্ছে, মোবাইল কোমরে আটকে অপর লোকটা রানার দিকে ফিরল।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার–খুন নয়, মেয়েটাকে কিডন্যাপ করতে চাইছে ওরা।

রানা হঠাৎ এমন ভঙ্গিতে থমকে দাঁড়াল যেন নিজের বোকামি বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে। টয়োটা এখন মাত্র দশ গজ দূরে, মেয়েটিকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা চলছে। 'মরতে চাও নাকি?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল চীনা তরুণ, মোবাইলের পাশ থেকে ছুরি বের করল সে, বেল্টের সঙ্গে ছোট্ট খাপের ভেতর ছিল। 'এটা দেখছ? নাড়িভুঁড়ি সব বের করে দেব। যাও, ভাগো। ভাগো বলছি!' ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে দু'পা সামনে এগোল, বাতাসে ছুরি চালাল দ্রুত।

আবার সামনে এগোচ্ছে রানা, চেহারায় বোকাসোকা ভাব, আচরণে কাতর মিনতি। 'দাও না, ভাই, ছেড়ে দাও না ওকে! একা একটা বিদেশী মেয়ে, ও তো আর তোমাদের কোন ক্ষতি করেনি, তাই না? মেয়ে দরকার, এই তো? জোরজার না করে টাকা দিলেই তো পেতে পারো। কিছু টাকা আমিই না হয় দিচ্ছি…'

'এই, তোরা শুনছিস! একটা ধুর ফেঁসেছে। বলছে টাকা দেবে…'

মেয়েটাকে টয়োটায় প্রায় তুলেই ফেলেছে ওরা। হাতে সময় নেই, যে-কোন মুহূর্তে এক কি দু'জন নেমে আসবে সঙ্গীর সাহায্যে। করজোড়ে, ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে এগোচ্ছে রানা। 'অল্প কিছু টাকা আছে আমার কাছে…'

'দাও, বের করো,' ছোরা বাগিয়ে ধরে চীনা তরুণও এগোচ্ছে, ঠোঁটে সতর্ক হাসি।

ট্রাউজারের দুই পকেটে হাত ভরে কি যেন খুঁজছে রানা। হাত দুটো বেরিয়ে এল দুই পকেটের সব কিছু নিয়ে–সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, মানিব্যাগ, রুমাল, চাবির রিঙ ইত্যাদি। সব একসঙ্গে বাড়িয়ে ধরল। 'নাও, ভাই, সব নাও, তবে তার আগে তোমার লোকদের বলো মেয়েটাকে ছেড়ে দিক…'

চীনা গুণ্ডা হেসে উঠতে যাবে, একহাতের সব জিনিস তার মুখে ছুঁড়ে দিল রানা। শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাবার পর ওকে আর কে থামায়! রুমালে মুখ ঢাকা পড়ায় কিভাবে কি ঘটল দেখারও সুযোগ পেল না চীনা বদমাশ। তার হাতটা ধরে প্রথমে একটা মোচড় দিল রানা, ছুরিটা আঙুল থেকে খসে পড়তে নিজের ভাঁজ করা হাঁটু উঁচু করে সেটার ওপর মোচড়ানো হাতের কনুই ঠেকাল, তারপর বাহু আর কব্জির ওপর দু'দিক থেকে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলল মাঝখানের হাড়। ছোকরার আর্তচিৎকার ভোঁতা শোনাল, কারণ রুমালটা তার হাঁ করা মুখে ঢুকে গেছে।

রাস্তার ওপর পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে, টয়োটা থেকে বেরিয়ে এল তার এক সঙ্গী। গাড়ি থেকে নিচে নেমে দরজা বন্ধ করতে যাবে, পারল না। বাইরে বেরিয়ে এসেছে একটা পা। হলুদ মাখনের মত রঙ, হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত, এরকম সুগঠিত ও লম্বা পা খুব কমই দেখেছে রানা।

দরজা বন্ধ করতে না পেরে রানার দিকে ফিরল প্রতিপক্ষ। হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে, সরাসরি রানার মাথার দিকে তাক করল। 'হ্যান্ডস আপ!' নাকি সুরে নির্দেশ দিল তরুণ।

পিস্তলের মুখে অভিনয় বা চালাকি কোন কাজে আসবে না। ধীরে ধীরে হাত দুটো মাথার ওপর তুলল রানা। তবে ও যা দেখতে পাচ্ছে, তরুণ তা দেখতে পাচ্ছে না। টয়োটা থেকে বেরিয়ে আসা সুগঠিত ও শক্তিশালী পায়ে সোনালি এক পাটি জুতো, সেই জুতো দিয়ে তরুণের নিতম্বে লাথি মারল মেয়েটা। হোঁচট খেয়ে রানার দিকে এক পা এগোল ছোকরা। পিস্তল ধরা হাতটাকে পাশ কাটিয়ে তাকে আলিঙ্গন করল রানা। অজগর যেমন শিকারকে পিষে মারে, ঠিক তাই করছে ও, তবে সেই সঙ্গে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো মারল ছোকরার উরুসন্ধিতে। পিষে মারার আর প্রয়োজন হলো না, জ্ঞান হারিয়ে ওর

আলিঙ্গনের ভেতর নেতিয়ে পড়ল দ্বিতীয় চীনা। ছেড়ে দিতেই পড়ে গেল সে। পিস্তলটা আগেই হাত থেকে খসে ছিটকে রাস্তার পাশে নর্দমায় ডুবে গেছে।

পরনে ছাইরঙা মোটা কাপড়ের স্কার্ট, গায়ে একই কাপড়ের কোট, টয়োটা থেকে শরীরটা প্রায় বের করে এনেছে মেয়েটা। ধস্তাধস্তি চলছে, ঝাঁকি খাচ্ছে গাড়ি। এই সময় স্টার্ট দিল ড্রাইভার, চিৎকার করে মেয়েটাকে গাড়ির ভেতর টেনে নেয়ার তাগাদা দিচ্ছে সঙ্গীদের।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে দুই পুলিস, নিরাপদ দূরত্ব থেকে যেন তামাশা দেখছে।

গাড়ি থেকে পুরোপুরি বেরুতে পারছে না মেয়েটা, দু'জন তরুণ টেনে ধরে রেখেছে। তাকে পাশ কাটাল রানা। কি ঘটছে দেখার জন্যে জানালা দিয়ে মুখ বের করল ড্রাইভার, পরমুহূর্তে নাকের ওপর প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে পাশের খালি সীটে কাত হলো। জানালার ভেতর হাত গলিয়ে ইগনিশন কী ঘুরিয়ে স্টার্ট বন্ধ করল রানা, হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল ড্রাইভারের পাশের দরজা। তাকে খালি সীটে সরাবার জন্যে কয়েকটা লাথি মারতে হলো। পাঁজরের হাড় ভাঙার আওয়াজ শুনে নিশ্চিত হলো, তার তরফ থেকে আপাতত কোন বিপদ আসবে না।

ড্রাইভারের সীটে উল্টো হয়ে বসল রানা, সীটে হাঁটু গেড়ে। ব্যাকসীটে একজন রয়েছে, আরেকজন সীটের নিচে বসা, দু'জনেই টেনে-হিঁচড়ে মেয়েটাকে গাড়ির ভেতর ফিরিয়ে আনতে গলদঘর্ম হচ্ছে। বিপদ দেখে মেয়েটাকে ছেড়ে দিল ওরা, চোখের পলকে একজনের হাতে বেরিয়ে এল একটা ছুরি, আরেকজন দু'হাত বাড়িয়ে খামচে ধরতে চেষ্টা করল রানার চুল।

'পালাও! ছোটো!' আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রানা, তারই মধ্যে চিৎকার করছে।

হঠাৎ মুক্তি পেয়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছে মেয়েটা। হয় অবশ হয়ে গেছে শরীর, কিংবা সাহায্যকারীকে বিপদে ফেলে নড়তে চাইছে না।

ব্যাকসীটে বসা লোকটার হাতে ছুরি, কিন্তু সঙ্গী টয়োটার মেঝে থেকে তার সামনে সিধে হওয়ায় সেটা সে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে না। রানা বলতে গেলে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করল। চুল ধরার জন্যে হাত বাড়িয়েছে, সীটে শুয়ে পড়ে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ ছিল। তা না করে লোকটার দিকে ঝুঁকল ও, বুকে বুক ঠেকাল, লোকটার কাঁধের ওপর চিবুক রাখল, যেন নিজের মুখটাকে ছুরির সহজ টার্গেট বানিয়ে পরিবেশন করছে। সুযোগটা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করল ব্যাকসীটে বসা কিডন্যাপার। সরাসরি রানার চোখ লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল ছুরিটা।

সময়ের চুলচেরা হিসাব, একটু এদিক-ওদিক হলে প্রাণ ছিনিয়ে নেবে খুনী। বুকে জড়িয়ে ধরা লোকটাকে ঝট করে ওপরে তুলল রানা, সরে গেল মুখটা। রানার আলিঙ্গনের ভেতর ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল ছোকরার শিরদাঁড়া, হাঁ করা মুখ থেকে হড়হড় করে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না ছুরির ফলা সরাসরি হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে দিয়েছে।

এক পলকের বিরতি পেয়ে বাইরে তাকাল রানা। মেয়েটা এতক্ষণে ছুটছে।

'ওদিকে নয়!' কর্কশ গলায় সাবধান করে দিল ও। 'উল্টোদিকে!' পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আবার।

সঙ্গীকে ছুরি মেরে বোকা হয়ে গেছে লোকটা। হাতল ছেড়ে দিলেও, বিস্ফারিত চোখে সেটার দিকেই তাকিয়ে আছে। তার চেহারা দেখে মনের অবস্থা বুঝতে পারল রানা। 'বন্ধুকে যদি বাঁচাতে চাও, একটানে বের করো ওটা,' বলল ও, যেন সৎ পরামর্শ দিচ্ছে। 'তারপর তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে যাও।'

'হসপিটালে...হ্যাঁ...' ছুরির হাতলটা ধরল সে।

উঁকি দিয়ে তার কাজ দেখছে রানা। ধীরেসুস্থে লোকটার চুল ধরে টান দিল, সীটের পিঠে তুলে আনল অর্ধেক শরীর। প্রতিরোধ শক্তি নেই বললেই চলে, নেতিয়ে আছে শয়তানটা। তার ঘাড়ের ওপর পরপর দুটো জুডো চপ্ মারল রানা। জ্ঞান হারিয়েছে কিনা পরীক্ষা করার গরজ অনুভব করল না, টয়োটা থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দু'দিকে তাকাল।

গাড়ি থেকে ওকে বেরুতে দেখে পুলিস দু'জন পিছন ফিরে দাঁড়াল। ভাবটা যেন, তারা কিছু দেখেনি, দেখতেও চায় না। রাস্তার আরেক দিকে, বিশ-পঁচিশ গজ দূরে, দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটা। রানাকে দেখে পা বাড়াল, তবে রানা হাত নাড়ছে দেখে স্থির হয়ে গেল। ছুটে তার কাছে চলে এলো রানা। 'তুমি বোকা নাকি? এখনও দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে? যাও, পালাও!'

'পালা... কোথায় পালাব?'

এতক্ষণে লক্ষ কলল রানা, মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে। 'কোথায় পালাবে...ঠিক আছে, এসো আমার সঙ্গে,' বলে তার একটা হাত ধরে ছুটল রানা। ছুটতে ছুটতেই ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকাল। পুলিস দু'জনও ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। একজন মোবাইল ফোনে কথা বলছে কারও সঙ্গে।

দেড়শো গজ সামনে পার্কিং লট। দরজার তালা খুলে মার্সিডিজে মেয়েটাকে তুলল রানা, তারপর ঘুরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসল। 'কোথায় যাবে বলো, পৌঁছে দিই।' গাড়ি স্টার্ট দেয়ার আগে ড্যাশ-বোর্ডের গোপন একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে রিভলভারটা বের করে কোলের ওপর রাখল।

'চার্লটন স্ট্রীট,' বিড়বিড় করল মেয়েটা, তাকিয়ে আছে রানার কোলের ওপর পড়ে থাকা অস্ত্রটার দিকে। 'হোটেল মেপল ইন।'

নির্জন পথ ধরে মার্সিডিজ ছুটছে, এতক্ষণে মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। মেয়েটার রূপ গাড়ির ভেতরটাকে আলোকিত করে রেখেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। মুখের ত্বক পাকা ডালিম, যেন টোকা দিলেই ফেটে রক্ত গড়াবে। লিপস্টিক ছাড়াই টকটকে লাল হয়ে আছে সরু ঠোঁট জোড়া। চোখ দুটো বিশাল, যেন পাশাপাশি একজোড়া পদ্ম ফুটে আছে; দৃষ্টিতে সন্ত্রস্ত একটা ভাব থাকলেও বুদ্ধির দীপ্তি ম্লান হয়নি এতটুকু। নাক, ভুরু, কপাল সবই নিখুঁত; রূপ-সৌন্দর্যের সঙ্গে চেহারায় ফুটে আছে পরিশীলিত আভিজাত্য–বিশদ ইতিহাস জানার প্রয়োজন হয় না, একবার তাকালেই সমীহ করতে ইচ্ছে করে। স্কার্ট ও কোট ভরাট স্বাস্থ্যের সঙ্গে চমৎকার ফিট করেছে, নিশ্চয়ই নামকরা কোন

টেইলারিং শপ থেকে বানানো।
চার্লটন স্ট্রীট পশ এলাকা। মেপল ইন ফাইভ স্টার হোটেল। রানার কৌতূহল হচ্ছে। এত রাতে, হোটেল থেকে কয়েক মাইল দূরে, একা কি করছিল মেয়েটা? ট্যুরিস্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই চীনা নয়। ভিয়েৎনামী? থাই? নাহ্! তাহলে? 'কি ঘটেছিল?' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভেঙে জিজ্ঞেস করল ও। 'ওখানে এত রাতে একা তুমি কি করছিলে?' কত বয়েস হবে? বাইশ? খুব বেশি হলে পঁচিশ।
উত্তরে ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার পিছন দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর স্কার্ট টেনেটুনে সুগঠিত হাঁটু দুটো আরও একটু ঢাকল। প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'পুলিস ছিল, অথচ ওরা এল না কেন!' ঠিক জিজ্ঞাসা নয়, যেন স্বগতোক্তি করল।
'কি করে বলি। তোমার নাম কি?'
'লিমা গুনো।' রানার দিকে তাকাচ্ছে না।
'ভিয়েৎনামী?'
মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'না, কম্বোডিয়ান।'
লিমা আর কিছু বলছে না। 'ট্যুরিস্ট?' আবার প্রশ্ন করল রানা।
'ট্যুরিস্টই বলতে পারেন, তবে ম্যাকাওয়ে একটা কাজে এসেছিলাম।'
'একা?'
কথা না বলে মাথা নাড়ল লিমা। আড়চোখে আরেকবার অস্ত্রটার দিকে তাকাল।
খানিক পর খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। 'বোঝা যাচ্ছে, নিজের সম্পর্কে বেশি কিছু বলতে চাইছ না।' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও।
'আপনি শুধু আমার প্রাণ বাঁচাননি,' এতক্ষণে সরাসরি রানার দিকে তাকাল লিমা, 'আরও অনেক বড় উপকার করেছেন। আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না, প্লীজ। তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন, নিজের সম্পর্কে সত্যিই বেশি কিছু বলতে চাই না আমি। কেন, আপনার এই প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারব না। সত্যি আমি দুঃখিত।'
রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে নিজেকে মৃদু তিরস্কার করল রানা। মেয়েটা ওকে বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে এক বিপদ থেকে আরেক বিপদে পড়ল কিনা। দায়ী রিভলভারটা।
অনেকক্ষণ কোন কথা হলো না। কয়েকবার বাঁক নিল মার্সিডিজ। প্রতিটি মোড়ে গ্রীন ব্রিগেড পুলিসের টহল আছে। রানার সন্দেহ হলো, মার্সিডিজটাকে বিশেষভাবে লক্ষ করছে ওরা। সত্যি? নাকি মনের ভুল?
পিছনে গাড়ি থাকছে, তবে কেউ অনুসরণ করছে বলে মনে হলো না। কোলের ওপর হাত দুটো এক করে রেখে বসে আছে লিমা, দৃষ্টি সরাসরি সামনে। কেউ কোন কথা বলছে না।
এক সময় চার্লটন স্ট্রীটে পৌঁছুল মার্সিডিজ। দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভেঙে লিমা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু যদি মনে না করেন, আপনার পরিচয়টা জানতে পারি?'

'আমি বাংলাদেশের লোক। অত্যন্ত বিপজ্জনক একটা কাজ নিয়ে ম্যাকাওয়ে এসেছি। ঠিকানা জানা থাকলে বা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তোমার বিপদ হতে পারে।'

চেহারাই বলে দেয় সন্ত্রস্ত ভাবটুকু প্রায় কাটিয়ে উঠেছে মেয়েটা, তার জায়গায় আসন গেড়েছে উদ্বেগ। কি যেন বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। রানার সন্দেহ হলো, লিমা কান্না চাপার চেষ্টা করছে।

রাস্তার ডান পাশে বিশাল মেপল ইন। মার্সিডিজের স্পীড কমিয়ে আনল রানা। 'ইন' ও 'আউট' লেখা দুটো গেট, ইউনিফর্ম পরা দারোয়ানরা পাহারা দিচ্ছে। দুই গেটের ব্যবধান পঞ্চাশ গজ। প্রতিটি গেটের দু'পাশে মর্মরপাথরের স্তম্ভ, স্তম্ভের মাথায় সিংহের মূর্তি। 'ইন' লেখা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল মার্সিডিজ। একপাশে বিস্তৃত সবুজ লন, আরেক পাশে বাগান। মাঝখানের রাস্তা ইংরেজি 'ইউ' হরফের মত। রাস্তার ডান পাশে, লনের শেষ মাথায়, পার্কিং লট। বোর্ডাররা গাড়ি-বারান্দায় নামে, ড্রাইভার না থাকলে হোটেলের কর্মীরা পার্কিং এরিয়ায় রেখে আসে গাড়ি।

পার্কিং এরিয়ার দিকে গেল না রানা, বাঁক নিয়ে গাড়ি-বারান্দায় থামল। দরজার হাতলে হাত রাখল লিমা, এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল, 'জানি আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। কিন্তু আমার অবস্থায় পড়লে যে-কোন মেয়ে এই আচরণই করত। সে যাক, আপনি সত্যি আমাকে আপনার হোটেলের নামটা বলতে পারেন না?'

লিমা কি বলছে সেদিকে খেয়াল নেই রানার, তাকিয়ে আছে রিয়ার-ভিউ মিররে। 'নেমো না!' ফিসফিস করল ও।

রানার দৃষ্টি কোথায় লক্ষ করল লিমা, তারপর ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল। তার আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল রানা।

গুণ্ডাদের মধ্যে যার ঘাড়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কোপ মেরেছিল রানা, টয়োটা থেকে বেরিয়ে আসছে সে। তার পিছু নিয়ে টয়োটার ড্রাইভারও বেরিয়ে এল। রানার জন্যে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। পার্কিং এরিয়ায় শুধু গুণ্ডাদের টয়োটা নয়, মাতাল লোকটার নিসান পেট্রলও রয়েছে। মাতলামির কোন লক্ষণ নেই, সে-ও বেরিয়ে এল নিজের গাড়ি থেকে। তিনজন একসঙ্গে হন হন করে এদিকেই আসছে। সাবেক মাতালের জ্যাকেট ফুলে আছে, বাম হাতটা শরীরের কাছ থেকে একটু বেশি দূরে—সন্দেহ নেই শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে সে। বাকি দু'জনের একটা করে হাত পিছন দিকে, সম্ভবত সঙ্গে ছুরি আছে ওদের।

স্টার্ট বন্ধ করেনি রানা, মার্সিডিজ ছেড়ে দিল। সামনে ধনুকের মত বাঁকা পথ, 'আউট' লেখা গেট দিয়ে রাস্তায় মিশেছে। বাঁক ঘোরা শেষ করেনি মার্সিডিজ, গুলি হলো। টং করে ধাতব শব্দ তুলে মার্সিডিজের পিছনে কোথাও লাগল বুলেটটা। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে রানা দেখল, গুণ্ডারা ছুটে ফিরে যাচ্ছে পার্কিং লটে।

গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মার্সিডিজ। স্পীড বাড়িয়ে বাঁক ঘুরল রানা। পিছনে টয়োটা বা নিসান উদয় হবার আগেই মেইন রোড ছেড়ে সরু একটা গলিতে

ঢুকে পড়ল। খানিক পরপর দু'বার বাঁক ঘুরে গলির পাশে গাড়ি থামাল ও। 'হোটেলে ফেরা নিরাপদ নয়,' বলল লিমাকে। 'কোথায় যেতে চাও বলো।'

লিমা এখন যেন নিষ্প্রাণ একটা মূর্তি। কথা বলছে না, নড়ছে না।

'কি হলো?'

মূর্তির দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

অসহায় বোধ করল রানা, খানিকটা বিরক্তও। 'অন্য কোন হোটেলে উঠতে হবে তোমাকে। কোথায় উঠতে চাও বলো।'

'আমার সব টাকা হাতব্যাগে ছিল, ওরা সেটা কেড়ে নিয়েছে,' বলল লিমা।

'সেক্ষেত্রে তোমার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে কোথাও থেকে ফোন করো।'

'আমি তো তিয়ানার ফোন পেয়েই ওখানে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই তাকে ওরা কোথাও আটকে রেখেছে।'

'তিয়ানা?'

'পুরোহিত।'

'বুড়ো এক পুরোহিতের সঙ্গে ম্যাকাওয়ে এসেছ? কি কাজে?'

'বুড়ো নয়, আমার সমবয়েসী,' বলল লিমা। 'আমার বাবার পর বাটামবাং-এর প্রধান মন্দিরে তারই পৌরহিত্য করার কথা। অত্যন্ত ধার্মিক ও সৎ ছেলে।'

'এখন তাহলে কি করবে তুমি?'

'কি করব আমি জানি না,' লিমার সরল স্বীকারোক্তি।

তুমি শালা ফেঁসে গেছ! মনে মনে নিজেকে গাল দিল রানা। হঠাৎ আবিষ্কার করল, ওকে সঙ্কটে ফেলায় মেয়েটার ওপর রাগ হবার কথা, কিন্তু তা হচ্ছে না। আরেক বার লিমার দিকে ভাল করে তাকাল। চুপচাপ বসে আছে, পাথরের একটা মূর্তিই বলতে হবে–শুধু চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। অনেকটা যন্ত্রচালিতের মত, নিজের অজান্তে, পকেট থেকে রুমালটা বের করে বাড়িয়ে দিল। না, এ সাধারণ কোন মেয়ে নয়; এর ওপর রাগ করা স্রেফ অসম্ভব।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'তিনটে বাজতে চলেছে। এত রাতে তোমাকে আমি রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারি না। তোমার যখন কোথাও যাবার জায়গা নেই, চলো তাহলে আমার হোটেলে উঠবে। আমি ইন্টারকন্টিনেন্টালে আছি।'

'সেটা কি উচিত হবে?' নার্ভাস বোধ করছে লিমা।

'আমার স্যুইটে নয়,' বলল রানা। 'তোমার জন্যে আলাদা একটা রূম ভাড়া করব।' লিমা কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল তাকে, 'ভাড়াটা নাহয় আপাতত আমিই দিলাম।'

'না, মানে, আমি বলতে চাইছিলাম, আপনার হোটেলে ওঠাটাও কি নিরাপদ?' লিমা সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে আছে। 'ওদেরকে আমি মোবাইল ফোনে কথা বলতে শুনেছি। অন্তত একটা বাক্য তো স্পষ্টই কানে বাজছে এখনও "ও, আচ্ছা, তুমি ওই লোকটার কথা বলছ–ক'দিন থেকে যে হেরোইন কেনার প্রস্তাব দিচ্ছে–ব্যাটা এদিকেই আসছে তাহলে?" তখন কিছু মনে হয়নি, এখন ভাবছি লোকটা কি আপনার কথাই বলছিল?'

এবার রানার স্তম্ভিত হবার পালা। কথা বলল না, একচুল নড়ল না পর্যন্ত।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে। মেয়েটার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে ইচ্ছে হলো। 'গুণ্ডাদের একজন মোবাইল ফোনে এই কথাটা বলল। কাকে বলল?' কাকতালীয় হোক বা নিয়তি, ও আর মেয়েটা পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। লিমা যদি ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস না করে থাকে, তাকে দোষ দেয়া যায় না। সম্ভাব্য একজন হেরোইন ক্রেতাকে ভদ্র একটা মেয়ে কেন বিশ্বাস করবে?

'কাকে বলল তা তো আমি জানি না,' বলল লিমা। 'আরও একটা কথা ভাবছি। আপনার এই গাড়ির নম্বর নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে। রেন্ট-আ-কার অফিসে যোগাযোগ করে আপনার নাম-ঠিকানা পেয়ে যাবে ওরা। হোটেলে ফেরা আপনার জন্যেও নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না।'

'তোমার বুদ্ধি আছে,' বলল রানা। 'তবে আমার নিরাপত্তার কথা আমাকেই ভাবতে দাও। প্রথম কাজ, তোমার একটা ব্যবস্থা করা। আমার এক শুভানুধ্যায়িনী আছেন, সুচেতা পাটনায়েক। ম্যাকাওয়ে তাঁর জোরাল কানেকশন আছে, আন্ডারওয়ার্ল্ডের গোক্ষুররাও তাঁকে সমঝে চলে। একটা বিউটি পার্লারের মালিক তিনি। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাঁর কাছে রাতটা কাটাতে পারো। কিন্তু তারপর কি করবে? কোনও প্ল্যান আছে? ম্যাকাও যে তোমার জন্যে নিরাপদ জায়গা নয়, এটা তো নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছ।'

'আমার কাছে রিটার্ন টিকেট আছে,' বলল লিমা। 'আপনি যদি কাল বিকেলের দিকে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারেন, আমি ব্যাংককে ফিরে যেতে পারি।'

'ব্যাংককে কেন? তুমি না তখন বললে তোমার দেশ কম্বোডিয়া?'

'কেন, আপনি জানেন না কম্বোডিয়ায় এখন গৃহযুদ্ধ চলছে? খেমাররুজ গেরিলারা গোটা দেশে আগুন জ্বেলে রেখেছে। আমরা পালিয়ে এসেছি···সে অনেক কথা, আপনার শোনার ধৈর্য হবে না।'

'আমাকে তুমি বিশ্বাসও করতে পারছ না,' বিড়বিড় করল রানা। তারপর গাড়ি ছেড়ে দিল।

'আপনি হয়তো আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন, তবে কথাটা সত্যি,' একটু পর বলল লিমা। 'সত্যি আপনাকে আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ম্যাকাওয়ে আপনি কি করছেন, আপনার পরিচয় কি, এসব কিছুই আমি জানি না। এমন কি নামটা পর্যন্ত আমাকে আপনি বলেননি এখনও।'

'আমি মাসুদ রানা।'

'ধন্যবাদ। মি. রানা, আপনি কি সত্যি হেরোইন কেনার জন্যে ম্যাকাওয়ে এসেছেন?'

'মিস্টার বাদ দাও। হেরোইন···সে অনেক কথা, তোমার শোনার ধৈর্য হবে না।'

'আপনিও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না,' বিড়বিড় করল লিমা।

কথা না বলে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে রানা। লিমাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর খুক করে কেশে পরিবেশ থেকে অস্বস্তির ভাবটুকু দূর করার

চেষ্টা করল। 'আপনাকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ঠিকই, তবে একটা কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। চেহারা যদি সার্টিফিকেট হয়, আর আচরণ যদি হয় ক্রেডিট কার্ড, সব মিলিয়ে আপনাকে মহৎপ্রাণ একজন সত্যিকার ভদ্রলোক বলতে হবে। তারপরও, আপনাকে আমার ভয় লাগছে। সে ভয় দূর করার দায়িত্ব আপনার।'

রানা সাড়া দিচ্ছে না।

লিমা আবার বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস করতে না পারায় নিজের কাছে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি।'

অন্য প্রসঙ্গে, অনেকটা স্বগতোক্তি করার সুরে, রানা বলল, 'কাল সকালে আমি গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে ওই দু'জন পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে যাব। রাতটা আমাকেও মিসেস পাটনায়েকের বিউটি পার্লারে কাটাতে হবে।'

'ঠিক আছে, আপনার সব কথা আমি জানতে চাই না। শুধু স্বীকার বা অস্বীকার করুন—আপনি কি সত্যি হেরোইন কেনাবেচা করেন?'

'কেন, জেনে কি লাভ তোমার?'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল লিমা। 'হাসবেন না, কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি—আমার একজন দেবদূত দরকার, যাকে আমার বিপদের কথা খুলে বলা যায়।'

'তোমার বুঝি সন্দেহ হচ্ছে, আমিই সেই দেবদূত হলেও হতে পারি?'

রানা নয়, লিমাই হেসে ফেলল। 'সত্যি সন্দেহ হচ্ছে।'

হাসি বা জলতরঙ্গের রিনিঝিনি আওয়াজটা থেমে গেলেও তার রেশ অনেকক্ষণ লেগে থাকল কানে। রানা জানতে চাইল, 'তোমার ইংরেজি খুব ভাল। কোথায় শিখেছ?'

'ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ডে ছিলাম আমি,' বলল লিমা। 'তারপর ব্যাংকক ইউনিভার্সিটি থেকে ইংরেজিতে অনার্স করেছি। ছুটিতে দেশে ফিরেছিলাম...' থেমে গেল সে, প্রসঙ্গ বদলে ফেলল। 'আপনিই বলুন, আপনাকে আমার সব কথা বলা যায়?'

'দেবদূত চাইলে অন্য কোথাও খুঁজতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'আমি সাধারণ একজন বাঙালী, সরকারী কাজে ম্যাকাওয়ে এসেছি। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড পেনিট্রেট করতে চাই, সেজন্যেই হেরোইনের ক্রেতা সাজতে হয়েছে।'

হঠাৎ রানার হাতে হাত রাখল লিমা। 'ভুল বুঝেছি, সেজন্যে ক্ষমা চাই।' তারপরই হাতটা টেনে নিল।

'ক্ষমা করা গেল না, কারণ তুমি কোন অপরাধ করোনি,' বলল রানা। 'তবে তোমার গল্পটা এবার শোনা যেতে পারে।'

'শুনলে বুঝতে পারবেন, আপনি শুধু আমার প্রাণ বাঁচাননি, কয়েক লাখ কম্বোডিয়ানবাসীর পরম উপকার করেছেন। আমি ওদের হাতে পড়লে অত্যন্ত গোপনীয় একটা তথ্য ফাঁস হয়ে যেত, আমার দেশবাসী বঞ্চিত হত কয়েক হাজার কোটি ডলারের জাতীয় সম্পদ থেকে।'

রানা হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, লিমার কথায় মনোযোগ নেই। সামনে বাঁক নিতে হবে ওকে, কিন্তু গ্রীন ব্রিগেডের সবুজ রঙের একটা জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে বাঁকের মুখে। ওর আড়ষ্ট ভাব টের পেয়ে চুপ করে গেছে লিমা। মার্সিডিজের স্পীড না কমিয়ে নাক বরাবর সোজা যাচ্ছে রানা, বাঁক নেবে না। জীপটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, ভেতরে ড্রাইভারের পাশে মাত্র একজন পুলিস বসে আছে। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে, মার্সিডিজ সম্পর্কে যেন কোন আগ্রহই নেই।

'ওরা কি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে এখানে?' জিজ্ঞেস করল লিমা, কেঁপে গেল গলাটা।

'এবার ম্যাকাওয়ে এসে মিসেস পাটনায়েকের সঙ্গে আমি দেখা করিনি,' বলল রানা। 'শুধু একবার টেলিফোন করেছিলাম। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, এ-কথা তো অন্তত গ্রীন ব্রিগেডের জানার কথা নয়।'

'থ্রিলার পড়েননি, টেলিফোনে আড়িপাতা যন্ত্র ফিট করা যায়?'

রানা চিন্তিত, তারপরও হেসে ফেলল। 'পড়িনি আবার!'

'এখন তাহলে কি হবে?'

'আরেক দিক থেকে ওই রাস্তার উল্টো প্রান্তে পৌঁছুতে আধ ঘণ্টার মত লাগবে,' বলল রানা। 'এই ফাঁকে তোমার গল্পটা শোনা যাক। হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যাবে।'

'আগে আপনি আমাকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে চলুন, তা না হলে কথাগুলো আমি গুছিয়ে বলতে পারব না—আমার খুব ভয় করছে।'

'তুমি বোধহয় প্রথমে আমার গল্পটা শুনতে চাইছ,' বলে হেসে উঠল রানা।

চট্টগ্রাম বন্দরে পরপর কয়েকটা বড় হেরোইনের চালান ধরা পড়ায় ইন্টারন্যাশনাল নারকোটিক কন্ট্রোল কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। কমিশন দ্রুত তদন্ত চালিয়ে একটা রিপোর্ট পাঠায় বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায়। সেই রিপোর্টেই প্রথম ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড সম্পর্কে জানা যায়।

চীনাদের যে-কোন সিক্রেট ক্রিমিনাল সোসাইটিকে ট্রাইয়্যাড বলা হয়। প্রায় সব ট্রাইয়্যাডই বেআইনী মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ট্রাইয়্যাড শব্দটা চীনা মাফিয়ার প্রতিশব্দ হিসেবে চালু হয়ে গেছে। ম্যাকাওয়ের প্রধান ব্যবসাই হলো ক্যাসিনো, অর্থাৎ জুয়া—জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ব্যবসাটাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিশাল করে তোলার কৃতিত্ব চীনাদের এক ডজন ট্রাইয়্যাডের, তার মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ও প্রভাবশালী ছিল রেড ড্রাগন।

রেড ড্রাগনের আমলে ম্যাকাও-এর আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। টাইমবোমা দিয়ে প্রতিপক্ষের ক্যাসিনো উড়িয়ে দেয়া, পাইকারী হত্যাকাণ্ড, পর্তুগীজ পুলিস খুন ইত্যাদি ছিল নিত্যকার ঘটনা। বেসরকারী পুলিস গ্রীন ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, তবে সেটাকে শুভ বলার খুব একটা সুযোগ নেই। গ্রীন ব্রিগেড রেড ড্রাগন সহ প্রায় এক ডজন ট্রাইয়্যাডকে নিশ্চিহ্ন করতে সফল হয়েছে বলে দাবি করলেও, তাদের

এই সাফল্য ম্লান হয়ে যায় ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের উত্থানে।

আইএনসিসি-র রিপোর্টে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড সম্পর্কে বিচিত্র সব তথ্য দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, গ্রীন ব্রিগেড আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় অত্যন্ত দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তারা নতুন এই সংগঠনের লীডার বা সদস্যদের সম্পর্কে নিরেট কোন তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি। এই ব্যর্থতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গ্রীন ব্রিগেডের তরফ থেকে একটা অজুহাত খাড়া করা হয়েছে—ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড এই পর্তুগীজ কলোনিতে খুন-জখম, অগ্নিসংযোগ, বোমাবাজি, অপহরণ ইত্যাদি অপরাধ প্রায় করে না বললেই চলে। সেজন্যেই তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা বা কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হচ্ছে না। কমিশনের পাঠানো রিপোর্টেও এই বক্তব্যর সমর্থন পাওয়া যায়। তবে গ্রীন ব্রিগেডের একটা কৃতিত্বের দাবি অস্বীকার করা হয়েছে রিপোর্টে। গ্রীন ব্রিগেড দাবি করে, রেড ড্রাগন সহ প্রায় এক ডজন ট্রাইয়্যাডকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে তারা। আসলে কথাটা সত্যি নয়। রেড ড্রাগন সহ বাকি সব ট্রাইয়্যাড আসলে একত্রিত হয়ে গঠন করেছে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড।

আরেকটা বিচিত্র তথ্য হলো, রেড ড্রাগন ট্রাইয়্যাডের কোন অস্তিত্ব এখন আর ম্যাকাওয়ে না থাকলেও, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের লীডার নিজেকে রেড ড্রাগন বলে প্রচার করছে। রেড ড্রাগন আগে একটা সংগঠনকে বোঝাত, এখন বোঝায় একজন ব্যক্তিকে। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের এই লীডার সম্পর্কে গরুত্বপূর্ণ কোন তথ্যই পাওয়া যায়নি, শুধু জানা গেছে তার ডান হাতে রেড ড্রাগনের উল্কি আছে।

ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড কলোনিতে খুব একটা অপরাধ করে না, তাহলে তারা করেটা কি? কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, অত্যন্ত শক্তিশালী একটা নেটওঅর্কের মাধ্যমে গোটা দক্ষিণ-পুব এশিয়ায় হেরোইনের ব্যবসা পরিচালনা করছে ওরা। থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েৎনাম, পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বার্মা থেকে হেরোইন আনছে ম্যাকাওয়ে, সেখান থেকে পাচার করছে বিভিন্ন দেশে। পাচারের এই কাজে রুট হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরকে। হুন্ডির মাধ্যমে আগেই পৌঁছে যায় টাকা, টাকা পাব্যর পর জাহাজে বৈধ কার্গোর ভেতর হেরোইন ভরা হয়, সেই জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছায় সিঙ্গাপুর থেকে আরও কিছু বৈধ কার্গো নিয়ে। কমিশন বিসিআইকে জানিয়েছে, এরইমধ্যে অগ্রিম হিসেবে এক হাজার কোটি টাকা পেয়ে গেছে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড, কাজেই হেরোইনের চালান যতই ধরা পড়ুক, একের পর এক চট্টগ্রাম বন্দরে ওগুলো আসতেই থাকবে।

মাসুদ রানা বিসিআই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট। ঢাকা থেকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে ম্যাকাওয়ে পাঠানো হয়েছে ওকে এই সমস্যার স্থায়ী একটা সমাধান বের করার জন্যে। ঢাকায় ওকে ব্রিফ করে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও বিসিআই-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (অপারেশনাল) সোহেল আহমেদ। মেকআপের সাহায্যে নিজের চেহারা খানিকটা বদলে নিয়েছে রানা, সঙ্গে আছে ছদ্মনামের বিশ্বাসযোগ্য পরিচয়-পত্র, ম্যাকাওয়ে এসেছে হেরোইনের ক্রেতা সেজে। ওর

ওপর নির্দেশ আছে, শুধু হেরোইনের চালান আসা বন্ধ হলে চলবে না, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে একেবারে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। রানার প্রশ্ন ছিল, একা তা কিভাবে সম্ভব। জবাবে বলা হয়েছে, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড আসলে ওয়ান-ম্যান-শো রেড ড্রাগন। এই রেড ড্রাগনকে খতম করতে পারলে ট্রাইয়্যাড এমনিতেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু ম্যাকাওয়ে আসার পর তিনদিন পার হতে চলেছে, রানা কোন সুবিধে করতে পারেনি। সন্ধে থেকে ভোর পর্যন্ত আন্ডারওয়ার্ল্ডের গলি-ঘুপচিতে ঢুঁ মেরেছে ও, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলে প্রচুর হেরেছে। বারে বসে ঢকঢক করে মদ গিলেছে। ম্যাসাজ পার্লারেও যেতে হয়েছে। আন্ডারগ্রাউন্ডের অনেককেই চিনতে পেরেছে ও, তাদের কানে তথ্যটা ঢুকিয়ে দিতে ব্যর্থও হয়নি–সে ঢাকা থেকে এসেছে হেরোইন কেনার উদ্দেশ্যে, রেড ড্রাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। কিন্তু ফলাফল শূন্য। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ওর মুখে রেড ড্রাগন নামটা শোনামাত্র বোবা ও কালা হয়ে গেছে সবাই।

এই তিনদিনে রানার অভিজ্ঞতা হলো, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড অসম্ভব সতর্ক। সম্ভাব্য ব্যবসা যত বড়ই হোক, ক্রেতার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ওকে তারা পাত্তাই দেবে না। রেড ড্রাগনের নাম শোনা মাত্র আন্ডারগ্রাউন্ডের সবাই যেভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করছে, এ থেকে প্রমাণ হয় ওদের নেটওঅর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। শেষ পর্যন্ত ক্রেতা হিসেবে ওকে যদি তারা গ্রহণ করেও, রানা রেড ড্রাগন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।

নিজের পেশা ও পরিচয় সম্পর্কে আভাস দেয়ার জন্যে সংক্ষেপে যতটুকু বলা দরকার তার বেশি বলল না রানা, লিমাও কোন প্রশ্ন করে ওকে বিব্রত করল না। উল্টোদিকের রাস্তায় পৌঁছুল মার্সিডিজ, যতদূর দৃষ্টি যায় গ্রীন ব্রিগেডের চিহ্ন নেই কোথাও–সবুজ জীপটা অন্য কোনদিকে চলে গেছে।

রাস্তায় একটা টেলিফোন বুদে থেমেছিল রানা, মিসেস পাটনায়েককে সতর্ক করে দিয়েছে। বাড়িটা তিনতলা, প্রথম দুটো ফ্লোরে অফিস ও পার্লার, শেষ ফ্লোরে মিসেস পাটনায়েক তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে থাকেন। ভদ্রমহিলার স্বামী হরিচরণ পাটনায়েক কয়েক বছর আগে ক্যান্সারে মারা গেছেন। হরিচরণ ও সুচেতার পরিবার তিনপুরুষ ধরে ম্যাকাওয়ে বসবাস করছে। আদি নিবাস মাদ্রাজে হলেও, সেখানে তাদের আসা-যাওয়া নেই। ম্যাকাওয়ের চীনা সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছেন মিসেস পাটনায়েক। তাঁর মেয়েরা অনর্গল চীনা ভাষায় কথা বলতে পারে। হরিচরণ ইন্টারপোলের অফিসার ছিলেন, সেই সূত্রেই রানার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। পরে তিনি রানা এজেন্সির হয়েও কিছুদিন কাজ করেন। ম্যাকাওয়ে এলে ওঁদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করত রানা। হরিচরণ মারা যাবার পরও সম্পর্কটা শিথিল হতে দেননি মিসেস পাটনায়েক, টেলিফোন ও চিঠির মাধ্যমে রানার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন তিনি।

রানা সতর্ক করায় প্রস্তুত হয়ে ছিলেন সুচেতা। গেটটা খোলাই দেখল রানা। সোজা ভেতরে ঢুকল মার্সিডিজ। ড্রাইভ-ওয়ে ধরে বাড়ির পিছন দিকে

চলে এল রানা। পাশাপাশি দুটো গ্যারেজ, একটার গেট খোলা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিন দৈত্য—অরোরা, মিং আর ঝাং। ম্যাকাওয়ে বৈধ ব্যবসা করতে হলেও মাসলম্যান তো পুষতে হয়ই, তারপরও আন্ডারগ্রাউন্ড লীডারদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় না রাখলে চলে না। প্রতিটি নিয়ম ও কৌশল নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলেন সুচেতা, ফলে তাঁর কোন সমস্যা হয় না। অরোরা, মিং আর ঝাংকে আপন সন্তানের মতই স্নেহ করেন তিনি, খাবার সময় ওদেরকে নিয়ে এক টেবিলে বসেন। ওরা জানে, দায়িত্ব পালন করার সময় কেউ যদি মারা যায়, ভবিষ্যতে তার পরিবার আর্থিক সঙ্কটে পড়বে না। আর সুচেতা জানেন, তাঁর নির্দেশে ওরা তিনজন মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তেও দ্বিধা করবে না।

সরাসরি গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বন্ধ হয়ে গেল গেট। মার্সিডিজের দু'দিক থেকে নামল লিমা ও রানা। অরোরা এগিয়ে এসে নমস্কার করল ওদেরকে, মিং আর ঝাং ঘন ঘন বার কয়েক মাথা নোয়াল। 'মিসেস পাটনায়েক আপনাদের জন্যে তিনতলায় অপেক্ষা করছেন,' বলল অরোরা, পিছনের একটা দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে। 'আপনি তো জানেনই সিঁড়িটা কোনদিকে, সরাসরি উঠে যান, স্যার।'

'আমি গেটে পাহারায় থাকছি,' অরোরা থামতেই বলল মিং। 'আমার সঙ্গে অরোরা থাকবে। আর ঝাং গোটা বাড়ি চক্কর দেবে। তিনতলার সিঁড়ির মাথায় একটা ছেলে আছে, নাম পিয়াং—যখন যা দরকার বললেই এনে দেবে সে।'

'সবাইকে ধন্যবাদ,' বলে লিমার একটা হাত ধরে দরজার দিকে এগোল রানা।

সুচেতা পাটনায়েককে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর যমজ বোন বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে সুচেতার গায়ের রঙ শ্যামলা। ওদেরকে ড্রইংরুমে ঢুকতে দেখে সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, কয়েক পা এগিয়ে থমকে গেলেন, তারপর ক্ষোভ-মেশানো গলায় বললেন, 'এ তোমার ভারি অন্যায়, রানা। তিন দিন হলো ম্যাকাওয়ে এসেছ, অথচ আমাকে একবার দেখতে আসোনি! ইস্, রাত জেগে চেহারার কি অবস্থা করেছ!'

'বিশ্বাস করুন, একদম সময় পাইনি। শুনুন, সুচেতা, এ লিমা...'

'হাই, লিমা!' বলে হাসলেন সুচেতা, তারপর চোখ গরম করে রানার দিকে তাকালেন। 'আর একটাও কথা নয়। গেস্টরুমে কোথায় তুমি জানো, সোজা ওখানে চলে যাও। গোসল করতে চাইলে বাথরুমে গরম পানি আছে। পিয়াং একটা টেবিলে কিছু খাবার দিয়েছে, ইচ্ছে হলে খেতে পারো। বেলা এগোরোটার দিকে কথা হবে, তোমাদের ঘুম ভাঙলে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, তবে শুধু একটা কথা,' বলল রানা। 'আমি ঠিক ন'টায় বেরিয়ে যাব। যতক্ষণ না ফিরি, লিমা এখানে থাকবে। যদিও আলাদা কেস, তবে দু'জনেই আমরা বিপদের মধ্যে আছি। লিমাকে প্রোটেকশন দেয়া সম্ভব তো, যতক্ষণ না ফিরি আমি?'

'ম্যাকাওয়ে এমন কেউ আছে নাকি যে আমার বাড়িতে ঢুকে একটা

মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে?' হেসে উঠলেন সুচেতা। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো যে ম্যাকাওয়ের গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। তাঁর মেয়েরা আমার পার্লারে নিয়মিত মেকআপ নিতে আসে।'

'ধন্যবাদ, সুচেতা,' বলে লিমাকে নিয়ে ড্রইংরুম থেকে করিডরে বেরিয়ে এল রানা।

গোসল সেরে সামান্য কিছু মুখে দিল ওরা, ইতিমধ্যে চারটে বেজে গেছে। একটু পরই সকাল হয়ে যাবে, তাই আর বিছানায় গেল না রানা। তাছাড়া, বিছানাও মাত্র একটা। লিমা বলল, তারও ঘুম আসবে বলে মনে হচ্ছে না। কথাটা সত্যি নয়, আসলে রানার উপস্থিতিতে শুতে সঙ্কোচ বোধ করছে। 'আপনার কি ফিরতে অনেক দেরি হবে?' পরিবেশ থেকে আড়ষ্ট ভাবটা দূর করার জন্যে জিজ্ঞেস করল সে।

'সেটা নির্ভর করছে তোমার কাহিনীর ওপর,' বলল রানা। 'সব কথা খুলে বলো আমাকে। গ্রীন ব্রিগেড গুণ্ডাদের সাহায্য করছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে হলে তোমার কাহিনীর ভেতর কি আছে জানা দরকার আমার।'

সোফার ওপর পা গুটিয়ে বসেছে লিমা, গরম একটা শাল দিয়ে শরীরটা ঢাকা। ধীরে ধীরে, নরম গলায়, শুরু করল সে। সামনের একটা সোফায় বসেছে রানা, শোনার জন্যে তার দিকে একটু ঝুঁকল।

প্রথমে কম্বোডিয়ায় খেমাররুজ গেরিলাদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর নির্দয় অত্যাচারের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিল লিমা। ওদের এলাকা দুর্গম হওয়ায় গেরিলারা ছোটখাট দল নিয়ে হামলা চালাতে আসত। এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল যুবক ও কিশোরদের ধরা, তারপর ট্রেনিং দিয়ে গেরিলা বানানো; মেয়েদের নিয়ে গিয়ে রেপ করা আর বাড়ি বাড়ি ঢুকে লুঠপাট। লিমার বাবা নগুয়েন গুনো ছিলেন এলাকার প্রধান মন্দিরের পুরোহিত। আর সব পুরোহিতের মত তিনিও গেরিলাদের ঠেকাতে হাতে অস্ত্র তুলে নেন। সবাই মিলে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় গেরিলাদের ছোট দলগুলো কোন বারই বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। তবে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে খবর আসছিল, গেরিলারা একের পর এক প্যাগোডায় হামলা চালিয়ে সোনা আর মূল্যবান পাথর ছিনিয়ে নিচ্ছে, বাধা দিলে খুন করছে পুরোহিতদের।

সবাই খুব ভয়ে ভয়ে ছিল। এই সময় খবর এল, এবার আর রক্ষা নেই, গেরিলাদের বিশাল একটা বাহিনী রওনা হয়েছে, যে-কোন দিন ওদের এলাকায় পৌঁছে যাবে।

সৎ ও ধার্মিক হিসেবে নগুয়েন গুনোর খুব খ্যাতি ছিল। গেরিলারা আসছে শুনে এলাকার পুরোহিতরা তাঁদের প্যাগোডার সমস্ত সোনা ও মূল্যবান পাথর তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন, ওগুলো যাতে নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারেন তিনি।

গেরিলারা যখন কাছে চলে এসেছে, গ্রামের মাতবররা সভা ডেকে সিদ্ধান্ত

নিলেন, সোনা আর পাথর গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। পুরোহিত নগুয়েন গুনো একটা লঞ্চ ভাড়া করলেন। এক হাজার মণ সোনা আর চামড়ার দুটো ব্যাগে ভরা পাথর নিয়ে রওনা হলেন তিনি, সঙ্গে থাকল লিমা আর মন্দিরের শিক্ষানবিস পুরোহিত তিয়ানা।

পরদিনই গ্রামে হামলা করল গেরিলারা। পুরোহিত স্বামী সোনা আর মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে, এই অভিযোগে লিমার মাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারল তারা, তারপর লঞ্চটাকে ধাওয়া শুরু করল।

কম্বোডিয়ার উপকূল ঘেঁষা বিশাল জলাভূমি পেরুবার সময় লঞ্চটা ডুবে গেল। লিমার বাবা গেরিলাদের গুলি খেয়ে আগেই আহত হয়েছিলেন, মারা গেলেন পানিতে ডুবে। একটানা চারদিন জলার সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ করে আর গেরিলাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে খোলা চ্যানেলে বেরিয়ে আসে লিমা আর তিয়ানা। এই জলাভূমি কয়েকশো মাইল বিস্তৃত–অসংখ্য চ্যানেল, নলখাগড়ার বন আর লেগুনের সমষ্টি। সিহানুকভিল থেকে ট্রাট পর্যন্ত এর বিস্তৃতি, মাঝখানে পড়েছে শ্রী-ওমবেল শহর, কাস-কং নদী, কো কাট দ্বীপ, বাটামবাং খাঁড়ি। জেলেদের নৌকায় উঠে ওরা ব্যাংককে পৌঁছায়। সেখান থেকে তিন হপ্তা পর ম্যাকাও চলে আসে। ম্যাকাওয়ে আসার কারণ, এখানে তিয়ানার পরিচিত লোকজন আছে। তবে লিমার জেদেই ম্যাকাওয়ে আসতে রাজি হয় তিয়ানা। লিমা চাইছিল, একটা লঞ্চ আর কয়েকজন ভাড়াটে লোককে নিয়ে কাস-কং ও বাটামবাং জলাভূমিতে যাবে ওরা, উদ্ধার করবে প্যাগোডার সোনা আর পাথর। ব্যাংককে লেখাপড়া করেছে সে, ওখানকার ব্যাংকে কিছু টাকা ছিল তার। ম্যাকাওয়ে এসেছে দুই হপ্তা হলো।

গত রাতে লিমার হোটেলে ফোন করে তিয়ানা, একটা রাস্তার মোড়ে দেখা করতে বলে ওকে। জানায়, ওদেরকে সাহায্য করার মত লোক পাওয়া গেছে। লিমা কোন সন্দেহ করেনি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছায় সেখানে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়ার পরও তিয়ানাকে সে আশপাশে কোথাও দেখতে পায়নি। তার বদলে টয়োটা নিয়ে পাঁচজন গুণ্ডা আসে ওখানে। গুণ্ডারা ওকে জোর করে গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছিল, এই সময় রানা এসে পড়ে।

রানার প্রশ্নের উত্তরে লিমা জানাল, জলার যেখানে লঞ্চটা ডুবেছে সেই জায়গা চিনতে পারবে সে। যে চেনে না তার পক্ষে ওই জায়গা খুঁজে বের করা সম্ভব নয়। না, লঞ্চটাকে অন্য কেউ ডুবতে দেখেনি। সব সোনাই কাঠের বাক্সে ভরা হয়েছিল। সোনা মানে বেশিরভাগই বুদ্ধ মূর্তি। সব মিলিয়ে ছোটবড় প্রায় দুশো কাঠের বাক্স আর দুটো চামড়ার ব্যাগ। ব্যাগ দুটোয় মূল্যবান রত্ন আছে–পোখরাজ, নীলকান্তমনি, হীরে, মুক্তো, গোমেদ, চুনি ইত্যাদি। লঞ্চ যেখানে ডুবেছে সেখানকার পানির গভীরতা? হ্যাঁ, তিয়ানা মেপে ছিল–পঁচিশ ফুটের মত, তার বেশি নয়।

সবশেষে লিমা জানতে চাইল, রানা কি তাকে পরামর্শ দেবে, এখন তার কি করা উচিত? প্রথম কাজ তিয়ানাকে গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করা, তাই না? তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে ব্যাংককে কিভাবে ফিরে যাবে সে! লঞ্চটা পানি

থেকে তোলারই বা কি ব্যবস্থা করা যায়?

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'ওই লঞ্চ তোলার কথা আপাতত তোমাকে ভুলে যেতে হবে, লিমা। ভাড়াটে লোকজনের সাহায্য নিয়ে এ-কাজ হবার নয়, কারণ লঞ্চের সব সোনা আর পাথর তারা মেরে দেয়ার চেষ্টা করবে, প্রয়োজনে তোমাদেরকে খুন করে হলেও। আর, তিয়ানা নিশ্চয়ই কোন সিন্ডিকেটের ফাঁদে ধরা পড়েছে। বলা যায় না, ইতিমধ্যে হয়তো মারাও গেছে সে। তারা এখন তোমাকেও ছাড়বে না। বাঁচতে চাইলে আজ বিকেলের ফ্লাইটেই ম্যাকাও ছেড়ে চলে যাও তুমি। এটাই আমার পরামর্শ।'

'তিয়ানাকে ওরা মেরে ফেলেছে?' বলে কাঁদতে শুরু করল লিমা।

প্রায় ন'টা বাজতে চলেছে। দাড়ি কামিয়ে বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হলো রানা। লিমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, সে যেন ভুলেও এই বাড়ি ছেড়ে না বেরোয়।

দুই

ওপোর্টো আর টাগাস স্ট্রীটের মোড়ে কাঁচ মোড়া ছ'তলা বিল্ডিংটা গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার। বন্দরের কাছাকাছি কমার্শিয়াল এরিয়া এটা, বিল্ডিংগুলো গায়ে গায়ে লেগে আছে। দেয়ালবিহীন বহুতল গ্যারেজটাও এই এলাকায়, ওটার পাশে সারি সারি ওয়্যারহাউস।

প্রয়োজনে ম্যাকাও কর্তৃপক্ষের সাহায্য দরকার হতে পারে, সে-কথা ভেবে ঢাকা থেকে নিজের আসল পরিচয়-পত্রও সঙ্গে নিয়ে এসেছে রানা। মিসেস পাটনায়েকের বিউটি পার্লার থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চলে আসে ও, হোটেলের ভেতর স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের লকার থেকে কাগজ-পত্র বের করে ঢোকে ফোন-বুদে। কোন ঝামেলা হলো না, গ্রীন বিগ্রেডের ডিরেক্টর ম্যাট হিথ ওর সঙ্গে পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা করতে পারবেন বলে জানাল তাঁর সেক্রেটারি। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবার পর তাড়াতাড়ি নিজের স্যুইটে ঢুকে নতুন সুট আর হ্যাট পরেছে রানা, তারপর ওই একই ট্যাক্সি নিয়ে চলে এসেছে গ্রীন ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টারে। সাক্ষাৎকারের সময়-সীমা দশ মিনিট, রানার জন্যে তা যথেষ্ট।

ট্যাক্সি থেকে নামতেই রানাকে অবাক করে দিয়ে স্যালুট করল গ্রীন ব্রিগেড সিকিউরিটি গার্ড, একটা হাত পেতে জিজ্ঞেস করল, 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে তার হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিল রানা। একবার চোখ বুলিয়েই গার্ড সেটা ফিরিয়ে দিল, গেট আরও একটু খুলে বলল, 'সোজা চলে যান, স্যার। সুইংডোরের পাশে আপনার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ অপেক্ষা করছে, সে-ই আপনাকে টপ ফ্লোরে ডিরেক্টরের চেম্বারে পৌঁছে দেবে।'

'ধন্যবাদ,' বলে ভেতরে ঢুকল রানা। মনটা খুশি। সিআইএ-র সাবেক

একজন অফিসার বিসিআই-এর একজন এজেন্টকে সম্মান জানাতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না, সেটাই কারণ। এ মর্যাদা ব্যক্তি মাসুদ রানার নয়, প্রতিষ্ঠান তথা দেশের প্রাপ্য।

সাদা মার্বেল পাথরের ধাপ ক'টার ওপর সুইংডোরের সামনে সত্যি একজন চীনা গার্ড অপেক্ষা করছিল। 'মি. মাসুদ রানা?' কাছাকাছি হতেই জিজ্ঞেস করল সে, মাথা নোয়াল একবার। রানা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে বলল, 'আসুন, প্লীজ।' ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, তারপর এলিভেটরে চড়ল।

এলিভেটর থেকে ছ'তলার করিডরে বেরুল রানা। মেঝেতে লাল কার্পেট, দেয়ালে হালকা সবুজ রঙের দেয়াল-চিত্র—পৌরাণিক চীনা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আঁকা হয়েছে। দু'পাশের দরজায় গ্রীন ব্রিগেড অফিসারদের নাম লেখা, তবে একটা দরজা ছাড়া অন্য কোন দরজায় পাহারা নেই। নামগুলোর ওপর চোখ বোলাল রানা। গ্রীন ব্রিগেডের বেশিরভাগ কর্মকর্তাই সাবেক মিলিটারি অফিসার—কর্নেল, মেজর, ক্যাপটেন ইত্যাদি। 'ডিরেক্টর, কর্নেল ম্যাট হিথ' লেখা দরজার সামনে দু'জন সশস্ত্র গ্রীন ব্রিগেড সদস্য পাহারা দিচ্ছে। করিডরের শেষ মাথায় কাঁচের জানালা, বাইরে অন্য এক বিল্ডিঙের ছাদ। রানার সঙ্গী গার্ড উচ্চারণ করল, 'মি. মাসুদ রানা।'

প্রহরী গার্ড দু'জন একযোগে মাথা নোয়াল। 'কর্নেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন,' বলে দরজা খুলে দিল একজন। ভেতরে রানা একাই ঢুকল।

ঢোকার পর বোঝা গেল এটা বিশাল একটা রিসেপশন-কাম-কমিউনিকেইশন রুম। একপাশে সারি সারি কমপিউটর ও টিভি মনিটর নিয়ে বসে আছে অপারেটররা। শহরে গ্রীন ব্রিগেডের যে-সব সদস্য ডিউটি দিচ্ছে তাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে আরেক দল অপারেটর, তাদের কানে মোবাইল ফোন। কামরার আরেক পাশে লম্বা কাউন্টার, সেটার পিছনে সুন্দরী এক তরুণী বসে আছে একা। রানাকে দেখে চেয়ার ছাড়ল সে, কাউন্টার ঘুরে ত্রস্ত পায়ে হেঁটে এল। 'মাসুদ রানা। প্লীজ, আসুন।' রানাকে একটা দরজার সামনে নিয়ে এল সে। দরজা খুলে ভেতরে তাকাল না, রানাকে বলল, 'বস্ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

রানা ভেতরে ঢুকতে বাইরে থেকে ভিড়িয়ে দেয়া হলো দরজা।

কামরাটা মাঝারি আকৃতির। দেয়ালে পালিশ করা পিঁয়াজ রঙা কাঠের প্যানেল। মেঝেতে বাদামী কার্পেট। সিলিং থেকে ঝুলছে নীল-সাদা-সবুজ রঙের একজোড়া ঝাড়বাতি। ডেস্কটা খুব বড় নয়; ফাইলের একটা ট্রে, অ্যাশট্রে, একজোড়া টেলিফোন, নোটবুক আর কলম রয়েছে। ঘরের আরেক কোণে দ্বিতীয় ডেস্ক, তাতে টিভি ও কমপিউটর দেখা যাচ্ছে।

প্রথম ডেস্কের পিছনে রিভলভিং চেয়ারে বসে পাইপ ধরাচ্ছেন কর্নেল ম্যাট হিথ। লাল টকটকে চেহারা। কারণটা বোধগম্য হলো না, সামরিক ইউনিফর্ম পরে আছেন—বুকে আর কাঁধে পদক আর ব্যাজ-এর ছড়াছড়ি। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের লীডার রেড ড্রাগন কোথায় আছে জানতে পারলে তাকে ধরার জন্যে কর্নেল হিথ নিজেই রওনা হবেন, এটা সম্ভবত কথার কথা নয়। ইউনিফর্মের

নিচে শোল্ডার হোলস্টারের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কারণটা যাই হোক, সশস্ত্র অবস্থায় অফিসে বসে কাজ করা–ব্যাপারটা কেমন খাপছাড়া লাগল রানার চোখে।

দরজা থেকে কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ম্যাট হিথ পাইপটা ধরাতে কয়েক সেকেন্ড সময় নিলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে যখন তাকালেন, বিস্মিত ও বিব্রত মনে হলো তাঁকে। 'মাসুদ রানা?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'জানতেই পারিনি কখন এলেন। আসুন, মি. রানা। ওহ্,' বলে হাতটা ডেস্কের ওপর দিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন, 'ম্যাট হিথ।'

হ্যান্ডশেক করে একটা চেয়ারে বসল রানা। ম্যাট হিথ ছ'ফুটের বেশি লম্বা। মেদহীন চওড়া কাঠামোর শরীর। বয়েস পঞ্চাশ বা বাহান্ন হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়ানোর ঋজু ভঙ্গিটা চোখে পড়ার মত।

'আপনার নাম অনেক শুনেছি,' অমায়িক হেসে বললেন কর্নেল। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার অনেক দিনের পুরানো একটা আশা পূরণ হলো আজ–এসপিওনাজ জগতের প্রবাদ পুরুষ মাসুদ রানার সঙ্গে পরিচিত হলাম। কাজের কথা পরে, আগে বলুন আপনাকে কিভাবে আপ্যায়ন করতে পারি?'

'প্রশংসা করে আপনি আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন,' বলল রানা, হ্যাটটা মাথা থেকে নামিয়ে হাতে রাখল। 'সিআইএ-তে আমার অনেক বন্ধু আছে, তারা হয়তো আপনাকে চিনবে। আপনি কত সালে অবসর নিয়েছেন?'

'অবসর নিয়েছি দু'বছর হলো,' বললেন কর্নেল হিথ। 'তারপর থেকে এই সিকিউরিটি সার্ভিস বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমাকে আপনি চেনেন না বা আমার নাম শোনেননি, তার কারণ চাকরির শেষ কয়েক বছর ক্যামোফ্লেজ নিয়ে নমপেনের আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম। তবে আপনার সুখ্যাতি ঠিকই আমার কানে এসেছে।'

'এবার কাজের কথা হোক,' প্রসঙ্গ বদলে বলল রানা। 'ডিউটিতে আছি, কাজেই আপ্যায়নের জন্যে ব্যস্ত হতে নিষেধ করব আপনাকে। কাল রাতে একটা ঘটনা ঘটেছে। সে-ব্যাপারেই অভিযোগ করতে এসেছি আমি।'

'অভিযোগ?' গম্ভীর হয়ে গেলেন কর্নেল হিথ। 'গ্রীন ব্রিগেডের বিরুদ্ধে?' এক নিঃশ্বাসে কথা বলছেন। 'গুরুতর?'

'হ্যাঁ, অত্যন্ত গুরুতর।'

'প্লীজ, সব কথা আমাকে খুলে বলুন, মি. রানা,' ডেস্কের ওপর কনুই রেখে রানার দিকে ঝুঁকলেন কর্নেল–দারুণ উদ্বিগ্ন।

'গোর্কি স্ট্রীটে একটা মেয়েকে একদল গুণ্ডা...,' শুরু করল রানা। তিয়ানা ও লিমার পরিচয় প্রকাশ না করে ঘটনাটা বর্ণনা করতে এক মিনিটও লাগল না ওর।

ও থামতে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল হিথ। 'সরাসরি আপনি আমার কাছে এসেছেন, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা। ওরা গোর্কি স্ট্রীটের মোড়ে ডিউটি দিচ্ছিল? গ্রীন ব্রিগেড অফিসারের নম্বরটা আরেকবার বলুন তো, প্লীজ।'

'থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন।'

কর্নেল বসলেন না, দাঁড়িয়ে থেকেই ফোনের ক্রেড্‌ল থেকে রিসিভার তুলে একটা মাত্র নম্বর ঘোরালেন, বললেন, 'মেজর সোডো? এখুনি একবার আমার চেম্বারে এসো। জরুরী।'

'আপনি বসুন,' রানার তরফ থেকে এ স্রেফ সৌজন্য দেখিয়ে বলা।

'দশটা দশে অফিসারদের সঙ্গে মীটিঙে বসতে হবে আমাকে,' বললেন কর্নেল। 'তবে আপনার অভিযোগের সুরাহা করাটা আমার প্রথম দায়িত্ব। মীটিংটাও এই একই বিষয়ে–গ্রীন ব্রিগেডের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে এ-ধরনের অভিযোগ আজকাল প্রায়ই আসছে, ক্রিমিনালদের নাকি সাহায্য করছে ওরা।'

অপেক্ষা চলছে। কামরার চারদিকে চোখ বোলাল রানা। দুই কোণে পাতাবাহারের গাছ রয়েছে, পাতার ফাঁকে চকচকে ভাব দেখে রানা আন্দাজ করল ওগুলো লুকিয়ে রাখা ক্যামেরার লেন্স হতে পারে।

মি. সোডো একজন শ্বেতাঙ্গ, সম্ভবত পর্তুগীজই হবে। হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে ভেতরে ঢুকল।

'ইনি মাসুদ রানা, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স,' দ্রুত বলে গেলেন কর্নেল হিথ, সংক্ষেপে রানার অভিযোগ ব্যাখ্যা করলেন।

মোবাইল ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলল সোডো। সেট অফ করে মাথা নাড়ল। 'গোর্কি স্ট্রীটে কাল রাতে যাদের ডিউটি ছিল তাদের সিরিয়াল নম্বর শুরু হয়েছে থ্রী-বি দিয়ে নয়, সিক্স-সি দিয়ে।' রানার দিকে তাকাল। 'আপনার নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে, মি. রানা।'

'গোর্কি স্ট্রীটেই মেয়েটাকে টয়োটায় তোলার চেষ্টা করছিল গুণ্ডারা,' বলল রানা। 'আর গ্রীন ব্রিগেডের সদস্য দু'জন মাতাল লোকটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মোড় থেকে কয়েক গজ পিছনে, ওই রাস্তাটার নাম ঠিক মনে পড়ছে না–কুইভির স্ট্রীট?'

আবার মোবাইলে কথা বলল সোডো। সেট অফ করে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। কাল রাতে ওখানে ডিউটি দিচ্ছিল থ্রী-বি সেভেনফাইভসেভেন আর থ্রী-বি/টুওয়ানটু।'

'ওরা এখন যেখানেই থাকুক, আধ ঘণ্টার মধ্যে এই চেম্বারে ওদেরকে আমি দেখতে চাই,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল হিথ।

'ইয়েস, স্যার,' বলে মোবাইল কানে তুলল সোডো।

'মি. রানার কাছ থেকে টয়োটা আর নিসান পেট্রলের নম্বর জেনে নিন,' বললেন হিথ। 'খোঁজ নিন কাদের নামে রেজিস্ট্রেশন। নাম্বার প্লেট ভুয়া হতে পারে, কিংবা রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করা হতে পারে। আপনি বরং একটা ইমার্জেন্সী টীমকে দায়িত্ব দিন, বলুন সমস্ত তথ্য এক ঘণ্টার মধ্যে চাই আমি।'

'ইয়েস, স্যার,' বলে রানার দিকে তাকাল মেজর সোডো।

ডেস্ক থেকে প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে গাড়ি দুটোর নম্বর লিখে দিল রানা।

'আমাকে ক্ষমা করতে হবে,' হাতঘড়ি দেখে রানাকে বললেন হিথ। 'মীটিং

শুরু হতে আর এক মিনিট বাকি।' টেলিফোন ক্রেডলের গায়ে লাল একটা বোতাম, তাতে আঙুল ছোঁয়ালেন। 'আপনার যদি কিছু দরকার হয়, এটা টিপলেই লোক চলে আসবে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। সামান্য অন্যমনস্ক ও, কেন যেন মনে হচ্ছে এখানে আসার পর থেকে যা কিছু ঘটছে সবই যেন দেইজ্যা ভু–অর্থাৎ ঠিক এই ঘটনাই যেন আগেও একবার ঘটেছে।

'এক্সকিউজ মি,' বলে সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকলেন কর্নেল।

সোডো মোবাইলে একের পর এক নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে।

আধ মিনিট পর তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছতে মুছতে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এলেন কর্নেল। এখন তাঁর ইউনিফর্মের আস্তিন বেশ কিছুটা গুটানো। রানার অন্যমনস্ক ভাব এখনও কাটেনি, তবু মনে হলো কি যেন একটা দেখতে পেয়েও সেটার গুরুত্ব ধরতে পারছে না।

আরেকবার ক্ষমা চেয়ে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন কর্নেল হিথ। দু'মিনিট পর 'এক্সকিউজ মি' বলে সোডোও কানে মোবাইল চেপে ধরে দরজার দিকে এগোল।

চেম্বারে একা হয়ে গেল রানা।

পনেরো মিনিট পর সোডো ফিরে এল, বলল, 'আপনার অভিযোগ সত্যি, মি. রানা। গ্রীন ব্রিগেডের কমান্ডো টীম দেখে বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন আর থ্রী-বি/টুওয়ানটু। ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'গাড়ি দুটো সম্পর্কে কিছু জানা গেল? আর গুণ্ডাদের সম্পর্কে? ওরা মেয়েটার সঙ্গীকে আটকে রেখেছে।'

'চারদিকে টীম পাঠানো হয়েছে, মি. রানা,' বলল সোডো। 'আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত তথ্য পেয়ে যাব।' আবার কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

আরও পনেরো মিনিট একা বসে থাকল রানা। তারপর সোডোর সঙ্গে কর্নেল হিথও ফিরে এলেন। ওদের পিছু নিয়ে ঢুকল কমান্ডো টীম–দশজনের সশস্ত্র একটা দল, গ্রীন ব্রিগেডের দু'জন সদস্যকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে এনেছে। ওদের দু'জনকে দেখেই রানা চিনতে পারল–থ্রী-বি/সেভেনফাইভসেভেন আর সেই থ্রী-বি/টুওয়ানটু। কর্নেলের প্রশ্নবোধক দৃষ্টির উত্তরে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ, এরাই।'

'মেজর সোডো, তুমি আর উনো ওয়াং ইন্টারোগেট করো ওদের,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল। 'এখানে নয়, ইন্টারোগেশন সেলে। তথ্য না পেলে নাড়িভুঁড়ি সব বের করে আনবে। পদ্ধতিটা তোমাদের জানা আছে, প্রয়োজনে টরচারের প্রতিটি কোর্স কমপ্লিট করবে, শুধু খেয়াল রাখবে যেন মারা না যায়। আমি তোমার রিপোর্ট পাবার অপেক্ষায় থাকলাম। যাও।'

কামরা থেকে সবাই বেরিয়ে যাবার পর নিজের চেয়ারে বসলেন কর্নেল। 'এটা কেমন কথা হলো, মি. রানা, ডিউটিতে আছেন বলে কিছুই নেবেন না!

লাঞ্চের সময় হতে আর কিন্তু বেশি দেরি নেই…'

রানা তাঁর কথার মাঝখানেই বলল, 'মেয়েটার সঙ্গী সম্পর্কে এখনও কিছু জানা গেল না, মি. হিথ।'

'সবগুলো টীম এখনও ফেরেনি, মি. রানা।' আশ্বাস দেয়ার ভঙ্গিতে একটু হাসলেন হিথ। 'আপনি কিন্তু আমাকে মেয়েটি বা তার সঙ্গীর নাম-পরিচয় দেননি।'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

টেলিফোন বেজে ওঠায় জবাব দেয়া হলো না, রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন কর্নেল হিথ। অপরপ্রান্তের কথা নিঃশব্দে শুনে গেলেন। তারপর রানাকে বললেন, 'দুটো গাড়িই রেন্ট-আ-কার থেকে ভাড়া করা হয়েছিল। যারা ভাড়া করেছিল তাদের দেয়া ঠিকানা ভুয়া। তবে চিন্তার কিছু নেই, ইন্টারোগেশন শেষ হলে সব তথ্যই পেয়ে যাব।' একটু থেমে বললেন, 'সত্যি আমি দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী, মি. রানা।'

'আপনি যেভাবে অ্যাকশন নিলেন, তাতে আমি খুশি,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, সরষেতে ভূত থাকেই। আমি তাহলে এখন আসি, কেমন? মি. সোডোকে আমার হোটেলের স্যুইট নম্বর দেয়া আছে, নতুন কোন তথ্য পেলে দয়া করে জানাতে বলবেন, প্লীজ। ছেলেটার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত আমি খুব চিন্তায় থাকব।'

'আপনি উঠতে চাইছেন?' বিস্মিত দেখাল কর্নেলকে। তারপর হেসে উঠে বললেন, 'আপনাকে আরও একটা সুখবর দেয়া থেকে আমাকে আপনি বঞ্চিত করতে চান? না, নাহ্—আপনাকে আরও একটু ধৈর্য ধরতে হবে, মি. রানা। যে-কোন মুহূর্তে আপনার প্রেমিকার ভাই সম্পর্কে রিপোর্ট পাব বলে আশা করছি আমি…'

'মেয়েটা আমার প্রেমিকা নয়,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'ছেলেটাও মেয়েটির ভাই নয়।'

'ওদের পরিচয় দেননি তো, তাই রসিকতা করার সুযোগটা ছাড়লাম না,' বলে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কর্নেল হিথ। 'সত্যি মেয়েটা আপনার প্রেমিকা নয়? তাহলে পুলিসের কাছে পরিচয় গোপন করার আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'পরিচয় গোপন করছি, এ-কথা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'আসলে জানানোর প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'মেয়েটা কি খুব সুন্দরী?' মিটিমিটি হাসছেন কর্নেল। 'চীনা, নাকি ইউরোপিয়ান?'

রানা কিছু বলতে যাবে, আবার টেলিফোন বেজে উঠল। পুরো এক মিনিট অপরপ্রান্তের কথা শুনলেন কর্নেল হিথ। শক্ত, কঠিন হয়ে উঠল লাল চেহারা। রিসিভার রেখে দিয়ে পাইপে আগুন ধরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, রানার দিকে যেন ইচ্ছে করেই তাকাচ্ছেন না।

'নতুন কোন তথ্য?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

পাইপ ধরানো শেষ করে ওর দিকে তাকালেন হিথ। 'মেয়েটার নাম কি লিমা? জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, এক লোককে পরিত্যক্ত একটা ওয়্যারহাউসে পাওয়া গেছে–সবগুলো নখ উপড়ানো, একটা চোখে গরম লোহার রড ঢোকানো হয়েছে, দুই পা আর পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভাঙা, হাসপাতালে নিয়ে যাবার পথে মারা গেছে। নিজের নাম বলেছে তিয়ানা।'

'ওহ্ গড!' বিড়বিড় করল রানা।

'মারা যাবার আগে তিয়ানা লিমা নামে একটা মেয়ে, একটা লঞ্চ আর এক হাজার মণ সোনা সম্পর্কে প্রলাপ বকেছে বলে জানিয়েছে পুলিস। মি. রানা, এ-সব বিষয়ে আপনি কিছু জানেন?'

রানা মাথা নাড়ল। এই সময় আবার টেলিফোন।

এবার রিসিভার তুলে কর্নেল বললেন, 'গভর্নর হাউস থেকে? হ্যাঁ, আমি কর্নেল ম্যাট হিথ বলছি।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে রানার দিকে তাকালেন। 'গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন আমার সঙ্গে কথা বলবেন।' রিসিভার থেকে হাত সরালেন। 'স্যার, আপনি?' এরপর শুধু শুনেই গেলেন। মাঝে মধ্যে 'হুঁ-হ্যাঁ, আচ্ছা, ওহ্ গড' ইত্যাদি করছেন। সবশেষে বললেন, 'ঠিক আছে, স্যার। কথা দিচ্ছি, আমাদের সাধ্যমত সব কিছুই করা হবে। ধন্যবাদ, গভর্নর, স্যার। জ্বী, উনি আমার সামনেই বসে আছেন। সন্দেহ নেই, এটা তাঁর জন্যে খুব বড় একটা আঘাত।'

উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় চেয়ারের কিনারায় সরে এসেছে রানা। 'কি ব্যাপার, বলুন তো?'

'আপনার জন্যে অত্যন্ত খারাপ একটা খবর,' রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন ম্যাট হিথ। 'মি. রানা, সত্যি আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

'কি খারাপ খবর?' একা শুধু লিমার কথা নয়, মিসেস পাটনায়েক আর তাঁর দেহরক্ষীদের কথাও ভাবছে রানা–ওদের কোন বিপদ হলো না তো?

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ডায়াল করলেন হিথ। 'মেজর সোডোকে লাইন দাও, ইন্টারোগেশন সেলে আছে সে।' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন। 'সোডো? মন দিয়ে শোনো। গভর্নর নিজে ফোন করেছিলেন। সুচেতা বিউটি পার্লারের মালিক সুচেতা পাটনায়েক ওনার বিশেষ পরিচিত। পরিচিত মানে, রীতিমত ঘনিষ্ঠতা আছে। আধ ঘণ্টা আগে ওই বিউটি পার্লার থেকে লিমা নামে একটা কম্বোডিয়ান তরুণীকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। সন্দেহ করছি, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের কাজ। মিসেস সুচেতার তিনজন বডিগার্ডই আহত হয়েছে, অরোরা নামে একজন সম্ভবত বাঁচবেই না। গ্রীন বিগ্রেডের সবার ছুটি বাতিল করে দাও। শহরের সব জায়গায় অতিরিক্ত টীম পাঠাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে...,' একের পর এক আরও কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

রানাকে তাঁর নতুন করে কিছু জানাবার নেই, টেলিফোনের আলাপ থেকে সবই শুনেছে ও। চেয়ার ছেড়ে কার্পেটে পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল। ক্রোধে লাল চেহারাটা বাঘের মত লাগছে।

এক চুল নড়ছে না, চেয়ারে রানা যেন জমে গেছে।

'মি. রানা, জানি না আমার পরামর্শ আপনি কিভাবে নেবেন,' পায়চারি থামিয়ে হঠাৎ বললেন কর্নেল হিথ, 'তবে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, আমি আপনার ভাল চাই।'

হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'কি পরামর্শ, কর্নেল?'

'শুনতে আপনার ভাল লাগবে না,' বললেন হিথ। 'তবু কথাটা আপনাকে আমি না বললে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা হবে। মি. রানা, মিস লিমার ব্যাপারে নিজেকে আপনি জড়াবেন না। প্লীজ।'

'কেন?' তীক্ষ্ণ হলো রানার গলা।

'তিয়ানাকে খুন আর লিমাকে কিডন্যাপ করার জন্যে দায়ী ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড, মি. রানা।' আবার পায়চারি শুরু করলেন কর্নেল। 'আপনাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি, ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে দমন করা আমার গ্রীন ব্রিগেডের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের সঙ্গে আপোস করেই চলতে হয় আমাদের।'

'এ আপনি কি শোনাচ্ছেন!' প্রতিবাদ করল রানা। 'তাহলে যে লোকে বলে আপনি ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তা মিথ্যে?'

'জনসাধারণকে অভয় দেয়ার জন্যে অনেক কথাই বলতে হয় আমাদের, মি. রানা। সব সত্যি কথা প্রকাশ পেলে এই সমাজে টিকে থাকা যাবে না।'

'আপনি আপোস করতে পারেন, কিন্তু আমাকে আপনি কোন যুক্তিতে এত বড় একটা ক্রাইম মেনে নিতে বলছেন?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'একদল গুণ্ডার হাত থেকে লিমাকে আমি উদ্ধার করেছি। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না থাকলেও, তার প্রতি আমার একটা দায়িত্ববোধ জন্মেছে। অথচ আপনি আমাকে পরামর্শ দিচ্ছেন তার কথা ভুলে যেতে। হাউ অ্যাবসার্ড!'

'আপনি কিছু করতে চাইলেই কি করতে পারবেন, মি. রানা?' রানার মুখোমুখি থেমে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হিথ। 'আমার বিবেচনায়, আপনি নন, একমাত্র মিস লিমাই নিজেকে সাহায্য করতে পারেন।'

'মানে?'

'আমার ধারণা, মিস লিমা যদি ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, ওরা তাঁকে নিশ্চয়ই খুন করবে না।'

স্থির হয়ে গেল রানা। কর্নেল ম্যাট হিথ, বেসরকারী পুলিস গ্রীন ব্রিগেড-এর কর্ণধার, প্রকারান্তরে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের পক্ষে ওকালতি করছে!

'আপনাকে আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করে দেখতে বলি। দেখুন, কোনও প্ল্যান তৈরি করতে পারেন কিনা।'

'অর্থাৎ আপনি আমাকে প্রস্তাব দিচ্ছেন, আমি যাতে লিমাকে রাজি করাই সে যেন ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে সহযোগিতা করে?'

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, তার মনের কথা রানা ধরতে পারায় ম্যাট হিথ যেন খুশি হয়েছে। তবে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'আপনাকে আমি বলেছি যে চাকরির শেষ কয়েকটা বছর নমপেনের

আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম আমি। যোগাযোগটা এখনও আছে, মি. রানা। নমপেন, অর্থাৎ কম্বোডিয়ার বিভিন্ন সূত্র থেকে আমার কাছে খবর আসছে। মিস লিমার বাবা ছিলেন পুরোহিত নগুয়েন গুনো। উপকূল এলাকার বিশাল জলাভূমির কয়েকশো প্যাগোডার সোনা আর মূল্যবান পাথর পুরোহিতরা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখেন। খেমাররুজ গেরিলারা ধাওয়া করায় ওই সোনা আর পাথর নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন নগুয়েন গুনো। জলাভূমির কোথাও লঞ্চটা ডুবে যায়। এ-খবর আন্ডারগ্রাউন্ডের অনেকেই জানে, মি. রানা। এখন ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডও জানে। শুধু একটা তথ্য কেউ জানে না। সেটা হলো, লঞ্চটা কোথায় ডুবেছে। আমি কি বলছি, বুঝতে পারছেন কি?'

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত রেড ড্রাগনের উল্কি ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। উল্কিটা দেখেছে ও! দেখেছে এই কামরাতেই। সেই সঙ্গে আরও একটা রহস্যের সমাধান মিলল। এই চেম্বারে ঢোকার পর থেকে বারবার মনে হয়েছে ওর, এখানে যা কিছু ঘটছে সবই যেন আগেও একবার ঘটেছে। এরকম মনে হবার কারণ, অনায়াসে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া থেকে শুরু করে মন দিয়ে ওর অভিযোগ শোনা, শোনা মাত্র দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাদি প্রতিটি ঘটনাই আসলে সাজানো নাটক। সাজানো বলেই পরিচিত লাগছিল। আর এখন তো পরিষ্কারই মনে পড়ছে রানার, তোয়ালে দিয়ে মুখ-হাত মুছতে মুছতে টয়লেট থেকে যখন বেরুল কর্নেল, তার খয়েরি-সবুজ শার্টের আস্তিন বেশ কিছুটা গুটানো ছিল। বাহুর উল্কির সিকি ভাগ তখনই দেখেছে ও, অন্যমনস্ক ছিল বলে গুরুত্বটা মস্তিষ্কে ধরা দেয়নি।

কী সর্বনাশ! তাহলে কর্নেল ম্যাট হিথই আসলে রেড ড্রাগন! এর খোঁজেই ম্যাকাওয়ে এসেছে ও!

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠারও আগে রানার মাথায় যে প্রশ্নটা জাগল, এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারবে তো?

কর্নেল হিথ থামেনি, এখনও নিজের কথা বলে যাচ্ছে, '...আমাদেরকে সতর্ক করা হয়নি, হলে মিস লিমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে পারতাম। তবে আপনার নিরাপত্তার দিকটা অবশ্যই আমরা দেখব। যতদিন আপনি ম্যাকাওয়ে আছেন, গ্রীন ব্রিগেডের স্পেশাল একটা টীম সারাক্ষণ আপনাকে ছায়ার মত ঘিরে রাখবে, এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'আমার কোন চিন্তা হচ্ছে না, বডিগার্ড দরকার নেই, মি. হিথ। আপনার লোকদের বলে দিন ওরা যেন আমার পিছু না নেয়।'

'এ আপনার বিনয়, বুঝতে পারছি,' হেসে উঠে বলল কর্নেল। 'আপনি নিষেধ করলেও ওরা ওদের কর্তব্য পালন করবে।' রানার দিকে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সে।

সেটা দেখতে না পাবার ভান করে দরজার দিকে এগোল রানা।

মুচকি হেসে পিছন থেকে কর্নেল বলল, 'মিস লিমাকে বাঁচানোর কোন প্ল্যান যদি মাথায় আসে, অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, প্লীজ, মি. রানা।

আমি আপনার টেলিফোনের অপেক্ষায় থাকব।'

জবাব না দিয়ে চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। রিসেপশন-কাম-কমিউনিকেইশন রূমে অনেকেই রয়েছে, তারা কেউ ওর দিকে তাকাল না। বিনা বাধায় করিডরে বেরিয়ে এল ও। দু'জন সশস্ত্র গার্ড দরজার দু'পাশে আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। অতিরিক্ত একজন গার্ড, যার সঙ্গে টপফ্লোরে উঠেছিল রানা, এলিভেটরের দিকে যাবার পথে সে-ই ওর পিছু নিল।

কারও সঙ্গে কোন কথা হলো না, এলিভেটর থেকে নেমে করিডর হয়ে বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল রানা। ট্যাক্সির জন্যে ফুটপাথে অপেক্ষা করছে, পাঁচ-সাত ফুট পিছনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল গার্ড। রাস্তার ওপারে একটা সবুজ জীপ দেখা গেল, ভেতরে গ্রীন ব্রিগেডের একটা টীম।

ট্যাক্সিকে অনুসরণ করল জীপটা।

তিন

ট্যাক্সি থামিয়ে একটা বুদ থেকে সুচেতার বিউটি পার্লারে ফোন করল রানা। সুচেতার বড় মেয়ে সুনেত্রা জানাল, প্রাথমিক চিকিৎসা পাবার পর ক্লিনিক থেকে মিং আর ঝাং ছাড়া পেয়েছে, এখন তাদেরকে সুস্থই বলা যায়। তবে অরোরার অবস্থা এখনও আশঙ্কামুক্ত নয়, তাই তার কাছে অর্থাৎ ক্লিনিকেই আছেন ওর মা। ক্লিনিকের নামটা জেনে নিয়ে ট্যাক্সিতে ফিরে এল রানা।

গ্রীন ব্রিগেডের আরও একটা জীপ দেখল রানা। ট্যাক্সিটাকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেলেছে।

অপারেশন করে অরোরার শরীর থেকে তিনটে বুলেট বের করা হয়েছে। দুটো বুলেট পেটে ঢুকছিল, একটা হাঁটুর ওপর উরুতে। এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। তবে সুচেতা জানালেন, ডাক্তাররা তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, এ যাত্রায় বেঁচে যাবে অরোরা।

ক্লিনিকের ওয়েটিং রূমে বসে কথা হলো। সুচেতা গর্ব করেই বলেছিলেন, ম্যাকাওয়ে এমন কেউ আছে নাকি যে তাঁর বাড়িতে ঢুকে একটা মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে? কথাটা স্মরণ করে রানার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তিনি। উত্তরে রানা বলল, 'আপনি শুধু শুধু নিজেকে দোষ দিচ্ছেন। আমিই বরং ভুল করেছি। আপনি দুই মেয়েকে নিয়ে একা থাকেন, অস্ত্র নেই, হরিচরণ দা নেই; আমারই বোকামি হয়েছে বিপদ হতে পারে জেনেও লিমাকে আপনার বাড়িতে তুলতে যাওয়াটা।'

'এভাবে কথা বললে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' সাবধান করে দিলেন সুচেতা। 'ম্যাকাওয়ে যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, সেটাকে অবশ্যই আমি নিজের বিপদ বলে গণ্য করব। গ্রীন ব্রিগেডের ডিরেক্টর কর্নেল ম্যাট হিথ কি বললেন তোমাকে? ওরা কারা, লিমাকে তুলে নিয়ে গেল? জানো,

প্রত্যেকের মুখে মুখোশ ছিল? গভর্নর আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রীন ব্রিগেড মেয়েটাকে উদ্ধার করবে···'

'গভর্নরের সঙ্গে আমাকে কথা বলতে হবে,' বলল রানা। 'আমার পরিচয় পেলে অবশ্যই দেখা করবেন উনি, তবে আপনি টেলিফোনে বলে দিলে ঝামেলা কম হবে, সময়ও বাঁচবে।'

'টেলিফোন করতে হবে কেন? চলো, তোমাকে নিয়ে সরাসরি গভর্নরের বাড়িতে উঠি। দেখবে, কেমন খাতির করে।'

'না,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গে আপনার প্রকাশ্যে আর দেখা না হওয়াই উচিত হবে।' গলা খাদে নামাল ও, 'শুনুন। আঁতকে উঠবেন না। ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড পরিচালনা করছে ম্যাট হিথ নিজে। সে-ই রেড ড্রাগন।' সুচেতার চোখ দুটো অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠল, লক্ষ করল রানা। 'লিমাকে তার লোকজনই আপনার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে।'

'এ-সব কি বলছ তুমি!' উত্তেজনায় ও উদ্বেগে হাঁপিয়ে উঠলেন সুচেতা।

'আস্তে! লিমা কম্বোডিয়ান প্যাগোডার এক হাজার মণ সোনার হদিশ জানে। একটা লঞ্চে ছিল, লঞ্চটা ডুবে গেছে জলায়। রেড ড্রাগন ওই সোনা পাবার আশায় লিমাকে কিডন্যাপ করেছে। শুধু তাই নয়, এরই মধ্যে খুন করেছে লিমার সঙ্গী তিয়ানা নামে তরুণ এক পুরোহিতকে। ম্যাট হিথ চাইছে লিমাকে যেন আমি ট্রাইয়্যাডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি করাই। বলছে, তা না হলে লিমাকে খুন করবে ট্রাইয়্যাড। আমাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে ওরা, ক্লিনিকের বাইরে দুটো জীপে অন্তত পনেরোজন গ্রীন ব্রিগেড পুলিস পাহারা দিচ্ছে।'

গোটা ব্যাপারটা হজম করতে আধ মিনিট সময় নিলেন সুচেতা। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'এ তো দেখছি ভয়ানক অবস্থা, রানা! ওহ্ গড, তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।'

'আমি নিজের কথা ভাবছি না,' বলল রানা। 'ভাবছি লিমার কথা। ওকে যেভাবে হোক বাঁচাতে হবে। তিয়ানা সোনার হদিশ দেয়নি, সেজন্যেই টরচার করে মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। লিমাও নিশ্চই মুখ খুলছে না। খুললে আমার সাহায্য চাইত না হিথ। এখন প্রশ্ন হলো, গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন কতটা ক্লিন? তাঁকে কি আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি?'

'তা পারি,' মুহূর্তের দ্বিধা কাটিয়ে উঠে বললেন সুচেতা। 'গভর্নরের স্ত্রী আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। শোনো, রানা, গভর্নরের সঙ্গে তুমি কথা বলার সময় আমারও থাকা দরকার···'

'না।' রানা অটল। 'আমার সঙ্গে আপনি থাকলে আপনার ওপর খেপে যাবে রেড ড্রাগন। যা করার একা আমাকেই করতে দিন।'

'ফের সেই কথা? দেখো রানা, হরিচরণ বলে গেছে তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ সে। নিশ্চয়ই এমন কোন উপকার করেছিলে, যার কথা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভোলেনি। এখন বিপদের সময় তুমি যদি আমার সাহায্য না নাও, তার আত্মাকে কষ্ট দেয়া হবে···'

'সাহায্য নেব না তা তো বলিনি,' বাধা দিল রানা। 'এই যে আপনি গভর্নরকে ফোন করবেন, এটা সাহায্য নয়?'

ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্সি নিল রানা। জীপ দুটো এবারও ওর ট্যাক্সিকে স্যান্ডউইচ বানিয়ে রাখল।

লাল-সাদা গভর্নর হাউসটা পর্তুগীজ স্থাপত্য ও নির্মাণ শৈলীর সাক্ষ্য বহন করছে। ভবনটা প্রাচীন হলেও নতুনের মত ঝকঝকে। কালো, খাকি ও ছাই রঙা ইউনিফর্ম পরা সরকারী পুলিস পাহারা দিচ্ছে গেটে। গ্রীন ব্রিগেডকে আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব দেয়ার পর এদেরকে রাখা হয়েছে স্রেফ প্রতীক হিসেবে, সংখ্যা কমিয়ে কেড়ে নেয়া হয়েছে বেশিরভাগ ক্ষমতা। সরকারী কিছু প্রতিষ্ঠান পাহারা দেয়া ছাড়া অন্য কোন কাজে রাখা হয়নি।

গেটে পৌঁছতেই বোঝা গেল সুচেতা ফোন করেছিলেন, আর তাতে কাজও হয়েছে। বেশ খাতির করেই গভর্নর হাউসের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। ওয়েটিং রূমে ওকে অভ্যর্থনা জানাল গভর্নরের একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি। রানার জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, গভর্নর লাঞ্চে গেছেন, আশা করা যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবেন।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে শুনে দমে গেল রানা। তবে রাস্তায় ট্যাক্সি থামিয়ে একটা রেস্তোরাঁ থেকে লাঞ্চ সেরে এসেছে, হাতে জরুরী কোন কাজও নেই, অগত্যা অপেক্ষা করারই সিদ্ধান্ত নিল ও।

আধ ঘণ্টা পর হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন গভর্নর হাউসের কর্মকর্তারা। ভেতরের কামরায় এক সঙ্গে কয়েকটা টেলিফোন বাজছে। কয়েকজন অফিসার কেরানিদের কাছে পুরানো ফাইল চাইছে। তারপর একটা হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল গভর্নর হাউসের মস্ত ফাঁকা উঠানের মাঝখানে হেলিপ্যাডের ওপর। এক গাদা ফাইল নিয়ে সেদিকে ছুটলেন কর্মকর্তারা। তাঁদের নিয়ে সেক্রেটারি মেয়েটাও যাচ্ছিল, সোফা ছেড়ে তাকে ডাকল রানা। 'কি ঘটছে বলুন তো?'

'ওহ্, গড!' বিব্রত ভঙ্গিতে রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেয়েটা। 'এত ব্যস্ততার মধ্যে আপনার কথা তো আমরা ভুলেই গেছি! সত্যি দুঃখিত, মি. রানা।'

'দুঃখিত…কেন?' রানা কিছুই বুঝতে পারছে না।

'গভর্নরকে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে হংকং যেতে হচ্ছে,' বলল সেক্রেটারি। 'দেখছেন না, আমরা তাঁর হেলিকপ্টারে ফাইল-পত্র তুলছি। হংকঙের গভর্নর ক্রিস প্যাটন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, নতুন কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি হতে যাচ্ছে…'

'গভর্নর ফিরবেন কখন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল চীনা সেক্রেটারি। 'তা তো বলা যাচ্ছে না, মি. রানা। সত্যি দুঃখিত, স্যার। আপনাকে পরে একদিন আসতে হবে…'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ক্রেডলের দিকে তাকিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেল তরুণী। খোলা দরজা দিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে তাকাল একবার। কর্মকর্তারা তার জন্যে অপেক্ষা করছে

ওদিকে। তারপর, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, এগিয়ে এসে ফোনের রিসিভারটা তুলল সে। 'হ্যালো?' অপরপ্রান্তের কথা শুনে রানার দিকে তাকাল। 'আপনার ফোন,' অবাক হয়েছে, সেটা চেহারায় প্রকাশও পেল। রানার হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত ঘুরে বেরিয়ে গেল ওয়েটিং রুম থেকে।

'হ্যালো? কে, সুচেতা?' জিজ্ঞেস কলল রানা।

'ভদ্রমহিলা বিধবা মানুষ, অসহায়, দুই যুবতী মেয়েকে নিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন করছেন, তাঁর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ না রাখাই তো ভাল–অন্তত আপনি যদি তার ভাল চান। হ্যালো, মি. রানা? চিনতে পারছেন আমাকে?'

রানা কিছু বলছে না।

'বুঝেছি, আমার ওপর আপনি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমি সত্যি আপনাদের ভাল চাই। মি. রানা, আপনি কি মিস লিমা সম্পর্কে এখনও ইন্টারেস্টেড?'

রানা চুপ করে আছে।

'মি. রানা, আমাকে ভুল বুঝবেন না, প্লীজ। গ্রীন ব্রিগেডের ডিরেক্টর হিসেবে আমার দায়িত্ব আপনাদের সাহায্য করা। বিশ্বাস করুন, ঠিক সে চেষ্টাই করছি আমি। আন্ডারগ্রাউন্ডের সঙ্গে গ্রীন ব্রিগেডের কানেকশন আছে, আপনার তা জানার কথা। ইচ্ছে করলে আমরা আপনার সঙ্গে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে আপনার ওপর। আপনি যদি চান, রেড ড্রাগনের সঙ্গেও সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

প্রচণ্ড রাগে দাঁতে দাঁত চাপা ছাড়া এই মুহূর্তে রানার কিছু করার নেই।

'ম্যাকাও ট্র্যাইয়্যাড, রেড ড্রাগন, মিস লিমাকে ছেড়েও দিতে পারে, মি. রানা,' আবার কথা বলছে ম্যাট হিথ। 'আমি জানি, আপনাকে তারা একটাই শর্ত দেবে–মিস লিমাকে আপনি সোনার হদিশ প্রকাশ করতে রাজি করাবেন।'

ঠকাস করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল রানা।

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, আবার রিঙ হলো। ওয়েটিং রুম ফাঁকা, রিঙ শুনে ভেতর থেকেও কেউ আসছে না। দরজা দিয়ে হেলিপ্যাডের দিকে তাকাল রানা, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি একটা বিষয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলছে অফিসাররা। ফিরে এসে রিসিভার তুলল ও।

'রানা?' ম্যাট হিথের গলা, তবে সম্বোধন পাল্টে গেছে। 'সাড়া দিচ্ছ না, তারমানে তুমিই। শোনো, কয়েকটা পরামর্শ দিই তোমাকে। ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফিরো না, কেমন? এই মাত্র খবর পেলাম ওখানে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড তোমার জন্যে একটা মারাত্মক ফাঁদ পেতে রেখেছে। তিয়ানার লাশটা, বুঝলে! ওটা ওরা তোমার হোটেল স্যুইটে রেখে এসেছে। শুধু তাই নয়, লাশটা যে ওখানে আছে সে-খবরটা আবার ফোনে গ্রীন ব্রিগেডকে জানিয়েও দিয়েছে। এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না?'

রিসিভার ধরা হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে, রানা কথা বলছে না।

'আইন তার নিজস্ব পথে চলবে, তাই না?' বলে গলা ছেড়ে হেসে উঠল কর্নেল হিথ। 'একজন ট্যুরিস্টের হোটেল কামরায় লাশ পাওয়া গেছে, সে আবার একজন এসপিওনাজ এজেন্ট, স্বভাবতই গ্রীন ব্রিগেড তাকে দেখামাত্র গ্রেফতার

করবে। খুনের অভিযোগ আছে এমন কেউ যদি গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করে, তাকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হবে ওদেরকে।'

ক্রেডলে নয়, ডেস্কের ওপর রিসিভার নামিয়ে রেখে ছুটল রানা। কি করবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। বাইরে বেরুলে গ্রীন ব্রিগেড ধাওয়া করবে ওকে, গুলিও করতে পারে। ম্যাকাও ছোট্ট শহর, মাত্র বিশ বর্গমাইল, ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কতক্ষণই বা টিকতে পারবে ও। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা জীপ দুটোকে ফাঁকি দেয়ার এটাই একমাত্র উপায়।

তরুণী সেক্রেটারি পিছিয়ে এসে একা দাঁড়িয়ে আছে হেলিকপ্টারের কাছাকাছি, বাকি পাঁচজন অফিসার লাইন দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। তরুণীকে পাশ কাটিয়ে লাফ দিল রানা, ও-ও ঢুকে পড়ল হেলিকপ্টারের ভেতর। ভোজবাজির মত ওর হাতে একটা রিভলভার বেরিয়ে এসেছে। 'নামুন! নেমে যান সবাই!' খোলা দরজার বাইরে ফাঁকা একটা গুলি করল ও। 'জলদি!' রোটরের আওয়াজে গুলির শব্দ ভোঁতা শোনালেও কাজ হলো তাতে।

হেলিকপ্টারের ভেতর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, কে কার আগে নামতে পারে তারই প্রতিযোগিতা চলছে। পাইলট সীট ছাড়তে যাচ্ছে দেখে তার মাথায় রিভলভার ধরল রানা। 'খবরদার, নড়বে না!'

আরোহীরা নেমে যেতেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল রানা। পাইলটকে বলল, 'জানের মায়া থাকলে আমার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলো।'

চীনা পাইলট বোকার মত মাথা ঝাঁকাল।

'টেক-অফ করো!' নির্দেশ দিল রানা। 'গভর্নরের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।'

'গভর্নরের কাছে?' আকাশ থেকে পড়ল পাইলট। 'তিনি তো অন্য একটা হেলিকপ্টার নিয়ে আগেই হংকঙের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছেন। আমাকে পাঠানো হয়েছে ফাইল আর অফিসারদের নিয়ে যাবার জন্যে।'

'কোথায়?'

'কোথায় মানে? হংকঙে!'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা। 'ঠিক আছে, আগে তুমি টেক-অফ করো, তারপর বলছি কোথায় যেতে হবে।'

'স্যার, আপনি কে আমি জানি না,' বলল পাইলট। 'তবে কাজটা ভাল করছেন না। আমার বা কপ্টারের কোন ক্ষতি হলে ওরা আপনাকে...'

'কথা নয়!' গর্জে উঠল রানা। কিন্তু ওর গর্জনকে ম্লান করে দিল দরজার গায়ে ঘুসির শব্দ।

ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাতেই মিসেস পাটনায়েককে দেখতে পেল রানা, ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে দমাদম ঘুসি মারছেন দরজায়। সেটা খুলে দিতেই মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করলেন।

'আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা, দরজা আগলে রেখেছে।

'আগে ব্যাখ্যা করো তোমার এই পাগলামির মানে কি?' ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছেন সুচেতা। 'তুমি সরকারী হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করছ কোন বুদ্ধিতে?'

'আপনি চলে যান, প্লীজ!' তাগাদা দিল রানা। 'আমার সঙ্গে থাকলে আপনার বিপদ হবে।'

'বিপদ হতে পারে জেনেই এসেছি। ওরা ফোন করে আমাকে বলেছে, আমি যেন তোমাকে আশ্রয় না দিই। তারপরই কেটে দিয়েছে লাইন, মানে ফোনটাই অকেজো করে দিয়েছে। বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে গ্রীন ব্রিগেডের একটা জীপ। ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ছুটে এসেছি আমি, ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমার কোন বিপদ হয়েছে...'

'কাজটা আপনি ভাল করেননি, সুচেতা,' বলল রানা, গম্ভীর। 'মেয়ে দুটোর কথাও ভাবলেন না একবার?'

'তুমি সরো, রানা, আমাকে ভেতরে ঢুকতে দাও।' কিন্তু রানা নড়ল না। শোনো। সুনেত্রা আর সুমিত্রাকে আমি গভর্নরের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি...' তারপর প্রায় ধাক্কা দিয়ে রানাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দরজা বন্ধ করে পাইলটের দিকে তাকাল রানা। 'এবার টেক-অফ করো। জলদি!'

সুচেতাকে নিয়ে যতটা সম্ভব হেলিকপ্টারের পিছন দিকে সরে এল রানা। 'গভর্নর লাঞ্চ খেতে গিয়ে হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেন, হংকঙে যাবেন। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। আমার ধারণা, নিশ্চয়ই তাঁর কোন দুর্বলতা আছে।'

'মানে?'

'রেড ড্রাগন পুতুলের মত নাচাচ্ছে তাঁকে,' বলল রানা। 'ব্ল্যাকমেইল করছে।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ও। গভর্নর হাউসের অনেক ওপরে উঠে এসেছে কপ্টার। সামনের রাস্তায় গ্রীন ব্রিগেডের জীপ দুটো স্থির। জীপের আরোহীরা জানে না হেলিকপ্টারে কারা আছে।

সুচেতার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'কি বলছ তুমি!'

'রেসকোর্সের দিকে চলো,' পাইলটকে নির্দেশ দিল রানা।

'রানা, আমি কি মেয়ে দুটোকে বিপদের মধ্যে রেখে এলাম?'

'বোধহয় ভালই করেছেন,' বলল রানা। 'বাড়িটা সরকারী পুলিস পাহারা দিচ্ছে, ওখানে গ্রীন ব্রিগেডের কোন ক্ষমতা খাটবে না।'

'গভর্নরের স্ত্রী আর মেয়েকে বিপদ সম্পর্কে আভাস দিয়েছি আমি,' নার্ভাস ভঙ্গিতে বললেন সুচেতা। 'ওঁরা আমাকে কথা দিয়েছেন, ওঁরা বেঁচে থাকতে আমার মেয়েদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না।'

'আপনি গ্রীন ব্রিগেডের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পার্লার থেকে বেরুলেন কিভাবে?'

'গোপন একটা টানেল আছে। পিছনের রাস্তার একটা বাড়ি হয়ে বেরুনো যায়। ওটা আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। প্রয়োজনে দু'জনেই আমরা ব্যবহার করি টানেলটা।' একটু থেমে বললেন আবার, 'তোমার প্ল্যানটা কি? কি করতে চাও?'

রানা চিন্তা করছে। হেলিকপ্টার হাইজ্যাক করেছে ঠিকই, কিন্তু গভর্নর হংকঙে চলে যাওয়ায় কি করবে বুঝতে পারছে না। ম্যাকাওয়ে নিরাপদ কোন জায়গা নেই যেখানে আশ্রয় নিতে পারবে। ফোন করে ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটা দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার।

ওর চিন্তায় বাধা দিলেন সুচেতা। 'আমার বাড়ি থেকে দূরে কোথাও হেলিকপ্টার নামাতে বলো পাইলটকে। অলিগলি হয়ে পাড়ায় পৌঁছাব, তারপর টানেল হয়ে বাড়িতে ঢুকব। তোমাকে ওখানে রেখে বেরিয়ে আসব আমি, তারপর সামনের গেট দিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকব–ওরা আমাকে একাই ঢুকতে দেখবে। বাড়ির ভেতর চোরা কুঠরি আছে, তোমাকে লুকিয়ে রাখা কোন সমস্যা নয়। ওরা যদি জিজ্ঞেস করে, বলব–হেলিকপ্টার থেকে নেমে বন্দরের দিকে চলে গেছ তুমি। যদি জিজ্ঞেস করে কোথায়, বলব জানি না।'

'না, তা হয় না...'

রানাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিলেন সুচেতা। 'হয়! তাই হবে। একদম চুপ!'

হিংস্র বাঘ হয়ে উঠেছে রানা, কিন্তু খাঁচায় বন্দী। ঘণ্টাগুলো কিভাবে পেরিয়ে যাচ্ছে, বলতে পারবে না প্রতিটি দুঃসংবাদ আরও অসহায় করে তুলছে ওকে। টানেল হয়ে রানাকে বাড়িতে নিয়ে আসেন সুচেতা, তারপর টানেল ধরেই আবার বেরিয়ে যান। বেরিয়ে সোজা গভর্নর হাউসে মেয়েদেরকে দেখতে গিয়েছিলেন; ফিরলেন দেড় ঘণ্টা পর, বিকেল সাড়ে তিনটের দিকে। সুনেত্রা আর সুমিত্রা ভালই আছে, আশা করা যায় ওখানে তারা নিরাপদেই থাকবে। কাগজ-পত্র সময়মত না পৌঁছানোয় হংকং থেকে ফিরে এসেছেন গভর্নর কোকো মিগুয়েল বেঞ্জামিন। তাঁর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ হয়েছে সুচেতার। পরিষ্কার করে কিছুই তিনি বলেননি, তবে সুচেতা বুঝতে পেরেছেন রানার সন্দেহই ঠিক–রেড ড্রাগন তাঁকে ব্ল্যাকমেইল করছে। গ্রীন ব্রিগেডের সঙ্গে তাঁর কি চুক্তি হয়েছে, পুরানো ফাইল বের করে সেটা তিনি সুচেতাকে দেখিয়েছেন। তাতে লেখা আছে, কোন ক্রিমিনালের বিরুদ্ধে অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলে তার পক্ষ নিয়ে গভর্নর বা অন্য কেউ গ্রীন ব্রিগেডের কাজে নাক গলাতে বা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। তারপর তিনি জানিয়েছেন, গ্রীন ব্রিগেডের হাতে যে-সব প্রমাণ আছে তা থেকে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে মাসুদ রানা তিয়ানা নামে একজন ট্যুরিস্টকে খুন করেছে। কাজেই তার পক্ষ নিয়ে তিনি ম্যাট হিথকে কোন সুপারিশ করতে পারবেন না। লিমাকে ম্যাট হিথ কিডন্যাপ করেছে, সুচেতার এই অভিযোগ তিনি বিশ্বাস করেননি।

সুচেতা আরও খবর এনেছেন। গ্রীন ব্রিগেড শহরের সমস্ত ক্যাসিনো আর হোটেল-রেস্তোরাঁয় রানার ফটো সাপ্লাই দিয়েছে, ছবিটা 'ওয়ান্টেড' লেখা একটা প্রচারপত্রে ছাপা। এই ছবি কোত্থেকে তারা যোগাড় করেছে সুচেতার কোন ধারণা নেই। প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, এই লোক খুনী ও বিপজ্জনক, সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, দেখামাত্র আটক করতে হবে, তারপর গ্রীন ব্রিগেডকে খবর দিতে হবে। পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দেয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

দুঃসংবাদের এখানেই শেষ নয়। শহরের প্রতিটি রাস্তায় গ্রীন ব্রিগেডের টহল জোরদার করা হয়েছে। বন্দর আর এয়ারপোর্টেও পাহারা দিচ্ছে ওরা। শুধু গ্রীন ব্রিগেড নয়, পুরস্কারের লোভে আন্ডারওয়ার্ল্ডের অনেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে

রানাকে।

সুচেতা রানাকে বললেন, 'শহরের যে অবস্থা, বাইরে তোমার বেরুনোই চলবে না।'

'মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে!' অন্ধকার গেস্টরুমে পায়চারি করছে রানা, ঘরের জানালা-দরজার পর্দা ফেলা। এই মাত্র চোরা কুঠরি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ও।

হাতব্যাগ খুলে একটা মোবাইল ফোন বের করে রানাকে দেখালেন সুচেতা। 'গভর্নরের স্ত্রী গোপনে এটা দিয়েছেন আমাকে। প্রয়োজনে তুমিও এটা ব্যবহার করতে পারবে।'

'তিনি জানেন আমি এখানে?'

মাথা নাড়লেন সুচেতা। 'না। আরও খবর আছে, রানা। ট্যাক্সি নিয়ে এখানে আসার পথে আমার পুরানো ও বিশ্বস্ত কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি। কিছু লোক গ্রীন ব্রিগেডের বিরুদ্ধে ভয়ানক খেপা, যদিও সংখ্যায় তারা খুব কম। এদের কেউ কেউ আন্ডারওয়ার্ল্ডেরই লোক...'

'আপনি তাদেরকে আমার কথা বলেছেন?' প্রায় আঁতকে উঠল রানা।

'মাথা খারাপ! উল্টো বরং ওদের কাছেই আমি তোমার সন্ধান জানতে চেয়েছি। সেই সূত্রেই কথা হলো। ওরা নিজেরাই প্রস্তাব দিল, প্রয়োজনে তারা তোমাকে সাহায্য করতে রাজি।'

'কারা তারা? নাম বলুন।'

'অন্তত একজনকে তুমি চিনবে,' বললেন সুচেতা। 'সেভেন স্টার ক্যাসিনোর জেমস হার্ডি। সে তোমাকে চেনে। তার ক্যাসিনোয় তুমি নাকি গিয়েছিলে; আভাসে জানতে চেয়েছিলে রেড ড্রাগনের কাছ থেকে হেরোইন কিনতে চাও, তার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করা যায়। লোকটা স্মাগলারও বটে, তবে তার মেয়েরা আমার পার্লারে নিয়মিত আসে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে বেশ ভাল সম্পর্ক।'

'জেমস হার্ডি স্মাগলার?'

'পুরানো পেশা ছাড়তে পারেনি,' ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন সুচেতা। 'মাসে তিন-চারবার ব্যাংকক থেকে হো চি মিন আসা-যাওয়া করে তার জাহাজ। তবে হেরোইন নয়, আর্মস স্মাগল করে সে। গ্রীন ব্রিগেডের ওপর তারও খুব রাগ। আভাসে এ-কথাও বলতে চাইল, তার সন্দেহ ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন। বলল, দেখা পেলে তোমাকে সে লুকিয়ে থাকার জায়গা দেবে, এমন কি তুমি যদি ম্যাট হিথের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাও, তোমাকে সে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্যও করবে।'

'কর্নেল হিথের ওপর কি কারণে রাগ তার?'

'ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে দমন করতে পারছে না, তাই। জুয়ায় তার যা লাভ হয়, অর্ধেকের বেশি নিয়ে যায় ট্রাইয়্যাড।'

'আর কার সঙ্গে আলাপ করেছেন?'

'মার্ক হেগেন আর কার্ল ডয়েস। হেগেন হরিচরণের ইনফর্মার ছিল। প্রকাণ্ড

একটা দৈত্য, কিন্তু শিশুর মত সরল চেহারা। কাউকে যদি পছন্দ হয়ে যায়, তার জন্যে জান দিতে এক পায়ে খাড়া। একটাই দোষ, মদ দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। আর ডয়েস বক্সার। পুরানো ট্রাইয়্যাডের আমলে ভালই ছিল সে, লড়াইয়ে জেতা টাকা থেকে চাঁদা দিতে হত না। কিন্তু ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড কাজ শুরু করার পর প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে বেচারা, কারণ জেতা টাকার অর্ধেকই কেড়ে নেয় ওরা। আরও একটা কারণে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের ওপর ভীষণ খেপা সে। একে তো স্বভাবটা রুক্ষ, অসম্ভব স্বাধীনচেতা...'

'আপনার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হলো?'

'ওর প্রেমিকা জেসিকা আমার কাছে কাজ শিখত,' বললেন সুচেতা। 'ডয়েস চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় জেসিকাকে কিডন্যাপ করে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড। এক হপ্তা পর তার লাশ পাওয়া যায় হারবার এলাকায়। রেপ করার পর খুন করা হয় মেয়েটাকে।'

রানা খেয়াল করল, সুচেতা হেগেন সম্পর্কে কোন তথ্য দেননি। 'হেগেনও কি ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের ওপর খেপা?'

'হ্যাঁ। তোমাকে বলা হয়নি, হেগেন একসময় নৌ-বাহিনীতে ছিল। পরে একটা স্টীমার কিনে পরিবহন ব্যবসা খুলেছিল। গ্রীন ব্রিগেড ওর লাইসেন্স কেড়ে নেয়, পরে স্টীমারটাও ডুবিয়ে দেয়।'

'কেন?'

'হেগেনের বক্তব্য: গ্রীন ব্রিগেড লোক মারফত তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল হেরোইন আমদানির কাজে তার স্টীমারটা ব্যবহার করতে দিতে হবে। নিজে মাতাল হলে কি হবে, ড্রাগসের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা হেগেনের, সে রাজি হয়নি।'

'এদের সঙ্গে কি ভেবে আপনি যোগাযোগ করতে গেলেন?'

'না, কিছু ভেবে কাজটা করিনি,' বললেন সুচেতা। 'ওরা আমার পরিচিত, তাই তোমার কথা কতটুকু জানে, জানলে কি ভাবছে এই সব বোঝার জন্যে যোগাযোগ করি।'

'কিন্তু ওরা আমার কোন কাজে আসবে না, সুচেতা।'

মিসেস পাটনায়েক চুপ করে থাকলেন।

'আপনি মনে হচ্ছে কিছু ভাবছেন,' কিছুক্ষণ পর বলল রানা।

'হ্যাঁ, ভাবছি,' বললেন সুচেতা। 'ভাবছি, শহরের কোথাও যখন তোমাকে খুঁজে পাবে না গ্রীন ব্রিগেড, তখন ওরা কি করবে।'

'এর উত্তর পানির মত সহজ। ওরা এই বাড়িতে ঢুকে তল্লাশী চালাবে।'

অন্ধকার ঘরে পায়চারি শুরু করলেন সুচেতা। 'তখন আমি তোমাকে বাঁচাব কিভাবে?'

'যখনকার সমস্যা তখন ভাবা যাবে,' বলল রানা। 'আমি এই মুহূর্তে শুধু মেয়েটার কথা ভাবতে চাইছি। ম্যাট হিথ ওর ওপর টরচার চালাচ্ছে। সে যদি মুখ না খোলে, এক সময় মেরে ফেলবে। এ-কথা জেনেও আমি চুপ করে থাকব?'

'কিন্তু করবেই বা কি?' রানার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন সুচেতা। 'তোমাকে আমি কোন অবস্থাতেই এই বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দেব না।'

'কিন্তু এই বাড়িতেই বা কতক্ষণ নিরাপদ আমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'টানেল আর চোরা কুঠরি তো দেখলাম। ভাল করে সার্চ করলে গ্রীন ব্রিগেড ঠিকই পেয়ে যাবে...'

'পেয়েছি!' হঠাৎ উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করলেন সুচেতা।

'কি পেয়েছেন?'

'তোমাকে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেব। ওই বাড়ির ঠিকানা কেউই প্রায় জানে না। পাহাড়ের গায়ে, জঙ্গলের ভেতর ওটা। আশপাশে জন বসতি খুব কম। রাস্তা আছে, গাড়ি চলে...'

রানা অন্যমনস্ক, সুচেতার কথা মন দিয়ে শুনছে না। 'লিমাকে ওরা মেরে ফেলবে...' আপন মনে বিড়বিড় করছে ও।

'আমি তোমার জন্যে কফি আনি?' রানা মাথা ঝাঁকাতে হাতব্যাগ আর মোবাইল ফোন নিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সুচেতা।

কফি খাবার পর সুচেতাকে বিশ্রাম নিতে বলে বিদায় করে দিয়েছে রানা, গেস্টরুমে সেই থেকে একা পায়চারি করছে। রাত দশটার দিকে দরজায় নক করে খেতে ডেকেছিলেন সুচেতা। জবাবে রানা বলেছে, 'প্লীজ, আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দিন। খিদে পেলে আমি নিজেই দরজা খুলব।'

গেস্টরুমে ফেলা কার্পেটের একটা কোণ তুললেই চোরা কুঠরির ট্র্যাপ-ডোর পাওয়া যাবে, বিপদ দেখলে সেখানে নামতে পারবে রানা, নিচে থেকে ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনির ওপর কার্পেটটাও টেনে দিতে পারবে। চোরা কুঠরি থেকেই টানেলে পৌঁছানো যায়।

দুনিয়ায় এমন কোন সমস্যা আছে নাকি যার সমাধান নেই? বারবার নিজেকেই প্রশ্নটা করছে ও। লিমা ওর কেউ নয়, কিন্তু সত্যিই ওকে যদি সে বাঁচাতে চায়, উপায় অবশ্যই একটা বেরুবে। তবে, নিজের গা বাঁচিয়ে এ-কাজ করা সম্ভব নয়।

রাত দুটোর দিকে প্ল্যানটা পরিষ্কার হয়ে এল। কোন ব্যাক-আপ পাওয়া যাবে না, কাজেই যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়েই হাত দিতে হবে কাজে। লিমাকে যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়, মিসেস পাটনায়েকের বিউটি পার্লারেও ফেরা চলবে না ওদের।

আরও আধ ঘণ্টা চিন্তা-ভাবনা করল রানা। তারপর সুচেতাকে ডাকল। তিনি জেগেই ছিলেন।

অন্ধকার ঘরে চাপা স্বরে আলাপ করল ওরা। নিজের প্ল্যানটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা। তার আগে সুচেতাকে স্কচ টেপ, মোবাইল ফোন, আর তাঁর স্বামীর রেখে যাওয়া বেরেটা .৩২ পিস্তলটা আনতে বলল। নিজের রিভলভারটাও বের করল ও। বিছানার ওপর পড়ে থাকা হ্যাটটা হাতে নিল, উল্টো করে ভেতরে রাখল অস্ত্র দুটো, তারপর টেপ দিয়ে আটকাল। হ্যাটটা মাথায় পরে

জিজ্ঞেস করল, 'বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে?'

সুচেতার মুখ শুকিয়ে গেছে। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

'আমি যদি লিমাকে উদ্ধার করতে পারি, ওকে নিয়ে আপনার গ্রামের বাড়িতে চলে যাব,' বলল রানা। 'আপনি ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিন ওটা কোথায়। বাড়িটায় কে কে আছে?' পকেট থেকে নোটবুক বের করল।

'শুধু একজন বুড়ো দারোয়ান আর তার স্ত্রী। কিন্তু রানা, মাই সান...'

'বিশ্বাস করুন, এছাড়া আর কিছু করার নেই,' তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'লিমাকে আমি মরতে দিতে পারি না। মেয়েটা ওদের হাতে মারা গেলে নিজেকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।'

রানার অটল ভাব দেখে সুচেতা চুপ করে থাকলেন। নোটবুকটা নিয়ে টেবিলে বসলেন ম্যাপ আঁকার জন্যে।

ফোনটা টেবিল থেকে তুলে নিল রানা। ফোন গাইড দেখে ম্যাট হিথের বাড়ির ফোন নম্বর সংগ্রহ করল। সুচেতাকে বলল, 'সকালে আপনার প্রথম কাজ একটা মোবাইল কেনা। আপনার এটা আমার কাছে থাকবে। বেলা এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে এটার নম্বরে যোগাযোগ করবেন আমার সঙ্গে। যদি বেঁচে থাকি, কথা হবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন সুচেতা। নোটবুকটা ফিরিয়ে দিলেন রানাকে। 'বুড়োর নাম শ্যাঙ হো—কেয়ারটেকার।'

'মিং আর ঝাঙের ওপর ভরসা করে এই বাড়িতে একা থাকা আপনার উচিত হবে না,' বলল রানা। 'যদি মনে করেন প্রাইভেসি পাওয়া সম্ভব, তা হলে গভর্নরের বাড়িতে গিয়ে উঠবেন। প্রাইভেসি পাওয়াটা জরুরী, কারণ আমি যেখানেই লুকিয়ে থাকি না কেন, বাইরের জগতের সঙ্গে আপনিই হবেন আমার একমাত্র কানেকশন।'

'ওখানে আমার কোন অসুবিধে হবে না,' জানালেন সুচেতা।

'গুড।' বলে ম্যাট হিথের নম্বরে রিং করল রানা।

চার

কয়েকবার রিঙ হবার পর অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল ম্যাট হিথের একজন বডিগার্ড। রানা তাকে বলল, 'তোমার বসকে ঘুম থেকে তোলো। বলো মাসুদ রানা ফোন করেছেন।'

'স্যার, এত রাতে বসের ঘুম ভাঙালে আমার চাকরি চলে যাবে...'

রানা বলল, 'বসই থাকবে না, তার চাকরি থাকে কিভাবে? যাও, ঘুম ভাঙাও শালার।'

দু'মিনিট পর লাইনে এল ম্যাট হিথ। 'গালাগালি করছ শুনেই বুঝতে পারছি, অসহায় বোধ করছ তুমি, মাথা নোয়াতে আপত্তি নেই। গুড মর্নিং,

রানা। হোয়াট আ স্যারপ্রাইজ!'

'তুমি সত্যি আমাকে বোকা বানিয়েছ। লিমা এখন তোমার হাতে। আমি একটা চুক্তিতে আসতে চাই।'

'ও, আচ্ছা, তাই? কিন্তু তোমাকে কি এখন আর আমার দরকার আছে?'

'ন্যাকামি বা ভাঁড়ামি রেড ড্রাগনকে মানায় না,' বলল রানা। 'মেয়েটা শক্ত ধাতু, হিথ। অদক্ষ আনাড়ি নয়, নিজেদের গ্রামে গেরিলা ঠেকানোর ট্রেনিং পেয়েছে। এ মেয়ে মুখ না খুলে মরতে পর্যন্ত পারবে।' অপরপ্রান্তে চুপ করে আছে হিথ, কাজেই থামল না রানা, 'মেয়েটা আমাকে বিশ্বাস করে, আমার প্রতি খানিকটা ঋণীও। তাকে যদি বলি তথ্যটা তোমাকে সে না দিলে তোমরা আমাকে খুন করবে, অবশ্যই মুখ খুলবে। বিনিময়ে সব অভিযোগ তুলে নেবে তুমি, ছেড়ে দেবে আমাদের।'

অপরপ্রান্তে তারপরও চুপ করে আছে হিথ। সে কি ভাবছে আন্দাজ করতে পারছে রানা। ওকে নিরেট বোকা ভাবছে সে। তবে কিছুটা সারবস্তু থাকায় ওর প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না। লিমাকে দিয়ে কথা বলাবার পর রানাকে খুন করতে কোন অসুবিধে নেই। 'ঠিক আছে। তোমার নম্বর দাও, আধ ঘণ্টা পর যোগাযোগ করে জানিয়ে দেব কোথায় তোমাকে যেতে হবে।'

'না,' বলল রানা। 'তোমার নম্বরে আমি ফোন করব। আরও শর্ত আছে। আমি রওনা হবার আগে টেলিফোনে লিমার গলা শুনতে চাই। তোমরা যদি এরইমধ্যে তাকে মেরে ফেলে থাকো, শুধু শুধু কেন আমি তোমাদের হাতে ধরা দিতে যাব?'

দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর জবাব দিল হিথ, 'ঠিক আছে। আধ ঘণ্টা পর এই নতুন নম্বরে আমাকে ফোন করবে তুমি।' নম্বরটা জানাল সে। তারপর বলল, 'কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না, রানা। সোনা উদ্ধার না করা পর্যন্ত তোমাদের দু'জনকেই হয়তো দরকার হবে আমার। কিন্তু যদি দেখি তোমার কোন খারাপ মতলব আছে, অন্য কিছু বিবেচনায় না এনে আমার প্রথম কাজ হবে দু'জনকেই খুন করা। পরিষ্কার?'

'তোমার বিরুদ্ধে গোটা ম্যাকাওয়ে কারও কিছু করার সাধ্য আছে?' পাল্টা প্রশ্ন করে সেট অফ করে দিল রানা।

আধ ঘণ্টা পর নতুন নম্বরে যোগাযোগ করল ও। 'কে, রানা?' জিজ্ঞেস করল কর্নেল। 'নাও, লিমার সঙ্গে কথা বলো।'

'মাসুদ রানা? সত্যি আপনি?' গলার স্বর ম্লান, তবে লিমা কাঁদছে না। অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আপনি আসবেন না, প্লীজ! ওরা আপনাকে মেরে ফেলবে...'

আবার হিথের গলা পেল রানা, 'টমাস ওঙ-এর ওয়্যারহাউসে আসতে হবে তোমাকে, রানা। ওয়াটারফ্রন্টে। হারবারের দক্ষিণ দিকে ওটা। সাইনবোর্ড আছে–টমাস ওঙ, ইমপোর্টার। ঠিক আছে?'

'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাচ্ছি,' বলল রানা। 'পথে যদি তোমার লোকজন দেরি করিয়ে না দেয়।'

‘কেউ তোমাকে দেরি করিয়ে দেবে না,’ বলল হিথ। ‘একটা কথা, রানা। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নিয়ে এসো না।’

সেট অফ করে দিয়ে সুচেতাকে রানা বলল, ‘যা যা বলেছি সব মনে আছে তো?’

কান্না দমনের ব্যর্থ চেষ্টা করে মিসেস পাটনায়েক শুধু মাথা ঝাঁকালেন।

‘পাঁচিল টপকে বাড়ির পিছনের গলিতে নামব,’ বলল রানা। ‘আপনি ঘরেই থাকুন, বেরোবার দরকার নেই।’ তাকে পাশ কাটিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সারারাতই গাড়ি চলে, ট্যাক্সি পেতে কোন অসুবিধে হলো না। ‘হারবারের দক্ষিণ দিকটায় যাব, টমাস ওঙের ওয়্যারহাউসে,’ ড্রাইভারকে বলল রানা। ‘চেনো?’

‘ইমপোর্টার ওঙের ওয়্যারহাউস তো? চিনি বৈকি।’

বিশ মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল ট্যাক্সি। আশপাশে কোন লোকজন নেই, ভূতুড়ে পরিবেশ, ভাড়া পেয়েই দ্রুত স্থান ত্যাগ করল ড্রাইভার। মান্ধাতা আমলের বিল্ডিংটার দিকে ভাল করে তাকাল রানা। ড্রাইভার ওকে ওয়্যারহাউসের একেবারে সামনে নামিয়ে দিয়েছে। বিল্ডিঙের কপালে সাদা রঙ দিয়ে লেখা সাইনবোর্ড ‘টমাস ওঙ–ইমপোর্টার’। হারবারের কোথাও একটা স্টীমার ভেঁপু বাজাচ্ছে, আওয়াজটা কেমন যেন করুণ। সত্যি ভয় করছে রানার। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে নক করার সময় খেয়াল করল, হাতটা সামান্য কাঁপছে। বিশাল গেটের গায়ে খুদে একটা দরজা, সেটাই ভেতর থেকে প্রথমে খোলা হলো। টর্চের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। ‘মাথার ওপর হাত তুলে সোজা হেঁটে এসো,’ নির্দেশ শোনা গেল।

দরজা টপকে ভেতরে ঢুকল রানা। টর্চ নিভে গেল, পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক বাতি। চোখ মিটমিট করছে ও, দৃষ্টিপথে নাচানাচি করছে কয়েকটা আবছা মূর্তি। ওর তিন হাত সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল ম্যাট হিথ, ডান হাতে একটা ল্যুগার। ‘আশা করি নিজের ও লিমার স্বার্থে তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করছ না,’ বলল সে। ‘তবু, সাবধানের মার নেই।’ ইঙ্গিত করতেই দু’জন লোক উদয় হলো রানার দু’পাশে। দক্ষ হাতে ওকে সার্চ করল তারা। তারপর পিছিয়ে এসে হিথের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। ‘গুড,’ রানাকে বলল হিথ। ‘তোমার ওপর আমি খুশি, মাসুদ রানা। এসো,’ বলে ঘুরল সে, বিশাল মেঝে ধরে হাঁটছে, ওদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে ওয়্যারহাউসের ভেতর।

ইস্পাতের একপ্রস্থ সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে একবার তাকাল রানা। সব মিলিয়ে পনেরোজন ওরা। কয়েকজন টেবিলে বসে তাস পিটছে। বাকি সবাই সতর্ক পাহারায়। সিঁড়িতে রানাকে অনুসরণ করছে দু’জন। সবার কাছেই অস্ত্র আছে, তবে হাতে নয়–হোলস্টারে।

সিঁড়ির মাথায় উঠে একটা দরজা খুলল কর্নেল। তার পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। ঘাম আর তামাকের কটু গন্ধ ধাক্কা মারল নাকে। মেঝের মাঝখানে একটা টেবিল, সিলিং থেকে নগ্ন একটা বালব ঝুলছে। টেবিলে আরও চারজন

লোক, তাস খেলছে। দু'জনকে শ্বেতাঙ্গ বলে চেনা গেল, বাকি দু'জন চীনা। চেহারাই বলে দেয়, এরা খুনী। দাঁড়িয়ে পড়েছে কর্নেল হিথ, তাস খেলা দেখছে। প্লেয়াররা খেলা থামাচ্ছে না বা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াচ্ছে না। অকস্মাৎ টেবিলের একটা পায়ায় পা বাধিয়ে টান দিল হিথ। টেবিলটা উল্টে পড়ল। বোতল আর গ্লাস ঝন ঝন শব্দে চুরমার হলো। তারপর জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল। শ্বেতাঙ্গদের একজন পর্তুগীজ ভাষায় কিছু একটা বলল। তার গালে ঠাস করে চড় মারল হিথ। 'হোর্তা, শেষবারের মত নিষেধ করছি—আমার সামনে কখনও অভিশাপ দেবে না!' কর্নেলের দিকে কটমট করে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল হোর্তা, তারপর ক্ষীণ একটু হাসল, হিথকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল আরেক দিকে—জ্যাকেটের সবগুলো বোতাম খোলা, ভেতরে হোলস্টারে ভরা পিস্তল দেখা যাচ্ছে।

'হোর্তা ফার্নান্দেজ,' রানাকে বলল হিথ। 'মাত্র বাহান্নজনকে খুন করেছে। একটু বেয়াড়া, তবে এমনি বেয়াড়াদেরকেই আমার দরকার।'

'আমার দরকার লিমাকে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল রানা। 'কোথায় সে?'

'এত ব্যস্ততা কিসের?' হাসল হিথ। 'আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমি জানতাম রেড ড্রাগনকে ধরার জন্যে ঢাকা থেকে একজন আসছে। কিন্তু সে যে প্রবাদপুরুষ মাসুদ রানা, এটা জানা ছিল না। তোমাকে আমরা চিনতেও পারিনি—ধোঁকা দিয়েছে তোমার ওই গোঁফ, লম্বা জুলফি, হেয়ার-স্টাইল আর চোখের লেন্স।'

রানা কথা বলছে না।

'চোর ধরতে এসে নিজেই ধরা পড়ে গেলে, হ্যাঁ?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল কর্নেল। 'আসলে এই-ই হয়, বড় দাঁও মারার সুযোগ পেলে কেউ আমরা লোভ সামলাতে পারি না। কি জানো, রানা, তুমি একটা বোকামি করে ফেলেছ। লিমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর প্রথমেই যদি তাকে নিয়ে সোজা আমার কাছে চলে আসতে, ট্রেজার হান্টে একসঙ্গে বেরুতে পারতাম আমরা, যা পেতাম দু'জন ভাগাভাগি করে নিতাম। কিন্তু এখন আর সে সুযোগ নেই।'

রানা কিছু বলছে না।

'তোমাকে বলতে আপত্তি নেই। আমি কিন্তু অভিযানের সমস্ত আয়োজন করে ফেলেছি। লঞ্চ তৈরি, তাতে রসদ তোলা হয়েছে, ক্রু বাছাইও শেষ। আমি আসলে বর্ন অ্যাডভেঞ্চারার, বুঝলে। বিপদসঙ্কুল অভিযানের গন্ধ পেলে আমার শিরায় শিরায় ছুটতে শুরু করে রক্ত। সে যাক, বাকি শুধু পুরোহিত নগুয়েন গুনোর লঞ্চটা ঠিক কোথায় ডুবেছে সেটা জানা। তবে, আগেই খবর পেয়েছি, কাস কং আর শ্রী-ওমবেল, এই দুই জায়গার মাঝখানে একটা লেগুনে নাকি ডুবেছে ওটা। সত্যি নাকি?'

'লিমার সঙ্গে কথা বলতে দাও আমাকে,' বলল রানা। 'সে জানে।'

'তোমাকে একটা আশ্বাস দিয়ে রাখি,' বলল হিথ। 'তোমরা আমাকে সাহায্য করছ, অবশ্যই তার প্রতিদান পাবে। আমরা যখন লঞ্চ নিয়ে রওনা হব, ওটায় তোমরাও থাকবে। ঠিক আছে? পনেরোশো মাইল পাড়ি দিতে হবে,

কাজেই পথে জেলেদের অনেক নৌকা পাওয়া যাবে। ওগুলোরই কোন একটায় নামিয়ে দেব তোমাদের। একটাই শর্ত, ভুলেও তোমরা ম্যাকাওয়ে ফিরে আসতে পারবে না। ঠিক আছে?'

'আমাকে আগে লিমার সঙ্গে কথা বলতে দাও,' বলল রানা। 'তারও হয়তো কিছু বলার আছে।'

'তুমি রাজি হলে তার আপত্তি শুনছে কে!' হঠাৎ নোংরা হাসি ফুটল হিথের মুখে। 'তোমার রুচির তারিফ করতে হয়, রানা। মালটা কিন্তু সত্যি ভাল, মাইরি বলছি, একেবারে ফার্স্ট ক্লাস!'

'হিথ, মুখ সামলে কথা বলো!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা।

'আরে, রাগ করছ কেন! তোমার বরং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। জানো, কেন? আমার পোষা লোকজন চেয়েছিল ওদের হাতে তুলে দিই লিমাকে। কাপড়চোপড় খুলে লিমার ঘরে লাইন দেয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের। বলছিল, ওদের লাইন দেখেই নাকি গড়গড় করে সব বলে ফেলবে মেয়েটা। কিন্তু আমি চাইনি তোমার ভোগে কেউ মুখ লাগাক।'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছে রানা। শুধু বলল, 'তোমার এই বকবকানি কতক্ষণ চলবে?'

'হোর্তা আর পিয়াও, এসো আমার সঙ্গে,' বলল কর্নেল। 'বাকি তোমরা মেঝের আবর্জনা সাফ করো।' পকেট থেকে চাবি বের করে একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। তার পিছু নিয়ে রানাও ঢুকল। পিয়াও আর হোর্তা ওর ঠিক পিছনেই রয়েছে।'

ওরা অন্ধকার একটা ঘরে ঢুকেছে। হিথ সুইচ অন করতে চোখ মিটমিট করল সবাই। দূরে, এক কোণে, ক্যাম্প-বেডে শুয়ে রয়েছে লিমা। ধীরে ধীরে উঠে বসল, চোখে কেমন একটা ঘোর লাগা ভাব। চীনা মেয়েরা যেমন পরে, ওরা তাকে শর্ট ট্রাউজার আর স্মক পরতে দিয়েছে। হাত দিয়ে কপালের চুল সরাবার জন্যে একটা হাত তুলল লিমা, চওড়া ও ঢোলা আস্তিন সরে গেল বাহুর ওপর দিকে, গোলাপী রঙের আঁচড়ের দাগ দেখতে পেল রানা।

কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকল ও। ওকে চিনতে একটু সময় নিল মেয়েটা। তারপর আনন্দে নিঃশব্দে হেসে উঠল চোখ জোড়া, বিছানা থেকে নেমে ছুটে এল, ঢুকে পড়ল রানার বাড়ানো দুই বাহুর ভেতর।

'তোমাদের পুনর্মিলন সত্যিই দর্শনীয়,' হেসে উঠে বলল হিথ। 'এমন আবেগ সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু বাধা দিতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। ভালবাসাবাসি পরে হবে, আগে কাজের কথা হোক।'

ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা, পিছিয়ে গেল কয়েক পা। হিথের সরাসরি সামনে দাঁড়াল, পিছনে লিমা। সময় নিয়ে পাইপে আগুন ধরাল হিথ। তারপর একটা চেয়ারে বসল। সিলিঙের দিকে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মিস লিমা, রানাকে দেখে তুমি একটুও অবাক হওনি। ব্যাপারটা অদ্ভুত না?' লিমা কিছু বলতে যাবে, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল। 'না, বাধা দিয়ো না। সময় কম, কাজেই রানা কিভাবে এখানে এসেছে তা ব্যাখ্যা করছি না। শুধু এটুকু

জেনে রাখো, এখনও তুমি যদি সোনার হদিশ আমাকে না জানাও, ওকে ভুগতে হবে।' ইঙ্গিতে হোর্তাকে দেখাল। হোর্তা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ছুরির ডগা দিয়ে নখের ময়লা বের করছে। 'কল্পনা করো, হোর্তা ওই ছুরি দিয়ে রানার চোখ তুলছে। তার আগে রানাকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে নেবে ও।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল লিমার চেহারা, মুখের কাছে হাত তুলে বিড়বিড় করল, 'না, প্লীজ, না! আপনি ওঁকে ছেড়ে দিন...'

রানা সিদ্ধান্ত নিল, অ্যাকশন শুরু করার এটাই আদর্শ সময়। লিমার দিকে ঘুরল সে, ঠাস করে চড় মারল ওর গালে। 'কর্নেল যা জানতে চায়, বলে ফেলো! তুমি কি চাও তোমার বোকামির জন্যে আমি খুন হয়ে যাই?' চিৎকারের ধরনটা এমনই, রানা যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

হিথের সকৌতুক হাসি শুনতে পেল রানা। একজোড়া হাত অনুভব করল গায়ে। লিমার কাছ থেকে টেনে সরিয়ে নিল ওকে, তারপর ঠেলে দিল এক ধারে। রানা ইচ্ছে করেই ভারসাম্য হারাল, ছিটকে পড়ল বিছানার ওপর। হোর্তা এগিয়ে এল ওর দিকে, হাতে ছুরি, ঠোঁটে শয়তানি হাসি। বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে রানা, মাথা থেকে খসে পড়তে যাচ্ছে দেখে খপ করে ধরে ফেলল হ্যাটটা। পরমুহূর্তে ভোজবাজির মত দু'হাতে বেরিয়ে এল দুটো অস্ত্র। হোর্তার ব্রেস্টপকেটে ডান হাতের ল্যুগার তাক করল, ট্রিগারে টান দিল দু'বার। মেঝেতে পড়ার আগেই মারা গেল সে।

চীনা পিয়াং জ্যাকেটের ভেতর হাত ভরে অটোমেটিক বের করল। সিধে হতে শুরু করে বাম হাতে ধরা বেরেটার ট্রিগার টেনে দিল রানা। দুটো বুলেটই পিয়াঙের পেটে ঢুকল। ইতিমধ্যে দরজা খুলে ফেলেছে কর্নেল, ল্যুগারের আরও দুটো বুলেট পিছু ধাওয়া করলেও তার নাগাল পেয়েছে বলে মনে হলো না। সেদিকে লাফ দিল রানা, কবাট বন্ধ করে বোল্ট লাগাল, ফিরল লিমার দিকে।

পিয়াং মেঝেতে পড়ে পেট চেপে ধরে মোচড় খাচ্ছে, তার অটোমেটিকটা তুলে পকেটে ভরল রানা, একটা চেয়ার তুলে ছুটল জানালার দিকে। খক খক করে কাশছে পিয়াং, রক্তবমি করছে, সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে রানার পাশে চলে এল লিমা। 'তুমি পুরোপুরি সুস্থ তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা তোমার গায়ে হাত তুলেছে?'

মাথা নাড়ল লিমা। তবে বলাবলি করছিল, আগামীকাল ওদের হাতে আমাকে তুলে দেয়া হবে।'

লিমাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে বারবার আঘাত করে জানালার গায়ে চেয়ারটা ভাঙল রানা। সমস্ত কাঁচ চুরমার হয়ে গেল, জানালা বলে কিছু থাকল না। উঁকি দিয়ে নিচে তাকিয়ে হতাশ হতে হলো। তিনতলা সমান ওপরে রয়েছে ওরা, নিচে নিরাপদে নামতে হলে ডানা দরকার হবে। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকাল রানা। ওদিকে দরজা ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখুনি এই ঘর ছেড়ে পালাতে হবে। বাঁচার চেষ্টা করা যেতে পারে যদি ছাদে ওঠা যায়।

ছাদটা সমতল, তবে কিনারা সামান্য ঢালু হয়ে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্যে লাগানো একটা টুয়ার সঙ্গে মিশেছে, দেখে মনে হলো টিনের তৈরি।

ওদের ভার সইতে পারবে কিনা বলা কঠিন, তবে ঝুঁকিটা এখন আর না নিয়ে উপায় নেই। বেরেটাটা লিমার হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বলল, টিনের ওউ নালা টিকে গেলে ছাদে উঠতে পারব আমরা। আমি যদি নিচে পড়ে যাই, হয় আমার পিছু নিয়ে লাফ দিয়ো, আর নইলে কপালে অস্ত্র ঠেকিয়ে ট্রিগার টেনে দিয়ো।' রানার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল লিমা।

জানালার কার্নিসে উঠে টুয়া ধরে ঝুলে পড়ল রানা। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল টিন, ঝুলে পড়ল বেশ কিছুটা, তবে খুলে আসছে না। দু'সেকেন্ড ঝুলে থাকল রানা, তারপর জানালার চৌকাঠে পা বাধিয়ে লাফ দিল ওপর দিকে। এক ঝাঁকিতেই উঠে পড়ল ছাতে, লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ও। হাত দুটো নিচে নামিয়ে চিৎকার করল, 'ধরো, লিমা! জলদি!'

অকস্মাৎ ঘরের দরজা বিস্ফোরিত হলো। পরমুহূর্তে পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি হবার বিরতিহীন শব্দ। ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। যার জন্যে এত ঝুঁকি নেয়া, তার লাশ ফেলে পালাতে হবে এখন ওকে। ঘরের ভেতর থেকে গোঙানি, চিৎকার, ছুটোছুটি, গালিগালাচের শব্দ ভেসে আসছে। চাঁপা কলার মত সরু আঙুল দেখতে পেল রানা, জানালার চৌকাঠ ধরে কার্নিসে কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে। নিজের হাত আরও নিচু করে দিল ও। এতক্ষণে লিমার মুখটা দেখা গেল জানালার বাইরে, চৌকাঠ ছেড়ে রানার বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল। প্রচণ্ড এক হ্যাঁচকা টানে তাকে নিজের বুকের ওপর তুলে আনল রানা। ভরাট স্বাস্থ্য লিমার, অথচ পালকের মত হালকা লাগল। বেরেটাটা রানার হাতে গুঁজে দিল সে, বলল, 'এটা যদি আপনি আমাকে না দিতেন, ওই ঘরেই লাশ হয়ে পড়ে থাকতাম। ভয় হচ্ছে সবগুলো বুলেটই বোধহয় খরচ করে ফেলেছি।'

'লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল রানা। 'আশা করি প্রত্যেকটা বুলেটই যার যার দায়িত্ব পালন করেছে।'

নিচের ঘর থেকে এখন শুধু যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ ভেসে আসছে। গড়িয়ে সমতল ছাদে চলে এল ওরা, লিমার হাত ধরে সিধে হলো রানা। 'ওরাও উঠে আসবে, যে-ক'জন বেঁচে আছে। এসো।' ছাদ ধরে ছুটল ওরা। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, পিছন থেকে একটা চিৎকার শোনা গেল। ঘাড় ফেরাতেই ম্যাট হিথ আর তার তিন সঙ্গীকে দেখতে পেল রানা, বিশ গজ দূরের একটা ট্র্যাপ-ডোর থেকে বেরিয়ে আসছে। ওদিকে একটা গুলি পাঠিয়ে দিয়ে লিমার হাত ধরে আবার ছুটল ও। চাঁদের আলো সাহায্য করছে ওদের। ওয়্যারহাউসগুলো গায়ে-গায়ে লাগানো, তবে সবগুলো নয়; ছাদ বদল করার জন্যে মাঝে-মধ্যে লাফ দিতে হচ্ছে। মিনিট পাঁচেক ছোটার পর নিচু একটা ছাদ পেল ওরা, সেটা ধরে দশ গজ এগোতে পাওয়া গেল একটা রাস্তা, নিচে সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকে রশি দিয়ে বাঁধা ও তেরপল দিয়ে ঢাকা মাল, তার ওপর পড়ল ওরা। সেখান থেকে রাস্তায়। কুকুরগুলো পিছু ছাড়েনি। লাফিয়ে ট্রাকে পড়তে দেরি করায় নিজের লোকজনকে গালিগালাজ করছে কর্নেল হিথ।

'ওদের সঙ্গে দৌড়ে আমরা পারব না,' ছুটতে ছুটতে বলল রানা। 'তুমি তো ভালই সাঁতার জানো, চলো সাগরে ঝাঁপ দিই।'

'ঠিক আছে।'

খটকা লাগল রানার। ও কি শুনতে ভুল করল? লিমার জবাবে চাপা হাসির প্রলেপ আছে বলে মনে হলো। জ্যাকেট খুলে হাতে নিল রানা, অস্ত্রগুলো ভরল ট্রাউজারের পকেটে। একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে পড়ল জোছনা মাখা সাগর, পারদের মত টলটল করছে পানি। দু'জনে একসঙ্গে লাফ দিল ওরা, রানার একটা হাত শক্ত করে ধরে আছে লিমা। ডুব সাঁতার দিয়ে সরে যাচ্ছে তীর থেকে যত দূরে সম্ভব।

এক সঙ্গেই পানির ওপর মাথা তুলল ওরা, 'সিকি মাইল সাঁতরাতে হবে, পারবে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। রানার একটা হাত এখনও ছাড়েনি লিমা। দ্রুত সাঁতার কেটে তীর থেকে আরও দূরে সরে আসছে দু'জন।

'পারব!'

এবার কোন সন্দেহ নেই। 'তুমি হাসছ কেন?'

'ব্যাখ্যা করা কঠিন,' বলল লিমা। 'হোপ এগেইন্স্ট হোপ বলে একটা কথা আছে, জানেন তো? আমার বেলায় সেটাই সত্যি হয়ে গেছে দেখে হাসি চেপে রাখতে পারছি না।'

'কিছুই বুঝলাম না।'

'আমার মন যুক্তি-টুক্তি মানতে চায়নি,' বলল লিমা। 'বলছিল, আপনি আমাকে উদ্ধার করতে আসবেন। আশ্চর্য, সত্যি এলেন!'

পানি গরম না হলেও, ঠাণ্ডা নয়। চাঁদটা মেঘের আড়ালে চলে যাওয়ায় সাগর অন্ধকার। পানিতে ওরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। ইতিমধ্যে রানার হাত ছেড়ে দিয়েছে লিমা। তবে পরস্পরের পাশেই থাকছে ওরা, শান্ত অনায়াস ভঙ্গিতে সাঁতার কাটছে।

কিছুক্ষণ পর এক ঝাঁক সাম্পান দেখতে পেল ওরা। ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে। হারবারের উত্তর দিক এটা। বোট আর সাম্পানের ফাঁক গলে চলে এল পাথরের সিঁড়ির কাছে। পানি থেকে উঠে একটা ধাপে বসে রানা জিজ্ঞেস করল, 'হাঁপিয়ে গেছ?'

'নাহ্,' কপাল থেকে ভিজে চুল সরিয়ে বলল লিমা। 'এখন কি হবে? কোথায় যাব আমরা?'

'আগে দেখি ম্যাপের কি অবস্থা,' জ্যাকেটের পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল রানা। সিঁড়ির মাথায় উঠে লাইটপোস্টের নিচে দাঁড়াল। নোটবুক খুলে মিসেস পাটনায়েকের আঁকা ম্যাপটা পরীক্ষা করল। তারপর 'এসো' বলেই হাঁটা ধরল।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'একটা সেফ হাউসে,' বলল রানা। 'ওখানে বসে প্ল্যান করতে হবে।'

'কিভাবে আমরা ম্যাকাও থেকে পালাতে পারি, এই প্ল্যান?'

'না,' বলল রানা। 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্ল্যান। তোমাকে তো আগেই বলেছি, রেড ড্রাগনকে ধরার জন্যে ম্যাকাওয়ে এসেছি আমি। আর তুমি আমাকে বলেছ, কম্বোডিয়ান প্যাগোডার সোনা ও পাথর উদ্ধার করাই তোমার

উদ্দেশ্য।'

'হ্যাঁ।'

'রেড ড্রাগন যে কর্নেল ম্যাক হিথ, একথা তুমি এখন জানো। ম্যাকাওয়ে তাকে কাবু করা সম্ভব নয়। তাকে শ্রী-ওমবেল আর কাস কং, এই দুই জায়গার মাঝখানে, জলাভূমিতে টেনে আনতে হবে। ওইখানে ফাঁদে ফেলব আমরা তাকে, সেই সঙ্গে উদ্ধার করব সোনা ভরা লঞ্চটাও।'

'কিন্তু লোকটা আমাকে বলেছে, কম্বোডিয়াকে নিজের হাতের তালুর মতই চেনে সে। ওখানে নাকি তার পরিচিত লোকজনও আছে। আমরা তার সঙ্গে পারব?'

'আমার ওপর ভরসা রাখো, লিমা।'

'সরি।'

'না, ঠিক আছে। না পারার কিছু নেই, লিমা। আমরা প্রস্তুতি নিয়েই রওনা হব।'

বেলা ঠিক এগারোটার সময় ফোন করলেন মিসেস পাটনায়েক। রানার সাড়া পেয়ে বিড়বিড় করে ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। 'মেয়েটা? লিমা? তাকে তুমি উদ্ধার...'

'লিমা আমার সঙ্গেই রয়েছে,' বলল রানা। 'আপনি গভর্নর হাউসে, তাই না?'

'হ্যাঁ। শ্যাং হো তোমাদের খাতির যত্ন করছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন সুচেতা। 'কিভাবে পৌঁছালে ওখানে, কেউ পিছু নেয়নি তো?'

'ট্যাক্সি নিয়ে এসেছি, তবে শেষ দু'মাইল হেঁটে,' বলল রানা। 'পৌঁছুতে ভোর হয়ে গেলেও, পথে কোন লোকজন দেখিনি।'

'দেখবে কোত্থেকে, লোকজন থাকলে তো।'

'শুনুন, সুচেতা,' বলল রানা। 'আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চিন্তা-ভাবনা করে দেবেন। তার আগে বলুন, আপনি একা তো?'

'একা। ঘরের দরজা বন্ধ।'

'জেমস হার্ডি। তাকে আপনি কতটুকু বিশ্বাস করেন?'

অপরপ্রান্তে দীর্ঘ আধ মিনিট চুপ করে আছেন সুচেতা।

'ধরুন, আপনি তার কাছে বিশ লাখ টাকা জমা রাখলেন। বিশ্বাস হয় যে টাকাটা চাইলে ফেরত পাবেন?' আবার প্রশ্ন করল রানা।

'বিশ লাখ হলে পাব,' বললেন সুচেতা। 'টাকার অঙ্ক যদি বিশ কোটি হয়, জানি না ফেরত পাব কিনা। এ প্রশ্ন কেন করছ তুমি?'

'জেমস হার্ডির সাহায্য দরকার আমার। যদি জানে আমি আর লিমা কোথায় আছি, সে কি রেড ড্রাগনকে ঠিকানাটা জানিয়ে দেবে, বিশ লাখ টাকা পুরস্কারের লোভে?'

'না, তা বোধহয় দেবে না। এ-ব্যাপারে হানড্রেড পার্সেন্ট না হলেও, সেভেনটি বা সেভেনটি-ফাইভ পার্সেন্ট গ্যারান্টি দেয়া যায়।'

'মার্ক হেগেন আর কার্ল ডয়েসকে?'

'মার্ক হেগেনকে তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস করতে পারো,' বললেন সুচেতা। 'লোকটা আমার প্রতি নানা কারণে কৃতজ্ঞ। তবে কার্ল ডয়েস সম্পর্কে কি বলব বুঝতে পারছি না। অত্যন্ত রগচটা লোক। কারও সঙ্গেই তার বনিবনা হয় না। আমার প্রতি কোনভাবে কৃতজ্ঞ বা ঋণীও নয়। আমি শুধু একটা প্লাস পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি। তা হলো—ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডকে অসম্ভব ঘৃণা করে সে। ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন, আর রেড ড্রাগনকে তুমি শায়েস্তা করতে চাও, এ-কথা শুনলে তোমার যে-কোন শর্ত মেনে নেবে সে।'

'তার গুণ সম্পর্কে বলুন, যদি জানেন। কিসে সে এক্সপার্ট?'

'সুযোগ পেলে বক্সার হিসেবে আরও অনেক নাম করতে পারত,' বললেন সুচেতা। 'শিকারের নেশা আছে বলে জানি। শূটিং কমপিটিশনে মেডেল পেয়েছে দু'বার।'

'সাঁতার জানে?'

'বলতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওদের ফোন নম্বর আছে আমার কাছে। দেব?'

'এখুনি নয়। প্রথমে আপনি যোগাযোগ করুন। বলবেন, আমি আপনার সঙ্গে গভর্নর হাউসেই আছি। এ-ও জানাবেন যে ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন, আর তাকে শায়েস্তা করার জন্যে ওদের সাহায্য আমার দরকার।'

অপরপ্রান্তে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুচেতা বললেন, 'ঠিক আছে। বুঝতে পারছি।'

'প্রথমে জেমস হার্ডিকে ফোন করবেন। সব কথা জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় দেবেন। তারপর দেখুন কি ঘটে। যদি খারাপ কিছু ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাকে।'

'ওরা যদি বেঈমানী করে, গ্রীন ব্রিগেড তোমার খোঁজে গভর্নর হাউসে ঢুকে তল্লাশী চালাবে।'

'ঠিক তাই,' বলল রানা। 'সেরকম কিছু না ঘটলে ওদেরকে এখনকার চেয়ে আরও একটু বেশি বিশ্বাস করা যাবে। একজনের সময়সীমা পার হলে দ্বিতীয়জনকে ফোন করবেন। আরও আধ ঘণ্টা পর তৃতীয়জনকে। একজনের কথা আরেকজনকে বলবেন না।'

'যে যার নির্দিষ্ট সময়ে ওরা যখন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে, কি বলব আমি?' জিজ্ঞেস করলেন সুচেতা।

'ফোন নম্বর দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলবেন। একটাই শর্ত, প্রি-পেইড মোবাইল ফোন থেকে যোগাযোগ করতে হবে। ভাল কথা, আপনার মোবাইলের নম্বরটাও আমাকে দিয়ে রাখুন।'

বারোটা দশে জেমস হার্ডির ফোন এল।

ওর কি দরকার সেটা ব্যাখ্যা করল রানা। ম্যাকাও থেকে বেরিয়ে যাবার

সেফ প্যাসেজ-এর ব্যবস্থা করে দেবে হার্ডি। ওর সঙ্গে আরও তিন-চারজন থাকবে। সবচেয়ে ভাল হয় হার্ডি যদি তার জাহাজে ওদেরকে তুলে নিতে পারে। বারোশো থেকে পনেরোশো মাইলের দীর্ঘ জার্নি। জার্নির শেষ প্রান্তে, সেটা ভিয়েৎনামের কোন বন্দরে হলেই ভাল হয়, ওর একটা লঞ্চ দরকার, হোল্ডে এক হাজার মণ কার্গো ধরার ব্যবস্থা থাকা চাই। আর চাই রাইফেল, রিভলভার, শটগান, গ্রেনেড, লিমপেট মাইন, ফ্লেয়ার, জেলিগনাইট, রশি, চটের বস্তা ইত্যাদি। কোনটা কি ধরনের, তাও ব্যাখ্যা করল ও। অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সার্ভিস নগদ টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করবে ও। নগদ টাকা মানে মাস্টার কার্ড। অঙ্কটা হার্ডিই বলুক।

কৌতূহলী হার্ডি একের পর এক প্রশ্ন করেই যাচ্ছিল, তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ, জানি, অনেক গুজবই তোমার কানে আসছে। তবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ও-সবে কান না দেয়া। আরেকটা কথা, যতটুকু বলব তার বেশি জানতে চেয়ো না।'

হার্ডি তখন বলল, 'তোমরা কম্বোডিয়ায় যাচ্ছ, এটা পরিষ্কার। তোমাদেরকে আমার নিয়ে যেতে আপত্তি নেই, কিন্তু ফিরবে কিভাবে? আমি যে লঞ্চের ব্যবস্থা করতে পারব সেটা দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার উপযোগী নয়। তাছাড়া, লঞ্চটা যদি খুব বড় হয়, জলাভূমিতে ওটা কোন কাজে আসবে না।'

এই সমস্যার কথা আগে ভাবেনি রানা। 'চ্যানেলের মুখ থেকে আমরা যখন সাগরে বেরিয়ে আসব, তোমার জাহাজ আমাদেরকে তুলে নিতে পারে না?'

'পারে, যদি আমার জাহাজ ব্যাংকক থেকে হো চি মিনে আসার সময় চ্যানেলের মুখে দেখতে পায় তোমাদের।'

'লঞ্চ নিয়ে রওনা হবার পর কাজ সেরে চ্যানেলের মুখে ফিরে আসতে এই ধরো তিন দিন লাগবে আমাদের,' বলল রানা। 'এখন হিসেব কষে বলো তোমার জাহাজ কবে ও কখন চ্যানেলের মুখটাকে পাশ কাটাবে।'

'এ নিয়ে বিশদ আলোচনা পরে করলেও চলবে,' বলল হার্ডি। 'সার্ভিস ও অন্য সব জিনিসের বিনিময়ে তোমার কাছে আমি এক লাখ মার্কিন ডলার পাওনা হব। এরপর আছে বোনাস।'

রানা দর কষল না। 'এক লাখ ডলার ঠিক আছে। কিন্তু বোনাসটা আবার কি?'

'এই অভিযান থেকে যা-ই আয় হোক তোমার, আমি তার ভাগ চাইব না,' বলল হার্ডি। 'তবে সাহায্য করার একটাই শর্ত থাকবে–চ্যানেলের মুখ থেকে তোমাদেরকে আমি জাহাজে তুলে নেব শুধু যদি প্রমাণ করতে পারো রেড ড্রাগনকে খতম করতে পেরেছ।'

'চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না,' কথা দিল রানা। 'আর, যদি না পারি, চ্যানেলের মুখে থামতে হবে না তোমাকে।'

খুঁটিনাটি আরও কয়েকটা বিষয়ে আলাপ করল ওরা, তারপর যোগাযোগ কেটে দিল রানা।

এরপর ফোন করল হেগেন। রেড ড্রাগন ওরফে ম্যাট হিথের ওপর এমন

খেপাই খেপে আছে সে, বলল রানার সাহায্য পেলে এখুনি সুইসাইড স্কোয়াডে নাম লেখাতে তার আপত্তি নেই। তারপর সে নিজের একটা দুর্বলতার কথা স্বীকার করল, 'স্টীমার হারিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে আছে, তাই মদ ছাড়া আমার চলে না। দেখো, ফ্রেন্ড, লঞ্চে ওই জিনিস না থাকলে আমাকে পাবার কথা তোমাকে ভুলে যেতে হবে।' রানা দ্বিধায় পড়ে গেল। হেগেনকে ওর দরকার, কিন্তু একজন মাতাল হয়তো সুবিধের চেয়ে অসুবিধেই করবে বেশি। বলল, 'ঠিক আছে, তবে চব্বিশ ঘণ্টায় আধ বোতল, তার বেশি নয়। রাজি?' উত্তরে সহাস্যে বলল হেগেন, 'দেখা যাচ্ছে তোমাকে ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করায় আমি ভুল করিনি। থ্যাঙ্ক ইউ। ও, আরেকটা কথা। স্টীমার হারাবার পর আমি একটা বোট ভাড়া করে কোনও মতে ব্যবসা চালাচ্ছি। ওটা এখন ভিয়েৎনামের নামকানে আছে। পুরানো, তবে জলায় চালাবার জন্যে খুব ভাল। খুব সরু কাঠামো, লম্বায় বেশি।'

'এ-ব্যাপারে তোমাকে পরে জানাব,' বলে কানেকশন কেটে দিল রানা।

কার্ল ডয়েসের আচরণ ওদের কারও সঙ্গে একেবারেই মিলল না। গলার আওয়াজ ষাঁড়ের মত, শান্তভাবে কথা বললেও মনে হয় মেঘ ডাকছে। প্রথমেই সে জানতে চাইল, এটা যদি ট্রেজার হান্ট হয়, তার ভাগে কত পড়বে। রেড ড্রাগন ওরফে ম্যাট হিথকে মারতে পারলে কোনও পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা। তাছাড়া, বীমা থাকবে তো? সে যদি মারা যায়, বার্লিনে তার মায়ের ঠিকানায় এক লাখ ডলার পৌঁছে দেয়া হবে কিনা।

'দৈনিক পাঁচ হাজার ডলার পারিশ্রমিক পাবে,' বলল রানা। 'আশা করছি দিন পাঁচেকের মধ্যে কাজটা শেষ করতে পারব। সময় যদি আরও বেশি লাগে, পারিশ্রমিকের অঙ্ক ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলারের বেশি বাড়বে না। রাজি থাকলে বলো, তা না হলে অন্য লোক খুঁজি।'

'কোনটা ঠিক? হাড়কেপ্পন? নাকি ভিখারি?'

'রাজি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'ইউ বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিস করল ডয়েস।

বর্তমান পরিস্থিতিতে যোগ্য লোক পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তবু রানা ডয়েসকে বাদ দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিল। এরকম অসভ্য আর বদরাগী লোক সমস্যা সৃষ্টি করবে। 'তোমাকে আমার দরকার নেই...'

'আমার আছে,' হেঁড়ে গলায় বলল ডয়েস, রানার কথা তাকে যেন স্পর্শই করেনি। 'গালিটা যদি হজম করতে না পার, তুমিও বার দুয়েক আমাকে বাস্টার্ড বলে নাও, শোধবোধ হয়ে যাক। কি, নেবে না বলে ভাবছ?' হেসে উঠল সে। 'তাহলে তো আরও ভাল—তোমরা সামনে থাকবে, তোমাদের পিছনে থাকবে রেড ড্রাগন, আর রেড ড্রাগনের পিছনে থাকব আমরা।'

'আমরা মানে?'

'আমাকে তুমি ছোট করে দেখছ, রানা,' হঠাৎ সিরিয়াস মনে হলো ডয়েসকে। 'একবার যখন জানতে পেরেছি ম্যাকাও ট্রাইয়্যাড আর গ্রীন ব্রিগেড একই জিনিস, ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন, তখন আর আমাকে ঠেকায় কে! আমাকে

ভিখারি ভেবো না, একটা অভিযানের আয়োজন করার মত ফান্ড আমি ঠিকই চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে যোগাড় করে ফেলব। ভেবো না আমি তোমাকে হুমকি দিচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার কাঁধে বন্দুক রেখেই রেড ড্রাগনকে শিকার করতে চাই আমি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কেউ আমাকে ঠকিয়ে পার পেয়ে যাবে।'

'কেউ তোমাকে ঠকাচ্ছে না,' বলল রানা, ভাবছে মার্ক ডয়েস বিচিত্র একটা চরিত্র। কিছু কিছু লোকের অদ্ভুত প্রবণতা হলো, নিজের সম্পর্কে মানুষকে খারাপ ধারণা দিয়ে বেড়ানো, আসলে কিন্তু তারা ঠিক বিপরীত চরিত্রের লোক। ডয়েস হয়তো তাদের দলেই পড়ে। ওর এই বিশ্লেষণ ভুলও হতে পারে, তবে ডয়েসকে বাদ না দেয়ার পক্ষেই সায় দিচ্ছে ওর মন। 'শোনো, ডয়েস, এই অভিযান ট্রেজার হান্ট নয়। লঞ্চটা আমরা যদি তুলতে পারি, সোনা আর পাথর যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত যাবে।'

'যতক্ষণ না এই বিরল ঘটনাটা ঘটছে ততক্ষণ আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে রাজি নই,' বলল ডয়েস। 'হুঁহ্, কলিযুগে নিজেকে উনি যুধিষ্ঠির বলে দাবি করছেন!'

লোকটার কথা এত স্পষ্ট আর চাঁছাছোলা, গা জ্বালা করে ওঠে। 'তুমি তাহলে দৈনিক পাঁচ হাজার ডলারে রাজি নও?' শেষবারের মত জানতে চাইল রানা।

'আমাকে চিনতে পেরেছ, তাই ভয় পাচ্ছ,' বলল ডয়েস। 'কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে আমি শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই। আমি রাজি।'

খুঁটিনাটি বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। রানার মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব থেকেই গেল। ডয়েসকে সঙ্গে নিয়ে সে ভুল করছে না তো?

পাঁচ

প্ল্যানটা চূড়ান্ত করতে চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। হার্ডিকে জানিয়ে দিল রানা, তাকে লঞ্চ যোগাড় করতে হবে না। নামকান বন্দরের কাছাকাছি জেলেদের একটা গ্রামে একজনের পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা একটা বোট পড়ে আছে, সেটাই ব্যবহার করবে ওরা। শুনে হার্ডির কোন প্রতিক্রিয়া হলো কিনা বোঝা গেল না। রানা তার বোঝা আরও খানিক কমিয়ে দিল—মার্ক হেগেন ও কার্ল ডয়েস তার জাহাজে উঠবে না, ওরা ভিয়েৎনামে পৌঁছাবে প্লেনে। তবে তার কাঁধে নতুন একটা দায়িত্ব চাপাল। লিমাকে নিয়ে রানা জাহাজ থেকে নেমে যাবার এক ঘণ্টা পর হেগেনের ভাড়া করা বাংলোয় অস্ত্র ও বিস্ফোরক পৌঁছে দিতে হবে তাকে। অতিরিক্ত অস্ত্র হিসেবে তিনটে থম্পসন সাব-মেশিনগানও চাইল।

ঠিক হলো, নিজের বাংলোয় সবার আগে পৌঁছাবে হেগেন। লঞ্চের কোন মেরামতি লাগলে সেরে রাখবে সে, ট্যাঙ্কগুলোতে ডিজেলও ভরে রাখতে হবে।

বাংলোর ঠিকানা দিয়ে কার্ল ডয়েসকে বলা হলো, তিন দিন পর ওখানে তাকে দেখতে চায় রানা। প্লেনের টিকেট সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ আপাতত নিজের পকেট থেকেই সারতে হবে, পরে পরিশোধ করবে রানা।

মিসেস পাটনায়েকের গ্রামের বাড়ি থেকে হার্ডিই তুলে নিল রানা ও লিমাকে। একটা লন্ড্রি-ভ্যান নিয়ে এল সে, কাপড়চোপড়ে ঠাসা। তারই ভেতর গুটিসুটি মেরে বসে থাকল ওরা দু'জন। হার্ডি বুদ্ধি করে ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের পরিচালিত একটা লন্ড্রি কোম্পানির ছাপমারা ভ্যান সংগ্রহ করেছে, ফলে রাস্তায় টহলরত গ্রীন ব্রিগেডের সদস্যরা সার্চ করার জন্যে কোথাও ওটা থামাল না।

জাহাজে ওদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা করল হার্ডি। কোন ঘটনা ছাড়াই নামকান বন্দরে ভিড়ল জাহাজ। একটা বোট নিয়ে তীরে পৌঁছাল রানা ও লিমা, তাৎক্ষণিক ট্যুরিস্ট ভিসা পাবার জন্যে কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন শেডে লাইন দিতে হলো। ঝামেলা মিটতে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা, শহরকে পাশ কাটিয়ে চলে এল জেলেদের গ্রামে।

ট্যাক্সি থামল দেয়াল ঘেরা একটা চত্বরের মাঝখানে। ড্রাইভারকে বিদায় করে দিয়ে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। বাংলোটা দোতলা, সামনে ছোট্ট বাগান। গাছপালার আড়ালে কোথাও ছিল, ভিয়েৎনামী দুই কিশোর ছুটে এসে মাথায় তুলে নিল ওদের লাগেজ। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ টপকে বাংলোয় ঢুকল ওরা। দোতলায় উঠে লিমা বেরুল পিছনদিকের ঝুল-বারান্দায়। কিশোর দু'জনকে ডেকে রানা বলল, 'আমরা লঞ্চে যাচ্ছি, হার্ডি আর ডয়েস নামে কেউ এলে ওদেরকে ওখানেই পাঠিয়ে দিয়ো।' তারপর ঝুল-বারান্দায়, লিমার পাশে এসে দাঁড়াল।

নাক বরাবর সামনে গাঢ় নীল চীন সাগর। বাংলোটা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। ঝুল-বারান্দার একশো ফুট নিচে চিমনি আকৃতির খুদে ইনলেট, পানি এত স্বচ্ছ যে থোকা থোকা ফুলের মত প্রবালের মাঝখানে ঝাঁক-ঝাঁক মাছ দেখা যাচ্ছে। ইনলেটটাকে ঘিরে রেখেছে সবুজ গাছপালা। পাথুরে একটা জেটির শেষ মাথায় স্থির হয়ে আছে বোটটা। তবে চেহারা দেখে একটু হতাশই হলো রানা। এতবেশি পুরানো আর রঙচটা হবে বলে ভাবেনি ও। বোটের আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। 'হেগেন সম্ভবত বোটের ভেতর কাজ করছে,' লিমাকে বলল রানা। 'চলো, বোট আর বোটের মালিকের সঙ্গে পরিচিত হই।'

পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে আঁকাবাঁকা পাথুরে ধাপ, ওগুলো বেয়ে নিচে নামতে হলো। জেটি ধরে এগোল রানা, পিছনে লিমা। বোটের কাছাকাছি আসতেই লোহা পেটানোর আওয়াজ ঢুকল কানে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। ডেকে উঠল রানা, লিমাকে উঠতে সাহায্য করল। হুইলহাউসে ঢোকার পর হতাশ ভাব খানিকটা দূর হলো মন থেকে। বাইরে থেকে দেখে যাই মনে হোক, ভেতরটা বেশ সাজানো-গুছানো। কম্পাসটা পরীক্ষা করল রানা। মিটারে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হলো ট্যাংকগুলোয় ডিজেল ভরা হয়েছে। লিমাকে নিয়ে আবার ডেকে বেরিয়ে এল ও। 'এসো, এবার বোটের মালিককে খুঁজে বের করি।'

রানার পিছু পিছু ইস্পাতের ছোট্ট মই বেয়ে গরম ও বাষ্পে ঢাকা এঞ্জিন

রুমে নামছে লিমা। জায়গাটা এত গরম, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘামতে শুরু করল রানা। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে লিমাকে ফিরে যাবার ইঙ্গিত করল ও। এরইমধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছিল লিমার, পালিয়ে আত্মরক্ষা করল সে।

আওয়াজটা কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে। রানা একজন গরিলাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর কোন ধারণাই ছিল না যে হেগেন নিগ্রো। এক কোণে বসে একটা সিলিন্ডার কেসিং-এ বিশাল এক হাতুড়ি পিটছে সে। তার কাঁধ ছুলো রানা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেগেন, হাতুড়ি ফেলে দিয়ে হাসল–সুচেতার কথাই ঠিক, শিশুর মত সরল মুখ, হাসিটা ঝকঝকে ও নির্মল। 'দেখা যাচ্ছে মিসেস্ পাটনায়েকের কথা মিথ্যে নয়, আমার নতুন ফ্রেন্ড জেমস বন্ড সিরিজের একজন হিরো। হাই, রানা!' তার গায়ে ছেঁড়া ও নোংরা শার্ট, কোমরে তেল চিটচিটে শর্টস।

'হাই!' বলল রানা। 'তোমার বোটের কি অবস্থা?'

'এর নাম বীস্ট, চীন সাগরের সবচেয়ে দ্রুতগামী বোট,' গর্বের সঙ্গে বলল হেগেন। 'সব কিছু ঠিক আছে, শুধু সামান্য মেরামতের কাজ বাকি।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'ডেকে এসো, মেয়েটার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

ডেকে উঠে ওরা দেখল রশির পাকানো একটা কুণ্ডলীর ওপর বসে আছে লিমা, হেগেনের পানামা হ্যাট দিয়ে নিজেকে বাতাস করছে। রানা পরিচয় করিয়ে দিতে গলা ছেড়ে হেসে উঠল হেগেন। অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে রানা ও লিমা। হাসি থামিয়ে হেগেন বলল, 'আমার বোটের নামকরণটা আজ সার্থক হলো মিস লিমা পায়ের ধুলো ফেলায়। কম্বিনেশনটাকে এখন বিউটি অ্যান্ড দ্য বীস্ট বলা যাবে।'

সেই মুহূর্ত থেকে হেগেনের ভক্ত হয়ে গেল লিমা। হাত নোংরা হবে জেনেও যেচে পড়ে হ্যান্ডশেক করল সে। হেগেন হাতটা তো ধরলই, ভাল করে দেখার জন্যে ছাড়তেও দেরি করল কয়েক সেকেন্ড। 'ওপরঅলা তোমাকে বিশেষ যত্ন নিয়ে বানিয়েছে, মিস।' হাতটা ছেড়ে দিয়ে সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াল সে।

বাল্কহেডে পিঠ দিয়ে ডেকে বসল ওরা। ফ্রিজ থেকে দুটো কোকের বোতল বের করে আনল হেগেন। পুরানো, কিনারা ভাঙা একটা পাইপ ধরাল নিজে। অভিযান, সোনা, রেড ড্রাগন, খেমাররুজ গেরিলা ইত্যাদি কোন বিষয়েই ওরা কথা বলল না। হেগেন নিউ ইয়র্কের গল্প করল। লিমা বলল ইংল্যান্ড তার কেমন লেগেছিল।

আধ ঘণ্টা পর কাজ শেষ করার তাগাদা দিল রানা। লিমাকে ডেকে থাকতে বলে হেগেনের সঙ্গে এঞ্জিন রুমে নেমে গেল ওরা। প্রচণ্ড গরমে গায়ের শার্ট খুলে ফেলতে বাধ্য হলো রানা। এঞ্জিনের পাশে ছোট জায়গায় শরীর কুঁকড়ে ঢুকতে হলো, হেগেনের সাহায্য নিয়ে সিলিন্ডার কেসিংটা জায়গা মত নিজেই ফিট করছে ও। কাজ চলছে, এই ফাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল হেগেনকে। লঞ্চে এক হাজার মণ সোনা আছে শুনে গম্ভীর হয়ে উঠল হেগেন, বলল, 'তাহলে তো নিশ্চয়ই মারামারি-কাটাকাটি হবে। প্রশ্ন হলো, আমরা কে

কে যাচ্ছি। সোনা উদ্ধার করার পর নিজেরাই নিজেদেরকে খুন করব না তো?'

'ওই সোনা আমাদের নয়,' বলল রানা। 'কাজেই ভাগাভাগির প্রশ্ন আসে না। দলে আর মাত্র একজন থাকবে–কার্ল ডয়েস।'

'কোন ডয়েস? বক্সার? জার্মান?'

উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল রানা। ভয় লাগছে, কি না কি শুনতে হয়। 'হ্যাঁ।'

'ওটা তো একটা গোক্ষুর, সব সময় ফণা তুলে আছে!' স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট দেখাল হেগেনকে। 'এত থাকতে ডয়েসকে তোমার পছন্দ হলো?'

'বিপদের সময় যোগ্য আর কাউকে পেলাম না, কি করব?' তারপর হেগেনকে পরীক্ষা করার জন্যে বলল রানা, 'এখনও দেরি হয়ে যায়নি। বলো তো ওকে বাদ দিই।'

দু'সেকেন্ড চিন্তা করে মাথা নাড়ল হেগেন। 'এখানে ওর রিপ্লেসমেন্ট সম্ভব নয়। ডয়েস যোগ্য লোক, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কাজে একবার মন লাগালে, একাই একশোজনকে হারিয়ে দেবে। তবে চোখ-কান একটু খোলা রাখতে হবে, এই যা।'

কাজ সেরে ডেকে উঠে আসতে রানাকে দেখে নাক কোঁচকাল লিমা। 'আপনার ট্রাউজারের এ কি অবস্থা হয়েছে!'

হাসতে হাসতে মেইন কেবিনে ঢুকল রানা। যা আশা করেছিল, ইতিমধ্যে ওদের লাগেজ বোটে পৌঁছে গেছে। রঙচটা নীল ডেনিম পরল ও, সঙ্গে সোয়েট শার্ট আর রোপ-সোল্‌ড্ শূ। সবশেষে তোবড়ানো আর লবণের দাগ লাগা একটা ক্যাপ পরল মাথায়। ডেকে বেরিয়ে আসতেই হেসে উঠল লিমা। 'ঠিক যেন হেমিংওয়ের একটা চরিত্র!'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'হার্ডি এখনও আসছে না কেন?' লিমার মন্তব্য যেন শুনতে পায়নি। বলতে না বলতে জেটিতে দেখা গেল জেমস হার্ডিকে। বয়েস পঞ্চান্ন হলেও, এখনও শক্ত-সমর্থ সে। এই পরিবেশে কমপ্লিট সুট পরে থাকায় একেবারেই যেন মানাচ্ছে না।

'তোমরা সবাই তৈরি, রানা?' বোটে উঠেই জানতে চাইল হার্ডি। 'বন্দরে বেশিক্ষণ জাহাজ ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না। জিনিসগুলো বুঝে নিয়ে ছেড়ে দাও আমাকে। আমার পাওনাও তোমাকে এখুনি মিটিয়ে দিতে হবে।'

হেগেন বিড়বিড় করে উঠল, কেউ শুনতে না পেলেও রানার কানে শব্দগুলো ঠিকই ঢুকল, 'ওরে বাপরে! এই কিলার শার্কটাকেও জড়ানো হয়েছে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে দেরি করিয়ে দেয়া ঠিক হবে না,' হার্ডিকে বলল রানা। 'তবে আমার একজন লোক এখনও এসে পৌঁছায়নি। আমি চাইছি সবাইকে নিয়ে আলোচনা করে রনদেভোর সময়টা ঠিক করব।'

হঠাৎ সবাইকে সচকিত করে তুলল একটা মোটর বোটের আওয়াজ। দুপুরের নিস্তব্ধ পরিবেশ চুরমার হয়ে গেল। সাগর থেকে সরু প্যাসেজ হয়ে ইনলেটে ঢুকল বোটটা। মোটর বন্ধ হতে আস্তে করে জেটিতে ভিড়ল সেটা। ওদের দিকে হেঁটে আসছে দীর্ঘদেহী সুপুরুষ একজন বক্সার–চালচলনে

হলিউডের হিরো বললেই হয়। 'হ্যালো দেয়ার।' একটা হাত তুলে নাড়ল সবার উদ্দেশে।

কাছে আসতে দেখা গেল ডয়েসের নীল চোখে বিদ্রূপ ঝিলিক মারছে। হেগেনই তার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিল। পরস্পরকে আগে থেকে চেনে ওরা।

দেখা গেল লিমাকে হার্ডির খুব পছন্দ হয়েছে। তার প্রতিটি কথায় লিমাও হাসছে। ওরা দু'জনই পথ দেখাল, ওদের পিছু নিয়ে বাংলোয় ফিরছে সবাই। রানার পিছনে রয়েছে হেগেন আর ডয়েস, ওদের দু'একটা কথা শুনতে পাচ্ছে ও।

'স্বভাবটা এখনও কি আগের মত আছে, নাকি বদলেছে?' ডয়েসকে জিজ্ঞেস করল হেগেন। 'আমি যতটুকু বুঝি, রেড ড্রাগন তোমাকে ধ্বংস না করলে জুয়া আর মেয়েমানুষই তোমাকে ধ্বংস করত।'

'জেসিকা আমাকে নরক থেকে ফিরিয়ে এনেছিল,' বলল ডয়েস। 'ও মারা যাবার পর কোন কিছুই আর পরোয়া করি না।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি খবর? মদ তোমাকে খাচ্ছে তো?'

'চুপ! চুপ!' ফিসফিস করল হেগেন। 'ফ্রেন্ড শুনে ফেলবে!'

'ব্যক্তিগত আলাপ বাদ দাও,' বলল ডয়েস। 'তোমার ফ্রেন্ড, মাসুদ রানা, ঠিক কোন জাতের বাস্টার্ড একটা আইডিয়া দিতে পারো? খাসা মালটাকে কোত্থেকে বাগাল বলো তো? ওই সুন্দরীই তো সোনার হদিশ দিয়েছে ওকে, তাই না? নিশ্চয়ই পুরোটা একা মেরে দেয়ার তালে আছে?'

উত্তরে চাপাস্বরে কিছু বলল হেগেন, রানা শুনতে পেল না।

ডয়েস বলল, 'কি? ওকে আমার ভয় করে চলতে হবে? ইমপসিবল! নেভার! তুমি দেখছি হাসালে আমাকে!'

ঝট্ করে ঘুরে তার মুখোমুখি হলো রানা। 'শুধু একটা কথা মনে রেখো, ডয়েস। এই ট্রিপে তুমি স্রেফ একজন ভাড়াটে লোক। আমি যখন যা বলব, প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে তোমাকে।'

ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে একটা হাত কপালের কাছাকাছি তুলল ডয়েস। 'হের, মাসুদ রানা!' ঠোঁটে শয়তানি হাসি। 'তবে সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমি তার মনোরঞ্জন না করে পারি না। ট্রিপটা ইন্টারেস্টিং হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওটা কি তোমার রিজার্ভ করা জিনিস? মানে, বলতে চাইছি, আমরাও একটু-আধটু সুযোগ পাব কিনা...'

ধাপ বেয়ে প্রায় পাহাড়-প্রাচীরের মাথায় উঠে এসেছে ওরা। ঝট্ করে ডয়েসের কলার ধরল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে কোমর থেকে মাথার দিকটা পাহাড়ের কিনারায় ঝোলাল। 'তোমার নিচে একশো ফুট অনন্তলোক, ডয়েস। তোমাকে ফেলে দিতে আমার হাত কাঁপবে না। নিজের ভাল চাইলে এখন থেকে মুখ সামলে কথা বলবে। আর ভুলেও মেয়েটাকে বিরক্ত করবে না। পরিষ্কার?'

ধারাল কি যেন একটা ঝিক্ করে উঠল ডয়েসের চোখে। তারপর হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'শিওর! শিওর! পরিষ্কার।'

কিনারা থেকে টেনে এনে তাকে ছেড়ে দিল রানা, ঘুরে পা বাড়াল।

অকস্মাৎ খপ করে রানাকে দু'হাতে ধরল ডয়েস, প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের দিকে ঘোরাল ওকে, হিসহিস করে বলল, 'কিন্তু তুমি আর ভুলেও কখনও আমার গায়ে হাত দিয়ো না, রানা! যেদিন দেবে, দু'জনের একজন বেঁচে থাকবে।'

ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। তবে অনুভব করল, পেশীতে ঢিল দিয়েছিল ডয়েস, তা না হলে নিজেকে ছাড়ানো এত সহজ হত না।

এই সময় ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে ওদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে লিমা বলল, 'সবাই চলে এসো। লাঞ্চ রেডি।'

হার্ডি লাঞ্চে বসতে রাজি হলো না। বড় একটা ব্যাগে ভরে অস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে এসেছে সে, রানাকে সব বুঝিয়ে দিল। একটা ম্যাপ বের করে সবাইকে নিয়ে টেবিলে বসল রানা, হাতে পেন্সিল। অভিযানের রুটটা দেখাল সবাইকে, সম্ভাব্য বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ সম্পর্কে আভাস দিল, সবশেষে বলল, 'আমার হিসেবে চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ ঘণ্টার ট্রিপ।'

একটা কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করল হার্ডি। মুখও চলছে। 'আমার হিসেবে, তোমরা ওখানে পৌঁছুবে কাল রাতে কোন এক সময়। প্রথমবারের চেষ্টাতেই মিস লিমা যদি দেখিয়ে দিতে পারে লঞ্চটা কোথায় ডুবেছে, তোমরা নির্দিষ্ট লেগুনে পৌঁছুবে শুক্রবারে। সেদিনই ডাইভ দেয়া সম্ভব হতে পারে। যাই ঘটুক না কেন, শনিবার রাতের অন্ধকারে ফিরতি পথ ধরার জন্যে তৈরি হতে হবে তোমাদের। রানা, তোমাদের জন্যে আমি চ্যানেলের মুখে অপেক্ষা করব রোববার সকাল ছ'টায়। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

হার্ডি বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর খেতে বসল ওরা। লিমাই পরিবেশন করছে। হেগেনের দুই বাচ্চা-সাগরেদ অস্ত্র আর গোলাবারুদ তুলছে লঞ্চে।

লাঞ্চের পর একা একটা ঘরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙল সন্ধের ঠিক আগে। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে লিমাকে কোথাও পেল না রানা। দুশ্চিন্তাটা আরও বাড়ল বাড়িতে ডয়েসও নেই দেখে। হেগেনের ঘুম ভাঙাল ও, জানতে চাইল, 'ওরা কোথায়? লিমা আর ডয়েস?'

বিছানায় বসে একটা প্রকাণ্ড পকেট-ওয়াচ বের করল হেগেন। সময় দেখে বলল, 'লিমাকে নিয়ে জেলেদের গ্রাম দেখতে গেছে ডয়েস। তা প্রায় দু'ঘণ্টা তো হবেই।'

বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, অস্থির বোধ করছে। একটু পরই ভারী গলার আওয়াজ ভেসে এল, ধাপ বেয়ে উঠে আসছে ডয়েস। এক সময় দেখা গেল ওদেরকে। ডয়েসের কি একটা কথা শুনে অদম্য হাসি চাপার জন্যে মুখে হাতচাপা দিয়ে কুঁজো হয়ে যাচ্ছে লিমা।

ডয়েসই প্রথম রানাকে দেখতে পেল। বিজয়ীর হাসি মুখে, চোখে বিদ্রূপের ঝিলিক, কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'সময়টা যে কি আনন্দে কাটল, বললে তুমি

বিশ্বাস করবে না। প্রার্থনা করতে ইচ্ছে করছে, ট্রিপটা শুরু হবার পর কোনদিন যেন শেষ না হয়।'

'আমরা দশটায় রওনা হচ্ছি,' লিমাকে বলল রানা। 'হেগেন একবার শহরে যাবে, তোমার যদি কিছু লাগে ওকে জানিয়ে দিয়ো।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ডয়েস। লিমা রানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। তারপর লিমা জানতে চাইল, 'আপনি কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট? ওর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম বলে?'

'অসন্তুষ্ট নই,' বলল রানা। 'চিন্তিত।'

'আপনি কি আমাকে ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে বলেন?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'ও কি বিপজ্জনক লোক?'

'বিপজ্জনক কিনা সেটা তোমাকেই আবিষ্কার করে নিতে হবে, লিমা,' বলল রানা। 'আমি বড়জোর তোমাকে সাবধান হতে বলতে পারি।'

'ধন্যবাদ,' বলে রানার একটা হাত ধরল লিমা। 'চলুন, বারান্দায় বসে গল্প করি সবাই।'

রাত ঠিক ন'টায় রওনা হলো ওরা।

ডয়েসকে ডেকে হুইলহাউসের দায়িত্ব নিতে বলল রানা। চিন্তায় মগ্ন হয়ে চার্টস আর নেভিগেশনাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে বিশ মিনিট কাজ করল ও, তারপর একটা কোর্স দিল ডয়েসকে, বলল, 'দু'ঘণ্টা পর পালাবদল, হেগেনকে পাঠিয়ে দেব।'

নিচে নেমে এসে নিজের ব্যাগ থেকে কোল্ট অটোমেটিকটা বের করল রানা, পরিষ্কার করে তেল মাখিয়ে পালিশ করা লেদার হোলস্টারে ভরল। কোমরে একটু ঢিলেভাবে পরল ওটা। ওখান থেকে গ্যালিতে এসে দেখল কফি বানাচ্ছে লিমা। 'তুমি তাহলে রাঁধতেও জানো?'

'শুধু কম্বোডিয়ান নয়, থাই আর চাইনিজ ডিশও তৈরি করতে পারি,' হাসিমুখে বলল লিমা। কফির মগটা রানার হাতে ধরিয়ে দেয়ার সময় হোলস্টার দেখে শুকিয়ে গেল তার মুখ। 'আপনি এত তাড়াতাড়ি বিপদের আশঙ্কা করছেন?'

'এদিকের পানিতে প্রতি মুহূর্তে বিপদ,' বলল রানা। 'আমরা ভিয়েৎনামকে পিছনে ফেলে এসেছি। গালফ অভ সিয়াম-এর উপকূলে জলদস্যু গিজগিজ করছে, জানো না? সত্যি-মিথ্যে বলতে পারব না, শুনেছি পাইরেটদের কোন কোন দলের নেতৃত্ব দেয় মেয়েরা।'

খিলখিল করে হেসে উঠল লিমা। 'আপনি ঠাট্টা করছেন!'

'না, আমি সিরিয়াস। ডেকে থাকার সময় যদি কোন মোটর সাম্পান বা জাঙ্ক দেখতে পাও, কোন সন্দেহ না হলেও তাড়াতাড়ি ডাকবে আমাকে। কাছাকাছি আসার আগে দেখা যায় ওগুলোয় মাত্র দু'চারজন লোক আছে, তারপর হঠাৎ আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে কয়েক ডজন, সবার হাতে অস্ত্র।'

ছুরি দিয়ে স্যান্ডউইচ কাটছে লিমা। মগের কিনারা দিয়ে তাকে দেখছে রানা। একখানা ডেনিম আর পোলো নেকড্ সোয়েটার পরেছে সে। খালি মগটা

নামিয়ে রাখল ও, বলল, 'কাজ আছে, পরে দেখা হবে। সময় থাকতে যতটা পারো ঘুমিয়ে নিয়ো।'

এঞ্জিন রূমে নেমে হেগেনকে খুব ব্যস্ত দেখল রানা। এঞ্জিনের বিভিন্ন পার্টসে তেল মাখাচ্ছে, ইন্সপেকশন ল্যাম্পটা ঝুলছে মাথার পাশে। ধাতব গর্জনে কান পাতা দায়। হেগেনের কাঁধে টোকা দিল ও, সে মুখ ফেরাতে ইঙ্গিতে ওপরদিকটা দেখাল। ওর পিছু নিয়ে ডেকে উঠে এল হেগেন। 'সব ঠিক আছে তো?'

'সব ঠিক।' হাসল হেগেন।

'আমি স্পীড আরও বাড়াতে চাই,' বলল রানা।

বিস্মিত হলো হেগেন। 'কিন্তু তুমি আমাকে বলেছিলে স্পীড বাড়ালে কোস্ট গার্ড দেখে সন্দেহ করতে পারে!'

'হ্যাঁ, বলেছিলাম। কিন্তু এখন ভাবছি, কোস্ট গার্ডের চেয়ে স্পীড বেশি তুলতে পারলে ওরা দেখলেই বা ক্ষতি কি? এখন যা স্পীড, শ্রী-ওমবেলকে পাশ কাটাতে কাল বিকেল হয়ে যাবে। ওদিকে বড় আকারের অনেক জাহাজ থাকার কথা, সেগুলোর মাঝখানে আমাদের এই ছোট বোট মানুষের মনে কৌতূহলের জন্ম দেবে। তাছাড়া, সিহানুকভিল ন্যাভাল বেসকে ম্যাট হিথ যদি সতর্ক করে দিয়ে থাকে? বেসকে হয়তো সে অনুরোধ করবে, আমাদেরকে থামাবার দরকার নেই, তবে দেখতে পেলে তাকে যেন জানানো হয়। আমি চাই না এরকম কিছু ঘটুক।'

মাথা ঝাঁকাল হেগেন। 'ঠিক আছে। কিন্তু তারপর কি করব আমরা? জলাভূমিতে কি দিনের বেলায় ঢোকা উচিত হবে?'

'কে বলল দিনের বেলা ঢুকব? ন্যাভাল বেস আর শ্রী-ওমবেল বন্দর পেরিয়ে যাবার পর স্পীড আবার কমিয়ে আনব, চ্যানেল হয়ে আমাদের সুবিধে মত সময়ে জলায় ঢুকব কাল।'

'তাই বলো!'

হুইলহাউসে ফিরে এসে ডয়েসকে স্পীড বাড়াতে বলল রানা, তারপর কেবিনে এসে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। গ্যালি থেকে হেগেনের হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। লিমা তাকে নিশ্চয়ই স্যান্ডউইচ আর কফি খেতে দিয়েছে। মিসেস পাটনায়েকের কথা মনে পড়ল রানার। শেষবার টেলিফোনে তাঁকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়েছে ও। আভাসে গভর্নরকে জানাতে হবে, সোনা উদ্ধারের জন্যে লিমাকে নিয়ে কাস কং-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে রানা। সুচেতা যদি খবর পান ম্যাট হিথও রওনা হয়ে গেছে, গভর্নরকে তখন স্পষ্ট ভাষায় তিনি জানাবেন, ম্যাট হিথই রেড ড্রাগন। এই তথ্য গভর্নরের কাছে হয়তো নতুন কোন সংবাদ নয়। সুচেতা তাঁকে তথ্যটা দেবেন ভূমিকা হিসেবে। তারপর পরামর্শ দিয়ে বলবেন, কম্বোডিয়া থেকে ম্যাট হিথ না-ও ফিরে আসতে পারে। যদি না আসে, গ্রীন ব্রিগেডকে নিরস্ত্র করার জন্যে প্রস্তুত থাকা দরকার তাঁর। সবচেয়ে ভাল হয় সরাসরি লিসবনের সঙ্গে যোগাযোগ করে গভর্নর যদি তাদের সাহায্য চান। সরকারী পুলিসের সংখ্যা বাড়ানোটা একান্ত জরুরী। গ্রীন

ব্রিগেডের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করতে হবে।

রেন্ট-আ-কারের মার্সিডিজটা বিউটি পার্লারের গ্যারেজে রয়ে গেছে, সুচেতা নিশ্চয়ই সেটা ফেরত পাঠাবেন।

এ-সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা। ঘুম ভাঙল রাত দুটোয়। একটা ওভারকোট গায়ে চাপিয়ে দরজার দিকে এগোতে যাবে, ওপরের বাঙ্ক থেকে নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে এল। দেশলাই জ্বেলে ভাল করে তাকাল রানা। ওপরের বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে ডয়েস। ঘুমের মধ্যেও শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে রয়েছে ঠোঁটের কোণ। হাসি চেপে নিঃশব্দে ডেকে বেরিয়ে এল রানা।

সামান্য কুয়াশা দেখা যাচ্ছে। তীরবেগে ছুটে চলেছে বীস্ট। চাঁদ না থাকলেও গোটা আকাশকে রত্নখচিত মনে হলো, প্রতিটি তারা জ্বলজ্বল করছে। কাঁচ লাগানো হুইলহাউসের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা। হুইলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেগেন, অটল একটা পাথরের মূর্তি যেন। ভেতরে কম্পাসের ছাড়া অন্য কোন আলো নেই, তাতে শুধু উদ্ভাসিত হয়ে আছে তার মুখ। 'সব ঠিক আছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল হেগেন। 'সব ঠিক, ফ্রেন্ড।' সরে গিয়ে হুইলের সামনের জায়গাটা রানাকে ছেড়ে দিল সে। সস্তা হুইস্কির ঝাঁঝাল গন্ধ ঢুকল রানার নাকে। রাগ হলো ওর, তবে চেপে রাখল। হেগেন বেরিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে বলল, 'একটু রয়েসয়ে খেয়ো, হেগেন। কাজের সময় তোমাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যেন পাই।'

'তুমি আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারো,' আহত গলায় বলল হেগেন। ডেকে বেরিয়ে গুনগুন করে গান গাইতে শুরু করল।

হুইলটা হালকাভাবে ধরে বোর দু'পাশে সাদা ফেনার উথলে ওঠা দেখছে রানা। মাঝে মধ্যে পানির ছিটে লাগছে জানালায়।

তিনটে দশে বৃষ্টি শুরু হলো। দরজা খোলার আওয়াজ পায়নি রানা, কফির গন্ধ পেয়ে বুঝতে পারল ভেতরে লিমা ঢুকেছে। 'রাতের এসময়ে বিছানা কি ক্ষতি করল?'

'কাঁটার মত বিঁধছিল গায়ে,' বলে হেসে উঠল লিমা। 'খোঁচা মেরে বলল, যাও, তোমার ত্রাণকর্তার সেবা করো। এখানে কি বসার কোন ব্যবস্থা নেই?'

দেয়ালে কব্জা দিয়ে আটকানো একটা চেয়ারের ভাঁজ খুলল রানা। 'এখানে বসো।'

মগটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল লিমা। 'স্যান্ডউইচ?'

নিঃশব্দে খাচ্ছে দু'জন। অন্ধকারে শুধু পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে ওরা। খাওয়া শেষ হবার পর কেউ কোন কথা বলছে না। মাঝে মধ্যে লিমার দিকে তাকাচ্ছে রানা, দৃষ্টিতে কোন প্রস্তাব বা ইঙ্গিত নেই। উত্তরে মিষ্টি হাসি উপহার দিচ্ছে মেয়েটা, তাতে কোন রকম প্রতিশ্রুতি বা আমন্ত্রণ নেই।

বাইরে তুমুল বৃষ্টি।

'বীস্টকে পছন্দ হয়েছে বিউটির?' এক সময় নিস্তব্ধতা ভেঙে জানতে চাইল রানা।

হাসতে গিয়েও হাসল না লিমা। 'বাবা যে লঞ্চটা ভাড়া করেছিল, সেটার মতই পুরানো এটা। বিপদের সময় বিগড়ে যাবে না তো?'

সে-প্রশ্ন রানারও। লিমা ভয় পাবে, তাই কিছু বলল না। 'আমার হিসেবে, আর মিনিট পনেরোর মধ্যে সিহানুকভিল বেসকে পাশ কাটাব আমরা। কিছু ঘটতেও পারে।'

'ওদের ঘুম ভাঙাব?'

'না। ওরা কোন সাহায্যে আসবে না।' চোখ সরু করে বাইরে তাকাল রানা। বৃষ্টির মাত্রা মুহূর্তের জন্যে কমে আসতে ডান পাশে একটা কুঁজ দেখা গেল সাগরে। ছোট একটা দ্বীপ। 'পোর্টসাইডের দিকে তাকিয়ে থাকো,' লিমাকে বলল ও। 'ওদিকে আরও একটা দ্বীপ পড়বে। ওখানে একটা লাইট হাউস আছে।'

পরবর্তী আধ ঘণ্টা ফুল থ্রটলে ছুটল বীস্ট। শুধু সিহানুকভিল নয়, রানা আন্দাজ করল ইতিমধ্যে শ্রী-ওমবেলকেও ছাড়িয়ে আসার কথা ওদের। লাইট হাউস চোখে পড়েনি, তার কারণ ওটা নিভিয়ে রাখা হয়েছে।

আরও দশ মিনিট পর হঠাৎ বৃষ্টির পর্দা পাতলা হয়ে এল। অকস্মাৎ স্টারবোর্ড সাইডে আলোর কয়েকটা বিন্দু উদয় হলো, পরমুহূর্তে ঢাকা পড়ে গেল জলকণার ঘন মেঘে। হেসে উঠল রানা। 'আর কোন চিন্তা নেই, অনেকদূর দিয়ে শ্রী-ওমবেলকে পাশ কাটাচ্ছি আমরা। কোর্সে কোন ভুল নেই।'

'এখন কি হবে?'

'ঘণ্টা দেড়েক ফুল স্পীডে ছুটব, তারপর স্টারবোর্ডের দিকে লাইট দেখতে পাব,' বলল রানা। 'ওদিকে ছোট কয়েকটা দ্বীপ আছে। ওগুলোর ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে হবে। আবহাওয়ার জন্যে প্রকৃতিকে ধন্যবাদ দাও।'

এঞ্জিনের শব্দটা একঘেয়ে হয়ে উঠল। বৃষ্টিও থামছে না। এক সময় চেয়ারে বসে ঢুলতে শুরু করল লিমা। রানা লক্ষ রাখল, পড়ে না যায়। অন্ধকার সাগরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে ওকে। আরেকটা চেয়ারের ভাঁজ খুলে লিমার পাশে বসল ও। যেন টের পেয়েই ওর কাঁধে মাথাটা কাত করল লিমা।

ছ'টা পনেরো মিনিটে লিমার ঘুম ভাঙাল রানা। 'পোর্টসাইডে তাকিয়ে থাকো, আলো দেখতে পেলে বলবে আমাকে।'

পাঁচ মিনিট পরই আলোটা দেখতে পেল লিমা, খুদে একটা বিন্দুর মত।

'উপকূল থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে ওটা একটা লাইটহাউস,' বলল রানা। 'কাস কং ছাড়িয়ে বাটামবাং-এর দিকে যাচ্ছি আমরা। আর দশ মিনিট পর কোর্স বদলাব।'

কোর্স বদলাবার পর অন্ধকারে বিশ মিনিট ছুটল বোট। সকাল হলেও অন্ধকার কাটেনি। তুমুল বৃষ্টি ওদের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। স্পীড কমিয়ে আনল রানা। 'জাহাজ চলাচলের পথ থেকে সরে এসেছি আমরা,' লিমাকে বলল ও।

'এরপর কি?'

'কিছু না, রাত না নামা পর্যন্ত এখানে ঘাপটি মেরে থাকব।'

ধীরে ধীরে থামল বৃষ্টি, তবে সূর্য উঠল না। দিনের আলো খুবই ম্লান। এত শীত পড়েছে যে ঠক-ঠক করে কাঁপছে লিমা। তবু হুইলহাউস থেকে নড়তে চাইছে না সে, ভাগাবার জন্যে ধমক দিতে হলো রানাকে।

সকাল আটটায় হুইলহাউসে ঢুকল ডয়েস। কেবিনে ফিরেই ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

বেলা তিনটের দিকে হেগেন ওর ঘুম ভাঙাল। ইতিমধ্যে হেগেন আর ডয়েসকে লাঞ্চ খাইয়েছে লিমা। রানা লক্ষ করল, কেবিনে আসা-যাওয়া করার সময় লিমার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না ডয়েস। তার এই তাকানো রানা দেখে ফেলেছে, বুঝতে পেরে মুহূর্তের জন্যে ঠোঁটের কোণে তিক্ত ও বিদ্রূপাত্মক রেখাগুলো অদৃশ্য হলো। শুধু যে বিব্রত বোধ করছে তা নয়, খানিকটা রেগেও গেছে।

লিমা পরিবেশন করল রানাকে। খাওয়া শেষ হতে হেগেনকে ছুটি দেয়ার জন্যে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। হেগেন বেরিয়ে গেছে পাঁচ মিনিটও হয়নি, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ডয়েস। দরজা বন্ধ করে কবাটে হেলান দিল সে, ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। ডয়েস আসবে, এ যেন রানা জানত। অপেক্ষা করছে ও। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করছে না।

'তোমার সঙ্গে আমার কথা হওয়া দরকার,' রানার পাশে চলে এল ডয়েস।

'কি কথা?'

ধোঁয়ার একটা নিখুঁত বৃত্ত তৈরি করল ডয়েস। 'প্রথম কথা, এই অভিযান সম্পর্কে বিশদ কিছু আমাকে জানানো হয়নি।' রানা হাসছে দেখে রেগে গেল সে। 'হাসছ যে?'

'হাসছি এইজন্যে যে বারবার তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়, তুমি আসলে আমার ভাড়াটে লোক। বিশদ জানার অধিকার নেই তোমার, তাই জানানো হয়নি।'

'মেয়েটাকে তুমি ঠকাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'সেটা তোমার মাথাব্যথা নয়,' বলল রানা। 'তবে ধারণাটা তোমার ভুল। সব সোনাই যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে।'

'তাই যদি যাবে, তাহলে জেমস হার্ডি কেন তুলে নেবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস। 'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, রানা। সে আমাকে আভাস দিয়েছে, উদ্ধার করা সোনা তার মাধ্যমেই বিক্রি করবে তুমি।'

'এটা তার কল্পনা,' বলল রানা। 'অপেক্ষা করো, শেষ পর্যন্ত কি ঘটে নিজেই তো দেখতে পাবে।'

'যা-ই ঘটুক, রানা, আমার এক কথা,' হেঁড়ে গলায় বলল ডয়েস। 'ট্রেজারের ভাগ তুমি যদি নাও, আমাকেও নিতে হবে। সোনার মালিক লিমা, সে যদি বঞ্চিত হয়, অবশ্যই আমাকে লাভবান হতে হবে।'

'কে বলল, সোনার মালিক লিমা?' জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক, এ নিয়ে আমি আর আলাপ করতে চাই না। তুমি এখন যাও।'

'তা যাচ্ছি, কিন্তু ভাগাভাগির কথাটা মনে রেখো,' বলে বেরিয়ে গেল

ডয়েস।

ছ'টা পর্যন্ত হুইলে থাকল রানা, তারপর ডয়েস এসে ছুটি দিল ওকে। কিছু খাবার জন্যে গ্যালিতে নেমে এল ও, দেখল লিমা ওদের জন্যে নাস্তা তৈরি করছে। হেগেনকে কোথাও দেখেনি, তাই জিজ্ঞেস করল, 'দৈত্যটা কোথায়?'

অবাক হয়ে লিমা বলল, 'আমি তো ভাবছিলাম আপনি তাকে এঞ্জিন রূমে কোন কাজ দিয়েছেন। বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেল দেখছি না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দাঁড়াল রানা। এঞ্জিন রূমে নেমে দেখে মইয়ের গোড়ায় নেতিয়ে পড়ে আছে হেগেন, দুনিয়া সম্পর্কে বেখবর। হুইস্কির ঝাঁঝ ঢুকল নাকে, হেগেনের পায়ের কাছে গড়াগড়ি খাচ্ছে একজোড়া খালি বোতল। তিন মণ ওজনের বোঝাটা অনেক কষ্টে ঘাড়ে তুলে মই বেয়ে উঠে এল ডেকে। লিমাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'ও কি অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, অসুস্থ,' বলে রশি বাঁধা একটা বালতি ফেলল রানা সাগরে। মুখে-মাথায় দু'তিন বালতি পানি ঢালার পরও জাগছে না হেগেন। 'খেয়াল রাখো,' লিমাকে বলল ও, তারপর আবার নেমে এল এঞ্জিন রূমে।

একটু খুঁজতেই বড়সড় কার্ডবোর্ড বাক্সটা পাওয়া গেল, ভেতরে সারি সারি শুয়ে আছে হুইস্কির বোতল। বাক্সটা ডেকে তুলে আনল রানা, রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে বোতলগুলো এক এক করে সাগরে ছুঁড়ে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে দুনিয়াদারি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে হেগেন, কি ঘটছে বুঝতে পেরে টলতে টলতে সিধে হলো। 'না, ফ্রেন্ড, প্লীজ! তুমি আমার এত বড় সর্বনাশ কোরো না!'

'তোমাকে তো আমি আগেই সাবধান করেছিলাম, কাজেই এখন তোমাকে ভুগতে হবে। মাত্র দুটো বোতল থাকবে, চুমুক দিতে পারবে আমি যখন বলব।' কথা শেষ করে একজোড়া বোতল লিমার হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

অকস্মাৎ রানার পিঠে লাফিয়ে পড়ল হেগেন, দুর্বোধ্য ভাষায় কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। রেইলিং থাকায় ছিটকে সাগরে পড়ল না রানা। ওর গলা ধরে ঝুলে পড়েছে হেগেন। নিজেকে ছাড়াতে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা কনুই চালাল পিছন দিকে, আরও একটু জোরে চালালে হেগেনের পাঁজরের একটা হাড় ভেঙেই যেত। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, ছেড়ে দিল রানাকে। ঘুরল রানা, ঠাস করে চড় কষাল হেগেনের গালে। 'এবার আশা করি নেশাটা কাটবে!'

অবোধ শিশুর মত ফোঁপাচ্ছে হেগেন। তার এই আচরণে হঠাৎ খুব বিব্রত বোধ করল রানা, শার্টের কলারটা ছেড়ে দিতে ডেকের ওপর পড়ে গেল সে, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। তার পাশে হাঁটু গাড়ল লিমা, এক হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে। 'এর কি কোন প্রয়োজন ছিল?' মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল রানাকে। 'চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে, এরকম একটা লোককে আপনি চড় মারলেন?' লিমার চেহারায় বেদনা।

রানা কিছু বলতে যাবে, এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল, বোট থেমে যাচ্ছে। নিস্তব্ধ পরিবেশে গমগম করে উঠল ডয়েসের গলা, 'কথাটা ঠিক, রানা, তোমার চেয়ে হেগেনের বয়েস অনেক বেশি। মারামারি করার ইচ্ছে থাকলে কাছাকাছি

বয়েসের কাউকে বেছে নিচ্ছ না কেন?'

চ্যালেঞ্জটা স্পষ্ট। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে সে, কাঠামোটা বিশাল দেখাচ্ছে, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, সোনালি চুলে খেলা করছে উজ্জ্বল রোদ। একটা হাত তুলে খোলা ডেকে আসার আহ্বান জানাল রানা। হালকা পায়ে, শিকারী বিড়ালের মত, ফাঁকা ডেকে চলে এল ডয়েস। রাগ বা আক্রোশ নয়, তার চোখে শ্লেষ।

ক্যাপ খুলে ভুরু থেকে ঘাম মুছল রানা, অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত হলেও কথাটা সত্যি, গোটা ব্যাপারটা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে ওর মন, সংশ্লিষ্ট হতে পারছে না। চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করতে হবে, এটা ও পুরোপুরি উপলব্ধি করছে। প্রতিটি বিষয়ের সাফল্য এই শক্তি-পরীক্ষার ওপর নির্ভর করছে। হেগেনের পক্ষ নিয়ে নৈতিক বীরত্ব দেখানোর ভূমিকা পালন করছে ডয়েস, ব্যাপারটা তা নয়। রানাকে অপদস্থ ও অপমান করার ঈশ্বরপ্রদত্ত একটা সুযোগ পেয়ে সেটাকে খপ্ করে লুফে নিয়েছে সে।

মুঠো পাকিয়ে বক্সারের ক্লাসিক পজিশন নিল ডয়েস। রানা নড়ছে না দেখে লাফাতে লাফাতে আঘাত করার জন্যে এগিয়ে এল। রানার মনে কোন ভয় নেই। লড়াইটাকে প্রায় স্বাগতই জানাচ্ছে। এই মুহূর্তের সমস্যা কঠিন, নিরেট ও বাস্তব–মৌখিক শত্রুতা নয়। ডয়েস যেই প্রথম ঘুসিটা চালাল, খপ করে তার কব্জি ধরে মুচড়ে দিল রানা, সেই সঙ্গে ডয়েসকে ঠেলে দিল সামনের দিকে। পরমুহূর্তে শূন্যে উঠে পড়ল রানা, উড়ে এসে কয়েক হাত দূরে ভারী আলুর বস্তার মত ধপাস করে পড়ল। জুডো কিক্ কাজে লাগেনি, ডয়েস সেটা দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে ডয়েস। তারপর ডান বাহুর পেশী ফুলিয়ে দেখাল রানাকে। 'উঠে এসো, ইউ বাস্টার্ড!' হিসহিস করে বলল সে। 'ব্যাপারটা আমি উপভোগ করছি।'

সিধে হয়ে ডেক-হাউসের গায়ে হেলান দিল রানা। চোখের সামনে ঝাপসা দেখছে, শরীরে যেন এক বিন্দু শক্তি নেই। ডয়েস এগিয়ে আসছে দেখে ডেক-হাউস থেকে সরে দাঁড়াতে চেষ্টা করল ও। অসুস্থ বোধ করছে। অথচ খুব ভাল করেই জানে, আগামী কয়েক মুহূর্তে কিছু একটা করতে না পারলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে থেঁতলে ছাতু করে ফেলবে ওকে ডয়েস।

ডয়েসের দিকে পিছন ফিরল রানা, যেন লড়াই থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। তারপর অকস্মাৎ ঘুরেই লাফিয়ে পড়ল। দ্রুত অনুসরণ করছিল ডয়েস, রানার শরীরে বিদ্যুৎ খেলছে দেখেও থামার সময় পেল না। রানা তার হাঁটুর ওপর পড়ল। কুঁজো হয়ে গেল ডয়েস, রানার পিঠের ওপর দিয়ে ছিটকে পড়ল ডেকের ওপর। সিধে হলো না, ঘুরে বাছা বাছা জায়গায় লাথি মারছে। রাগে অন্ধ হয়ে গেছে ও। মাথায় একটাই চিন্তা, ডয়েসকে ডেকের সঙ্গে মিশিয়ে দেবে।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল রানার। লিমা চিৎকার করছে, 'স্টপ ইট, রানা! আপনি ওকে মেরে ফেলছেন!' মাখনের মত হলদেটে ও নরম একজোড়া হাত জড়িয়ে

ধরল ওকে, টেনে সরিয়ে আনল। টলতে টলতে কেবিনে ঢুকল রানা, টেবিলে হাত রেখে সুবুদ্ধি ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। তারপর অন্ধকার হয়ে এল পৃথিবীটা। কেবিনের মেঝেতে পড়ে গেল ও।

জ্ঞান ফিরল লিমার কোলে। মেয়েটা ভেজা কাপড় দিয়ে ওর মুখ মুছছে, নিঃশব্দে পানি গড়াচ্ছে দু'চোখ থেকে। 'কেমন লাগছে এখন?' দু'হাতে রানার মুখটা ধরে জিজ্ঞেস করল। 'কথা বলুন, প্লীজ!'

মুখ যেখানে ডেকের ওপর পড়েছিল সেখানে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয়নি, তবে বেলুনের মত ফুলে উঠেছে। লিমার চোখে তাকিয়ে হাসল ও। 'আমাকে দেখে তোমার ভয় লাগছে না তো?'

নিঃশব্দে, দ্রুত মাথা নাড়ল লিমা। 'ভয় লাগছে আপনাকে! আপনার এত রাগ! ওকে তো আপনি মেরেই ফেলছিলেন?'

বসল রানা, তারপর দাঁড়াল। 'আমি মেরে ফেলছিলাম। আর ও কি করছিল?'

টলতে টলতে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। ডয়েসও এইমাত্র সিধে হয়েছে। সিধে হলে কি হবে, হড়হড় করে বমি করছে সে। ডেকটা নোংরা করতে যতক্ষণ লাগল, পরিষ্কার করতে তারচেয়ে বেশি সময় নিল না। রশি বাঁধা বালতি দিয়ে পানি তুলে সব ধুয়ে ফেলল। 'পরিচ্ছন্নতা কিসের অঙ্গ জানো তাহলে? ধন্যবাদ, ডয়েস।'

বালতি রেখে রানার দিকে ফিরল ডয়েস। তার মুখেরও করুণ অবস্থা হয়েছে। ঠোঁট এমনভাবে কেটেছে, খেতে বা হাসতে গেলেই ব্যথা পাবে। 'পরে আবার দেখা হবে, রানা।' শার্টটা গা থেকে খুলে ফেলল। পেটে আর বুকে লালচে ক্ষত দেখা যাচ্ছে। রেইল টপকে সাগরে ডাইভ দিল, একেবারে নিখুঁত কায়দায়। অনায়াস ভঙ্গিতে সাঁতরে দূরে সরে যাচ্ছে।

সোয়েট শার্ট খুলে রানাও ডাইভ দিল। পানি বেশ গরম। ক্ষতগুলোয় লোনা পানি লাগায় নতুন করে জ্বালা শুরু হলো। মিনিট দশেক পর ডয়েসের নাম ধরে ডাকল ও, তারপর উঠে এল ডেকে। ওর হাতে একটা তোয়ালে ধরিয়ে দিল লিমা। গা মুছে শার্টটা পরে নিল রানা। 'আপনার প্যান্ট এখনও ভিজে,' বলে হাসি চাপার জন্যে মুখে হাত তুলল লিমা।

ডয়েস ডেকে ফিরে আসতে রানা বলল, 'শো শেষ হয়েছে, কাজেই বোট ছাড়তে যাচ্ছি আমি।'

কথা না বলে হাসল ডয়েস, তারপর নিচে নেমে গেল। লিমা বলল, 'একটু পর আপনার জন্যে কফি আনছি আমি।' মাথা ঝাঁকিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বীস্ট রওনা হলো আবার।

রাত ঠিক দশটায় এঞ্জিন বন্ধ করল রানা, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চলার পর স্থির হয়ে গেল বোট। বাকি তিনজন ডেকে, হাতের ভাঁজে একটা সাব-মেশিনগান নিয়ে অ্যাকশনের জন্যে তৈরি হয়ে আছে ডয়েস। অন্ধকার সিকি মাইল দূরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে বিশাল কাস কং জলমগ্ন জলাভূমি। অভিযানের সবচেয়ে

কঠিন অংশ পার হবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে রানা, ওর হাতের তালু ঘেমে গেল।

জলায় ঢোকার জন্যে অখ্যাত একটা চ্যানেল ধরবে রানা। কর্নেল ম্যাট হিথের জন্যে ফাঁদ পাতার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে বটে, কিন্তু চায় না এখুনি ওদেরকে দেখে ফেলুক সে। যদি এসে থাকে, অবশ্যই নদীর মুখে অপেক্ষা করবে, কাজেই নদীটাকে এড়িয়ে থাকতে চাইছে ও। তীর থেকে টগবগ করে উথলে ওঠার ভঙ্গিতে ধেয়ে আসছে কুয়াশা, কোথাও বিশাল অবিচ্ছিন্ন মেঘের আকৃতি, কোথাও ছেঁড়া ছেঁড়া ভেলার মত। জলাভূমির পচা একটা দুর্গন্ধ ঢুকছে নাকে। সবাই ওরা অপেক্ষা করছে; প্রস্তুত, টানটান, সজাগ কান প্রতিটি শব্দ শোনার জন্যে খাড়া।

শুধু বাতাসের করুণ বিলাপ আর বোটের গায়ে ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে ওরা। স্টার্টারে চাপ দিতে গর্জে উঠল এঞ্জিন, রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার করে দিল। ফাইভ নট স্পীডে জলায় ঢুকছে বোট।

দরদর করে ঘামছে রানা। সামনে তীর, ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। তবে কোন গুলি হলো না। কোন চিৎকারও শোনা গেল না। ম্যাট হিথ যদি এসেও থাকে, ওরা সম্ভবত তাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। কয়েকটা আঁকাবাঁকা চ্যানেল ধরে বোট চালাচ্ছে রানা, কিছুক্ষণ পর এঞ্জিন বন্ধ করে বোট নিয়ে ঢুকে পড়ল নলখাগড়ার জঙ্গলে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে ডেকে বেরিয়ে এল ও।

'এরপর?' জানতে চাইল ডয়েস।

'কাল থেকে শুরু হবে গাধার খাটনি,' বলল রানা। 'কাজেই রাত না জেগে শুয়ে পড়া উচিত।'

'পাহারায় কে থাকবে?'

'প্রথমে আমি,' বলল রানা।

হেগেন আর ডয়েস নিচে নেমে গেল। রানার পাশে কিছুক্ষণ থাকল লিমা। একটু পর সে-ও বিদায় চাইল। পাঁচ মিনিট পর আবার ফিরে এল সে, রানার জন্যে কফি বানিয়ে এনেছে।

'তুমি বোধহয় আমাকে কিছু বলতে চাও।'

'হ্যাঁ...না, থাক,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল লিমা।

'কি ব্যাপার বলো তো?' রানা অবাক।

'হঠাৎ একটা প্রশ্ন জেগেছে মনে,' ধীরে ধীরে বলল লিমা, ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না এখনও। 'আপনার প্রতি আমি কতটুকু কৃতজ্ঞ, ভাষায় তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আপনার প্রতি আমার অসম্ভব শ্রদ্ধা। কিন্তু আপনার সম্পর্কে বিশেষ কিছুই আমি জানি না। কেন?'

'কেন মানে?'

'আমাকে নিজের সম্পর্কে আপনি প্রায় কিছুই বলেননি,' লিমার বলার সুরে খানিকটা অভিমান, খানিকটা বিস্ময়, বাকিটা প্রশ্ন।

'বলার মত তেমন কিছু নেই, তাই বলিনি।'

'আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন,' অভিযোগ করল লিমা। 'বলার কিছু না কিছু থাকেই, তাই না? বিয়ে করেছেন কিনা, করে না থাকলে কাউকে ভালবাসেন

নিশ্চয়ই, বাড়িতে কে কে আছে, মা…'

'আমি একা, লিমা,' শান্ত, ম্লান গলায় বলল রানা। 'চিরকাল একা থাকাই আমার নিয়তি। কাউকে দায়ী করছি না, এ আমার নিয়তি।'

'কিন্তু…কেন?'

'দুঃখিত, লিমা। ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।'

'আপনি দুখী মানুষ, জানি; কিন্তু এভাবে নিজেকে কষ্ট দেয়ার কি মানে?'

রানার উত্তর, 'যাও, শুয়ে পড়ো গিয়ে।'

কিছুক্ষণ নড়ল না লিমা। তার কান্নার শব্দ শুনল রানা, তবু কিছু বলল না। একটু পর হঠাৎ ঘুরে ছুটল লিমা। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল ও।

ছয়

পরদিন সকাল সাতটায় ডেকে বেরিয়ে এসে বোটের চারদিকে তাকাল রানা। নলখাগড়ার অন্তহীন বিস্তৃতি দেখে ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, লুকোচুরি খেলার জন্যে এরচেয়ে আদর্শ জায়গা আর হয় না। বেশ খানিক দূরে সিয়াম উপসাগর ঝাপসা দেখাচ্ছে। নলখাগড়ার জঙ্গল শুধু সীমাহীন নয়, অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন মনে হলো।

তবে ম্যাপ সে-কথা বলে না। এই সুবিশাল নলখাগড়ার ভেতর জলপথ আর লেগুনের একটা নেটওঅর্ক আছে–কোনটা গভীর, কোনটা অগভীর। জলাভূমির গভীর প্রদেশে মানুষও বাস করে। ওরা আদিম জেলে সম্প্রদায়, মাটির স্তূপ কিংবা খুদে দ্বীপে ঘর তৈরি করেছে। লিমার মুখে শোনা, এরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি সরল, পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে হাজার বছর ধরে অস্তিত্ব রক্ষা করছে। তারা না বোঝে কমিউনিজম, না বোঝে ন্যাশনালিজম। বাইরের দুনিয়া তাদের কাছে অর্থহীন।

এক ঝাঁক বুনো হাঁস নলখাগড়া থেকে আকাশে উঠল, বাঁক নিয়ে চলে গেল সাগরের দিকে। একটা হাঁক ছেড়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। এখানে একা হেগেন রয়েছে। গ্যালি থেকে লিমা আর ডয়েস উঠে এল। চার্ট খুলে পরিস্থিতি সম্পর্কে সবাইকে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল ও। 'এখান থেকে সামনের পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে বিপদ আসতে পারে। জেলেরা নিরীহ, ভুল করেও গুলি করা যাবে না। ভয় স্কাউটদের, কারণ তারা আমাদেরকে খুঁজবে।'

'এত ভয় দেখাচ্ছ কেন?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল ডয়েস। 'আমি আসল কথাটা জানতে চাই। সোনা কোনদিকে, আর সেখানে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?'

'ওখানেই তো সমস্যা,' বলল রানা। 'লিমা যে ক্রস-বেয়ারিং দিয়েছে আমাকে, সেখান থেকে আট মাইল দূরে রয়েছি আমরা। ওখানে একটা লেগুন

আছে, ওই লেগুনেই ডুবেছে লঞ্চটা। এই চার্টে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে সবগুলো জলপথ দাগানো নেই। এর মানে হলো, গন্তব্যে পৌঁছুতে বিশ মাইল জলপথ পাড়ি দিতে হতে পারে আমাদের।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করল ডয়েস। চোখে অবিশ্বাস। 'বাজে কথা, তুমি আমাদের ভুল তথ্য দিচ্ছ।'

'বোটের খোল কাদায় আটকালে টের পাবে,' বলল রানা, ডয়েসের অভিযোগ গায়ে মাখল না। 'আর দেরি না করে এখুনি আমাদের রওনা হওয়া উচিত।'

সকালের বাকি অংশ যেন দুঃস্বপ্নের ভেতর কাটল। জলার দুর্গন্ধের সঙ্গে সূর্যের অগ্নিবৃষ্টি নরক করে তুলল পরিবেশ, ওদের সব শক্তি শুষে নিচ্ছে। দুই কি তিন মাইল ঠেলতে হলো বোট, পানি বলতে এখানে কিছুই নেই, পুরোটাই তরল কাদা। বেলা দুটোর পর, পাঁচ ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়ে, চওড়া একটা জলপথে পৌঁছুল ওরা। বিশ্রামের আদেশ দিল রানা।

সবারই মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে। কারুরই তেমন খিদে নেই। মশা একটা বিকট উপদ্রব হয়ে দাঁড়াল। ফার্স্ট-এইড বক্সে রিপেলেন্ট ক্রীম পেল লিমা, কিন্তু মশা তাড়াবার জন্যে সেটা তেমন কোন কাজে এলো না। সবার চেয়ে লিমার অবস্থাই বেশি কাহিল। পুরোটা সকাল পুরুষদের কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে খেটেছে সে। মশা ও পোকামাকড়ের কামড়ে ফুলে উঠেছে ডয়েসের মুখ। মারামারির ফলে যে ক্ষতগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো এখন বীভৎস দেখাচ্ছে। 'এ-সব আর কতক্ষণ চলবে?' জানতে চাইল সে। 'এ তো দেখছি মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এখানকার পরিবেশ আর বিপদের কথা আগেই তোমাকে জানানো হয়েছে। তবে ভাগ্য ভাল হলে অবস্থার উন্নতি ঘটবে। প্রার্থনা করো এই চ্যানেল যেন আমাদেরকে ভুল পথে না নিয়ে যায়।' হুইলহাউসে ঢুকে বোট স্টার্ট দিল ও।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে সাবধানে বোট চালাচ্ছে রানা। কম্পাস বেয়ারিং ঠিক রাখার জন্যে মাঝে-মধ্যে দিক পরিবর্তন করছে। বলা যায়, অনেকটা কপালগুণেই, দেড় ঘণ্টা পর চওড়া একটা লেগুনে পৌঁছাল ওরা। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। 'এটাই,' বলল ও।

উল্লাসে উত্তেজনায় নাচানাচি শুরু করল বাকি তিনজন। রেইলের সামনে স্থির হলো লিমা, কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘুরল সে, গোটা লেগুনের ওপর চোখ বোলাল। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল। 'এটা সেটা নয়,' বিড়বিড় করে বলল।

'শালার কপাল!' হাতের তালুতে ঘুসি মারল ডয়েস। 'তুমি নিশ্চিত, লিমা?'

মাথা ঝাঁকাল লিমা। 'সেটা এই লেগুনের চেয়ে অনেক ছোট, আর নলখাগড়ায় ঘেরা। আমার মনে আছে, বাবা লঞ্চটাকে লুকাবার জন্যে নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকেছিল, তারপর হঠাৎ আমরা ছোট একটা লেগুনে বেরিয়ে আসি। তখন সন্ধে হয়ে এলেও, লেগুনের আকৃতি আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

হুইলহাউসের মাথায় উঠে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। নলখাগড়ার সীমাহীন বিস্তৃতি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ডেকে নেমে এসে গা থেকে শার্ট খুলল ও। 'আশপাশটা পরীক্ষা করতে হলে সাঁতরাতে হবে।'

নিঃশব্দে হেসে ডয়েসও শার্ট খুলল। 'সোনার লোভ দেখিয়ে ভালই খাটিয়ে নিচ্ছ তুমি!' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ডাইভ দিল সে, দ্রুত সাঁতার কেটে একদিকে চলে যাচ্ছে।

হাসিমুখে লিমাকে রানা বলল, 'চিন্তা কোরো না। তোমার সিক্রেট লেগুন ঠিকই আমরা খুঁজে বের করব।' ডাইভ দিল ও, তারপর ডয়েসের উল্টোদিকে রওনা হলো।

পানিতে সোঁদা একটা গন্ধ, তবে বেশ ঠাণ্ডা, ঘামে ভেজা গরম শরীরে আরাম লাগল। নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে সরু একটা গলি তৈরি হয়েছে, সেটা ধরে কয়েক গজ এগোল ও। সামনে কানাগলি, দেখেও থামল না, নলখাগড়া সরিয়ে পথ করে নিচ্ছে। এগোতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছোট একটা লেগুনে পৌঁছাল ও। মনটা নেচে উঠতে চাইলেও, হতাশায় ছেয়ে গেল। পানি এখানে মাত্র কয়েক ফুট গভীর, একটা লঞ্চকে লুকিয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট নয়। ঘুরে নলখাগড়ার ভেতর ফিরে আসতে হলো। আরেক দিকে যাচ্ছে রানা।

মাঝে মধ্যে হাঁক ছাড়ছে ও। শুনতে পেয়ে সাড়া দিচ্ছে লিমা। দূর থেকে ভেসে আসা ডয়েসের হাঁকও রানা শুনতে পাচ্ছে। দু'জনের কারও ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ছে না।

আধ ঘণ্টা পর দু'জনই ফিরে এল বোটে। ডয়েস আগে ফিরেছে, রানাকে বোটে উঠতে সাহায্য করল সে। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ টানল কিছুক্ষণ। তারপর পানিতে ফেলে দিয়ে ওটার পিছু নিল। এবার নতুন একটা দিক ধরে সাঁতার কাটছে।

রানাও আলাদা একটা দিক বেছে নিল। লেগুনের দূর প্রান্তে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে নলখাগড়ার বন, সেটার ভেতর ঢুকে পঞ্চাশ ফুটের মত এগোল। জঙ্গলের শেষ কোথায় বুঝতে পারছে না। সিদ্ধান্ত নিল ফিরে আসবে। কিন্তু কেন যে আরও একটু এগিয়ে দেখার ইচ্ছে হলো বলতে পারবে না। বেশি নয়, মাত্র পাঁচ ফুট এগোতেই সামনে প্রকাশিত হলো ছোট একটা গভীর লেগুন, আকারে প্রায় গোল, ডায়ামিটারে একশো ফুট হবে। পানি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তলায় সাদা বালি। তলাটা চারদিক থেকে ঢালু হয়ে নেমেছে, মাঝখানটা অনেক বেশি গভীর। রানা ধীরে ধীরে সাঁতার কাটছে। কেন যেন ভয় ভয় করছে ওর। জলাভূমির অন্যান্য অংশে বিভিন্ন জ্যান্ত প্রাণীর কলকাকলিতে মুখর হয়ে আছে চারপাশ, অথচ এখানে এমন কি একটা ঝিঁঝি পোকাও ডাকছে না।

রানার মনে হলো, সেই আদিম যুগ থেকে কেউ এ জায়গা খুঁজে পায়নি, সে-ই প্রথম মানুষ এখানে ঢুকেছে। কিন্তু তা সত্যি নয়। হাত-পা না ছুঁড়ে ধীরে লেগুনের মাঝখানে চলে এল ও। নিচে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। অগত্যা ডাইভ দিতে হলো।

কত দূর নেমেছে বলতে পারবে না রানা, লঞ্চের ডেক রেইলটা দেখতে পেয়ে উল্লাস অনুভব করল। যেন নিশ্চিত হবার জন্যে রেইলটা একবার ছুঁলো ও। তারপর উঠে এল পানির ওপর।

পানির ওপর মাথা তুলেই ক্যানুটা দেখতে পেল রানা। স্থানীয় একজন আদিবাসী জেলে আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে দেখছে ওকে। ক্যানুর কিনারা ধরে হাসল রানা। 'ভয় পেয়ো না, আমিও তোমার মতই একজন মানুষ,' জানে ইংরেজি বা চীনা কোন ভাষাই বুঝবে না, তবু চীনা ভাষাতেই বলল।

লোকটা থাই ভাষায় বলে উঠল, 'আমি তো ভাবলাম তুমি জলদৈত্য, আমাকে খেতে এসেছ!'

'আমি বড় একটা বোট থেকে এসেছি,' বলল রানা, ভাঙা ভাঙা থাই ভাষায়। 'বোটটা ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল। 'আমাকে পৌঁছে দেবে?'

হাত লম্বা করে লেগুনের নিচেটা দেখাল জেলে। 'ওটা একটা অভিশপ্ত লঞ্চ, ওখানে শয়তানরা বাস করে। এখানে ডুব দিলে মানুষ আর উঠে আসে না।' রানা উঠে বসতে ক্যানু ছেড়ে দিল সে।

'কিন্তু কই, আমার তো কিছু হলো না।'

চিন্তায় পড়ে গেল লোকটা। তারপর বলল, 'তাহলে শয়তানরা এখন ঘুমাচ্ছে।'

নলখাগড়ার কিনারায় একবার থামল ক্যানু। 'এটা যদি খারাপ জায়গাই হয়, তুমি এসেছ কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

শোকে কাতর দেখাল লোকটাকে। ঘটনাটা ধীরে ধীরে বর্ণনা করল সে। লঞ্চটা তার ভাই প্রথমে দেখতে পায়। বারণ করা সত্ত্বেও ডুব দেয় সে। সম্ভবত একটা শেলফের কিনারায় ঝুলে ছিল লঞ্চটা। তার ভাই ভেতরে, কেবিনে ঢোকে। এই সময় কাত হয়ে উল্টে যায় লঞ্চ, কেবিনের দরজা বন্ধ হয়ে আটকে যায়। ওখানেই তার মৃত্যু হয়।

নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রানা বলল, 'আমি আবার ওখানে ডুব দেব। তোমার ভাইয়ের লাশটা তুলে আনব।'

'ফেমা লিয়েন খুব খুশি হবে, তোমার জন্যে প্রার্থনা করবে মন্দিরে।'

'ফেমা লিয়েন কে?'

নিজের বুকে আঙুল তাক করল লোকটা।

বোটের গায়ে ভিড়ল ক্যানু। লিয়েন ও লিমা পরস্পরকে দেখে হতভম্ব। পরিচয় না থাকলেও একজন আরেকজনকে চেনে। 'লঞ্চ পেয়েছি,' লিমাকে জানাল রানা। ডয়েসকে ডেকে নেয়া হলো। 'লেগুনের তলায় উল্টে আছে ওটা।'

ডেকে বসে লিয়েনকে অনেক প্রশ্ন করল রানা ও লিমা। হ্যাঁ, বিদেশী লোকজন সে আগেও দেখেছে। তারা বেশিরভাগই থাই, তবে সাদা চামড়ার লোকজনও দেখেছে। থাইরা আদিবাসী জেলেদের কাছ থেকে মাছ কিনে নিয়ে যায়। আর সাদারা আসে অস্ত্র বেচতে। ডয়েস থাই ভাষা বোঝে না, ফলে মাঝে মধ্যেই বাধা দিল। তার কথায় কান না দিয়ে লিয়েনকে রানা জিজ্ঞেস করল, গত কয়েক দিনের মধ্যে কোন বিদেশী লোকজনকে তারা দেখেছে কিনা। মাথা

নাড়ল লিয়েন। তেমন কেউ আসেনি, এলে তারা দেখতে পেত। লিমা তাকে নিজের আত্মীয়স্বজনদের কথা জিজ্ঞেস করল। সবাই তারা ভাল আছে। খেমাররুজ গেরিলারা গ্রামবাসীদের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে পালিয়ে গেছে।

দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা। তারপর হুইলহাউসে ঢুকে স্টার্ট দিল এঞ্জিন। প্রথমে নলখাগড়ার জঙ্গলটাকে দুর্ভেদ্য মনে হলো, যদিও ফাঁক হয়ে গেল ধীরে ধীরে। ছোট লেগুনে চলে এল বোট। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। সবাই ওর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ডয়েস জানতে চাইল, 'তুমি ঠিক কি করতে চাইছ, বলবে?'

তার কথার উত্তর না দিয়ে লিয়েনকে রানা বলল, 'সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত থাকো তুমি। লাশটা তুলে আনি, গ্রামে নিয়ে যেতে পারবে।' কেবিনে ঢুকে আবার বেরিয়ে এল, টেনে আনল একটা বাক্স, তাতে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট আছে।

'সূর্য ডুবতে আর এক কি দেড় ঘণ্টা বাকি, আপনি রাতে ডাইভ দিতে চান?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল লিমা। কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা, বাক্স খুলে জিনিস-পত্র বের করছে। 'ওকে থামাও, ডয়েস!' ডয়েসের হাত ধরে ঝাঁকাল লিমা।

'এত তাড়া কিসের, রানা?' জানতে চাইল ডয়েস। 'লঞ্চটা ওখানেই থাকবে, কেউ নিয়ে পালাবে না। কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করলেই তো হয়।'

পায়ে রাবার ফ্লিপার পরা শেষ করে পিঠে অ্যাকুয়া-লাঙ তুলল রানা, হেগেন সেটার স্ট্র্যাপ আটকাল। 'তোমরা দেখছি ম্যাট হিথের কথা ভুলে গেছ,' বলল ও। 'তার চেয়ে এগিয়ে আছি আমরা, আজ রাতে কিছু কাজ সেরে না রাখলে পিছিয়ে পড়ব। লঞ্চের কেবিনে একটা লাশ আটকে আছে। লঞ্চটাও উল্টে আছে। হেগেনের দিকে ঘুরল ও। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্লক ও ট্যাকল ফিট করো। রাতেই ওটা দরকার হতে পারে।' ডাইভিং মাস্ক অ্যাডজাস্ট করে ব্রীদিং টিউবের মাউথপীসটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকাল। ওর পানিতে নেমে যাওয়া নিঃশব্দে দেখল ওরা।

পনেরো মিনিট পর উঠে এল রানা। বলল, 'লঞ্চ সিধে করা সম্ভব নয়, বালির ভেতর অনেকটা ডেবে গেছে। ছাদ ভাঙা, সেটারই আবর্জনার ভেতর ঢাকা পড়ে আছে কেবিনের দরজা।'

মাথা ঝাঁকাল লিমা। 'হ্যাঁ, ছাদটা ভাঙারই কথা। কামানের গোলা লেগেছিল।'

'এখন তাহলে কি করা?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'ওয়াটারপ্রুফ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে, চিন্তার কিছু নেই,' বলল রানা। নোঙর তুলে ফেলার নির্দেশ দিল ও। ডয়েসকে বলল ব্লাস্টিং ইকুইপমেন্ট আনতে। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বোটটাকে লেগুনের কিনারায় নিয়ে এল হেগেন।

তৈরি করা চার্জ নিয়ে, ডিটোনেটর ও তার সহ, আবার ডাইভ দিল রানা।

ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ওর ইঙ্গিত পেয়ে ডিটোনেটিং বক্সের প্লাঞ্জারে চাপ দিল হেগেন। উথলে উঠল পানি, ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, সারফেসে আলোড়ন ওঠায় বোট দুলছে।

ইতিমধ্যে সন্ধে হয়ে এসেছে। লিমা বলল, 'আপনার আর আজ ডাইভ দেয়ার দরকার নেই। নিচে কিছুই দেখতে পাবেন না।'

হেসে উঠে হেগেনকে রানা বলল, 'ল্যাম্পটা নিয়ে এসো।'

হুইলহাউস থেকে ল্যাম্পটা আনল হেগেন, লম্বা কেবলের শেষ প্রান্তে আটকানো। ওয়াটারপ্রুফ ল্যাম্প, বোটের লাইটিং সিস্টেমের সঙ্গে প্লাগ-এর সংযোগ দেয়া হলো। এক হাতে ল্যাম্প, আরেক হাতে ক্রো-বার নিয়ে পানির নিচে তলিয়ে গেল রানা।

ল্যাম্পের আলোয় এত তেজ, ডুব দিতেই অনেক নিচে দেখা গেল লঞ্চটা। কি কারণে ওটাকে কেমন যেন অশুভ আর ভৌতিক লাগছে। একে তো ভাঙাচোরা ও পুরোপুরি ওল্টানো, তার ওপর বিস্ফোরক ব্যবহার করায় অদ্ভুত ধ্বংসস্তূপের চেহারা পেয়েছে। বিস্ফোরণে বড় ও কালো গর্ত তৈরি হলেও, ভেতরে ঢুকতে ভয়-ভয় করছে রানার। সাহস করে খানিকটা এগোল ও, কেবিনের ভেতর আলো তাক করল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কেবিনে ঢুকে কোণগুলোয় আলো ফেলল রানা। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না। সিলিং পায়ের নিচের দিকে, মেঝে মাথার দিকে; ভেসে থাকার সময় অদ্ভুত অনুভূতি হলো। ওর সামনে আরও একটা দরজা, আরেক কেবিনে যাবার পথ। সেদিকে এগোল ও। সিলিঙের ওপর কয়েকটা কাঠের বাক্স দেখা গেল, বেশিরভাগই ভাঙা, ভেতর থেকে সোনালি মূর্তি বেরিয়ে এসেছে। সোনা! সেদিকে অপলক তাকিয়ে আছে রানা, চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। ঝট করে ওপর দিকে আলো তাক করল ও। পুরো কেবিন আলোকিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে আতঙ্কে অবশ হয়ে এল শরীর–ওর দিকে অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে এক লোক, বাহু দুটো প্রসারিত। নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠল রানা, ক্রোবার দিয়ে আঘাত করল লোকটাকে। ছিটকে এক কোণে সরে গেল লোকটা, ভেসে থাকল ওখানে।

লিয়েনের ভাই! হঠাৎ করে ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করল রানা। প্রকৃতির কোন অদ্ভুত খেয়ালই বলতে হবে, জ্যান্ত মানুষের মত সিধে হয়ে আছে লাশটা। বীভৎস একটা দৃশ্য। লাশের গায়ে চামড়া বলতে কিছুই নেই। সরাসরি না তাকিয়ে সেদিকে এগোল রানা, লাশের চুল ধরে বেরিয়ে এল লঞ্চ থেকে।

লাশটা ছেড়ে দিল রানা। আপনা থেকেই সারফেসের দিকে উঠে যাচ্ছে ওটা। লঞ্চে আবার ঢুকল ও, বেরিয়ে এল ছোট একটা বুদ্ধমূর্তি নিয়ে। সারফেসের ওপর, বীস্টের পাশে মাথা তুলল। ব্যস্ত একজোড়া হাত ধরল ওকে, তুলে নিল ডেকে। 'ওটা ভেসে উঠছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে লিমা। মাথা ঝাঁকাল সে।

'ভেসে উঠেছে মানে!' বলল ডয়েস। 'পানির ওপর রীতিমত লাফ দিল। আমি তো একটুর জন্যে জ্ঞান হারাইনি!'

হেগেন বলল, 'ওই চলে যাচ্ছে।' ডেকের ওপর সিধে হয়ে রানা দেখল ক্যানু নিয়ে নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকছে লিয়েন, ক্যানুর পিছু নিয়ে ভেসে যাচ্ছে তার ভাইয়ের লাশ, রশির সঙ্গে বাঁধা।

ওদের দিকে ফিরে হাত নাড়ল লিয়েন, বলল, 'কাল আবার আসব আমি, লিমা।'

মূর্তিটা ডয়েসের হাতে। নেড়েচেড়ে দেখছে। 'কত দাম হবে এটার? এরকম ক'টা আছে?'

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কেবিনের দিকে চলে গেল রানা।

সকালে ঘুম ভাঙার পর ডেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল, লিমা ও ডয়েস পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাসাহাসি করছে। ওকে দেখে লিমা তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনাকেও কফি দিই!' বলেই চলে গেল গ্যালির দিকে।

'লিমার সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, সে তোমার কুমতলবের কথা জানে না,' বলল ডয়েস। 'সে বিশ্বাস করে না যে তার সোনা তুমি মেরে দেয়ার প্ল্যান করেছ।'

তার দিকে পিছন ফিরল রানা, সকালের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। মাথার ওপর বুনো পাখিরা ঝাঁক বেঁধে উড়ছে। নলখাগড়ার বন বাতাসে হেলে পড়ছে একদিকে। স্বচ্ছ পানিতে রংবেরঙের মাছ।

'তবে, এই সোনার ওপর তোমার অধিকার আমি অস্বীকার করি না,' বলল ডয়েস। 'লিমাকে বাঁচানোর জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। সত্যিকার বীরত্ব দেখিয়েছ। লিমা তো দেখছি তোমাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করে। আমিও সামান্য হলেও সংক্রমিত হয়েছি।' নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। 'তবে তার মানে এই নয় যে তোমাকে একা সব হজম করতে দেব।'

হেগেন হুইলহাউসে ছিল, তাকে ডেকে রানা বলল, 'তোমার বোটে এত সোনা ধরবে না। হোল্ডে শুধু সোনা ভরব আমরা, বাক্স ছাড়াই। তাতে কম জায়গা লাগবে। হাতলঅলা বড় সাইজের চটের বস্তা আছে, নিচে নেমে ওই বস্তায় মূর্তিগুলো ভরব আমি, তোমরা কপিকলের সাহায্যে তুলে নেবে।'

কফি নিয়ে ফিরে এল লিমা, জানতে চাইল, 'লেদার ব্যাগ দুটো দেখেছেন? ওগুলোয় পাথর আছে।'

'হোল্ডে ঢুকলাম কখন যে দেখব?' বলল রানা।

সকাল আটটায় প্রথম ডাইভ দিল ও। পানিতে রোদ লাগায় লেগুনের তলাটা আলোকিত, সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লঞ্চের ভেতরও আলোর অভাব নেই। হোল্ডের ছাদে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে বাক্সগুলো। প্রায় প্রতিটি বাক্সই অক্ষত। এগুলো ভেঙে সোনা বের করা, তারপর বাইরে নিয়ে গিয়ে বস্তায় ভরা, অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাপেক্ষ কাজ। কাজটায় হাত দেয়ার আগে নিজেকে সাহস যোগাতে হলো।

প্রথম বস্তা ভরে বোটে তুলতে আধ ঘণ্টা লেগে গেল। প্রতি বস্তায় বারো থেকে পুনেরো মণ সোনা ধরছে। এক সঙ্গে দুটো করে বস্তা বোটে তোলা হলো,

প্রথম দিকে বস্তাগুলোর সঙ্গে রানাও পানির ওপর উঠল। 'হোল্ডে শুধু ভরলেই হবে না,' হেগেনকে বলল ও। 'রশি দিয়ে ভাল করে বাঁধতেও হবে। তা না হলে বোট ঝাঁকি খেলে ক্ষতি হবে ওগুলোর।'

'এত সোনা আমার চৌদ্দগোষ্ঠির কেউ কখনও দেখেনি!' ডয়েসের চোখ জোড়া চকচক করছে। 'ভাই রানা, তুমি যদি সত্যি আমাকে বঞ্চিত করো, আমি নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব!'

সাড়ে এগারোটার মধ্যে বিশ বস্তা সোনা তোলা সম্ভব হলো। কাজটা অনেকখানি সহজ করে নিয়েছে রানা–লঞ্চের মেঝে বিস্ফোরকের সাহায্যে ভেঙে ফেলেছে ও, ফলে হোল্ডে বসেই বস্তায় সোনা তোলা সম্ভব হচ্ছে। বস্তাগুলো ভরছেও বাক্সসহ, বোটে তোলার পর ডয়েস আর হেগেন বাক্স ভেঙে ভেতরের কার্গো রেখে আসছে হোল্ডে, ভাঙা বাক্স ফেলে দিচ্ছে পানিতে।

বিশ বস্তা তোলার পর বীস্টের ডেকে উঠে এল রানা। তোয়ালে দিয়ে ওর গা মুছিয়ে দিল লিমা। একটা শার্ট পরল ও, দু'হাতে গরম মগ ধরে ঠক-ঠক করে কাঁপছে।

এই সময় ক্যানু নিয়ে হাজির হলো লিয়েন। বারবার মাথা নত করে রানাকে সম্মান জানাল সে, বলল, 'আমাদের পুরো পরিবার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। ওদের খুব ইচ্ছে আপনাকে একবার দেখে।'

'এখানে আমাদের অনেক কাজ, লিয়েন,' বলল রানা। 'আর সন্ধের দিকে সাগরে ফিরে যেতে হবে। সময় পেলে সত্যি তোমাদের গ্রাম থেকে বেড়িয়ে আসতাম।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'গ্রামের লোকজন বিদেশী কাউকে দেখেছে? বিশেষ করে সাদা চামড়ার কাউকে?'

মাথা নেড়ে লিয়েন বলল, 'জ্বী-না। জলাভূমির চারদিকে আমরা মাছ ধরি। কেউ এসে থাকলে ঠিকই আমাদের চোখে ধরা পড়ত।'

মনে মনে হতাশ বোধ করল রানা। তাহলে কি হিসাবে ভুল হয়ে গেল? ফাঁদে পড়ার ভয়ে না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেড ড্রাগন? 'তোমাদের গ্রামে টাটকা ফল আর তরি-তরকারি পাওয়া যাবে? আমাদের দরকার।'

প্রবল উৎসাহে মাথা ঝাঁকাল লিয়েন। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে আসছি, স্যার!'

রানা ক্লান্ত, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কেবিনে ঢুকল।

আধ ঘণ্টা পর ডাইভ দেয়ার জন্যে আবার যখন ডেকে বেরুল ও, লিমাকে কোথাও দেখতে না পেলেও মনে কোন প্রশ্ন জাগল না বা সন্দেহও সৃষ্টি হলো না। তৈরি হয়ে ডাইভ দিল ও। এদিকে ডয়েস আর হেগেনও প্রস্তুত, কপিকলের সাহায্যে বস্তাগুলো তুলে নেবে।

কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিয়ে বেলা তিনটে পর্যন্ত একটানা কাজ করল রানা। আরও ত্রিশ বস্তা কার্গো ভরা হলো বীস্টের হোল্ডে।

তিনটের সময় এক হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে বীস্টের ডেকে উঠল রানা, ভয়ানক ক্লান্ত। লিমার অনুপস্থিতি এবার অস্বাভাবিক লাগল ওর। 'লিমা কোথায়?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল হেগেন। 'লিমা কোথায় মানে? তুমি

যখন প্রথম দফা বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কেবিনে ঢুকলে তখনই তো সে লিয়েনের সঙ্গে চলে গেল!'

'হোয়াট!' রানার বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। 'কি বলছ তুমি!'

'কেন, তুমি জানো না?'

ডয়েস বলল, 'লিমা বলল, লিয়েনদের গ্রাম সে চেনে। ওখানে তার অনেক পরিচিত মানুষ আছে।'

'কিন্তু লিয়েনের তো দু'ঘণ্টা পর ফিরে আসার কথা!'

ডয়েস বলল, 'এ নিয়ে আমরাও আলোচনা করছিলাম। হেগেন বলল, বেড়াতে গেছে, একটু দেরি হতেই তো পারে।'

'এই তোমার বুদ্ধি? দু'জনেই তোমরা জানো, আমাদের পিছু নিয়ে রেড ড্রাগন আসবে। সব জেনেও লিয়েনের সঙ্গে ওকে যেতে দিলে তোমরা?'

'তুমি লীডার, তুমি কেন বাধা দাওনি?' রেগে যাচ্ছে ডয়েস।

'আমি জানতামই না যে লিয়েনের সঙ্গে যাচ্ছে লিমা!'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে চোখ বুলাচ্ছিল হেগেন, হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল, 'ব্যাপারটা আমার কিন্তু ভাল ঠেকছে না!'

ঝট করে তার দিকে ফিরল ডয়েস। 'কি ভাল ঠেকছে না?'

'পাখিদের আচরণ,' বলল হেগেন। 'এখানে আসার পর থেকে ওদের চেঁচামেচিতে কান পাতা যাচ্ছিল না। কিন্তু এখন ওদের একটারও কোন সাড়া-শব্দ নেই।'

এক মুহূর্তের জন্যে সবাই ওরা কান পাতল। তলপেটে ভয়ের ঠাণ্ডা স্পর্শ অনুভব করল রানা। 'হ্যাঁ,' ফিসফিস করল ও। 'পাখিরা থেমে গেছে।' রেইলের কাছে এসে ডাইভিং গিয়ার পরতে শুরু করল। লেদার ব্যাগ দুটো ডেকের ওপর ফেলে দিয়েছে।

'কি করছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'চোখ-কান খোলা রাখো,' বলল রানা। 'বাকি সোনা তুলতে যাচ্ছি আমি।'

'লিমার কি হবে?'

'আগে হাতের কাজ শেষ করি, তারপর চিন্তা করব। হেগেন, ব্যাগ দুটো সরিয়ে রাখো,' বলে ডাইভ দিল রানা।

দু'বারে চার বস্তা উঠল, প্রতিবার ওগুলোর সঙ্গে উঠে এল রানা। মনে একটা ভয় ছিল, বিপদ হতে পারে। তবে না, কিছুই ঘটেনি। লঞ্চের হোল্ড অর্ধেকের বেশি খালি হয়ে আসায় নড়াচড়ার বেশি জায়গা পাওয়া যাচ্ছে, এখনকার বাক্সগুলোও আকারে বড়, কাজ আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে এসেছে। দুটো বাক্স, প্রায় একশো মণ ওজন হবে, বস্তায় না ভরে সরাসরি তোলা সম্ভব হলো। সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করল রানা। আর সাত-আটটা বাক্স তুলতে পারলেই হয়। কিন্তু শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে, বিশ্রাম না নিলেই নয়। একজোড়া বাক্সের সঙ্গে নিজেও এবার উঠতে শুরু করল সারফেসের দিকে।

খানিকদূর উঠেছে, মাথার ওপর সারফেসে একটা ক্যানুর তলা দেখতে পেল

রানা। লিমা ফিরে এসেছে ভেবে পরম স্বস্তি বোধ করল ও। ক্যানুর কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে পানির ওপর মাথা তুলল। সঙ্গে সঙ্গে আবার ডুব দিল ও। ক্যানুতে দু'জন চীনা রয়েছে, মাথায় ক্যাপ, ক্যাপের কপালে রেড ড্রাগনের নকশা। একজন চীনা ক্যানুর বোতে দাঁড়িয়ে আছে, হাতের মেশিন-পিস্তল ডয়েস আর হেগেনের দিকে তাক করা। রানা ডুব দিচ্ছে, লোকটা ঘুরে পানিতে গুলি করল। দ্রুত নিচে নেমে আসছে ও, অলস ভঙ্গিতে পাশ কাটাতে দেখল বুলেটগুলোকে।

গুলিবর্ষণ থামতে আবার উঠতে শুরু করল রানা, সরাসরি ক্যানুর খোল লক্ষ্য করে। পায়ে রাবার ফ্লিপার থাকায় বাড়তি গতি পেয়েছে ও। খোলটা মাথায় হালকাভাবে ঠেকতেই দু'হাতে ক্যানুর কিনারা ধরে টান দিল। হালকা ক্যানু উল্টে গেল পুরোপুরি।

একজন চীনা ওর গায়ের ওপর পড়ল, পানিতে এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে। তার বেল্ট ধরে লেগুনের তলায় টেনে আনল রানা, একটা পা লঞ্চের রেইলে ঠেকিয়ে ভাঁজ করল, এক হাতে জড়িয়ে ধরল গলাটা। প্রথমে ধস্তাধস্তি করলেও, একটু পরই অক্সিজনের অভাবে নিস্তেজ হয়ে গেল লোকটা। নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। ছেড়ে দিতে তলিয়ে গেল লাশ।

আবার ওপরে উঠছে রানা। মাথার ওপর পানিতে তীব্র আলোড়ন। দ্বিতীয় চীনা আর ডয়েস পানিতে ধস্তাধস্তি করছে, কেউ কাউকে ছাড়ছে না। সম্ভবত এই প্রথম বার সুবিধে করতে পারছে না ডয়েস। ওপরে ওঠার সময় খাপ থেকে ছুরিটা বের করে হাতে নিল রানা। পানির ওপর মাথা তুলল না, তার আগেই ফলাটা গেঁথে দিল চীনা শত্রুর পিঠে। পাঁজরের ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ওটা, হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিয়েছে।

পানির ওপর মাথা তুলে রানা দেখল, আহত চীনার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বোটের দিকে এগোচ্ছে ডয়েস। পিছন ফিরে তাকাতে রানাকে দেখতে পেল, মুখ থেকে ব্রিদিং-টিউব খুলছে। 'দিয়েছি শালাকে শেষ করে!'

'তুমি না!' বলে ডয়েসকে পাশ কাটাল রানা, উঠে পড়ল বীস্টের ডেকে।

ডেকে উঠে ভাসমান লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল ডয়েস। লাশের চারপাশের পানি লাল হয়ে উঠেছে। রানার দিকে ফিরল সে। কি ঘটেছে বুঝতে পারলেও ধন্যবাদ দিল না। জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি হবে?'

'এখনও ঘণ্টাখানেক দিনের আলো পাব,' বলল রানা। 'আর মাত্র সাত-আটটা বাক্স বাকি আছে।'

'তুমি পাগল নাকি?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডয়েস। 'এতই তোমার সোনার লোভ যে...'

'শাট আপ!' চাপা গলায় গর্জে উঠল রানা। তারপর হেগেনের দিকে ফিরে বলল, 'কপিকল খালি করো!'

বাকি বাক্সগুলো তুলে আনতে আধ ঘণ্টা লাগল। এবার রানার সঙ্গে ডাইভ দিল ডয়েসও। কাজটা শেষ হতে হেগেন বলল, 'হ্যাঁ, বাবা, সাহস বটে!'

'থাক, আর প্রশংসা করতে হবে না।' গা থেকে ডাইভিং গিয়ার খুলে ফেলল

রানা। 'তৈরি হও। এখুনি আমরা রওনা হব।' কেবিনে চলে এল ও।

দরজায় দাঁড়িয়ে হেগেন জিজ্ঞেস করল, 'রওনা হব মানে, রানা?'

'মেয়েটাকে আনতে যাব।'

হেগেনকে পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকল ডয়েস। 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'আমি শুনতে চাই না,' বলল রানা।

'সোনা যখন উদ্ধার করা গেছে, আর কোন ঝুঁকি নেয়া উচিত নয় আমাদের,' বলল ডয়েস। 'আমি বলতে চাইছি এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে এই সোনা হাতছাড়া হয়ে যায়।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হেগেন সোনা নিয়ে সাগরের মুখে চলে যাক,' বলল ডয়েস। 'ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ও। আমি আর তুমি লিমার খোঁজে বেরুই। ওকে পেলে একটা ক্যানু নিয়ে সাগরের মুখে পৌঁছাব।'

'হেগেন একা সামলাতে পারবে না,' বলল রানা। 'রেড ড্রাগন আমাদেরকে ছেড়ে বোটের পিছু নিতে পারে–তখন কি হবে?'

'সেক্ষেত্রে কোথাও কারও যাবার দরকার নেই,' বলল ডয়েস। 'এখানেই আমরা লিমার জন্যে অপেক্ষা করি।'

রানা মাথা নাড়ল। 'না। রেড ড্রাগন তার দলবল নিয়ে পৌঁছে গেছে। লিয়েন ভুল করেছে। আমার ধারণা, সেই ভুলেরই খেসারত দিচ্ছে সে এখন।'

'তুমি বলতে চাইছ লিমা আর লিয়েনকে আটকে রেখেছে কর্নেল?' হেগেন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তাই আমার ধারণা,' বলল রানা। 'কাজেই আমাদের প্রথম কাজ লিমাকে উদ্ধার করা।'

'কিন্তু চাইলেই কি ওকে আমরা উদ্ধার করতে পারব?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস। 'রেড ড্রাগনের সঙ্গে ক'জন আছে আমরা জানি না। সংখ্যায় ওরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি হবে। বোকার মত ওদের ফাঁদে পা দিতে যাই কেন?'

'ডয়েসের কথায় যুক্তি আছে, রানা,' বলল হেগেন। 'শত্রুর শক্তি সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। অপেক্ষা করে দেখা যাক কি ঘটে।'

অগত্যা ওদের কথা মেনে নিতে হলো রানাকে। হেগেন বলল, 'তুমি ক্লান্ত, রানা। ঘুমোবার চেষ্টা করো। আমরা দু'জন মিলে পাহারা দিই। সকাল হোক, তারপর দেখা যাবে।'

বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে রানা। হেগেনের কথা শেষ হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সাত

ঘুম ভাঙার পর এক চুল নড়ল না। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে, ফিরে পাওয়া শক্তি নতুন করে অনুভব করল, ইন্দ্রিয়গুলো ক্ষুরের মত ধারাল। ওপরের বাঙ্ক থেকে ডয়েসের নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। হেগেনকে দেখা যাচ্ছে না, তার কোন সাড়া-শব্দই নেই। দিনটা গরম, পরিবেশে অদ্ভুত এক নিস্তব্ধতা। রানা জানে, কোনও একটা কারণে ঘুমটা ভেঙেছে। ডয়েসের মুখে হাতচাপা দিয়ে তাকে জাগাল ও। তারপর টেবিল থেকে কারবাইনটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল ডেকে। ওর পিছু নিয়ে ডয়েসও।

হুইলহাউসের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে রোদের মধ্যে মড়ার মত ঘুমাচ্ছে হেগেন। সাবধানে তার ঘুম ভাঙাল রানা, ঠোঁটে আঙুল রেখে শব্দ করতে নিষেধ করল। চোখ জোড়া বড় বড় করে রানাকে দেখল হেগেন, তারপর মণি ঘুরিয়ে নলখাগড়ার দিকে তাকাল। পানিতে থেমে থেমে একটা আওয়াজ হচ্ছে। সবাই ওরা আড়ষ্ট। অপেক্ষা করছে।

নলখাগড়ার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা ক্যানু। বোর কাছে কুঁকড়ে ছোট হয়ে রয়েছে একটা কাঠামো।

লোকটা লিয়েন। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল লিয়েনের কাপড়চোপড় সব ছেঁড়া, মুখে রক্ত। গালের এক পাশের মাংস লম্বা ফালি হয়ে ঝুলছে, ক্ষতটায় রাজ্যের মাছি ভন ভন করছে। ধরাধরি করে বোটে তোলা হলো তাকে, আলতোভাবে নামানো হলো ডেকে। ছুটে গিয়ে খানিকটা হুইস্কি নিয়ে এল হেগেন, লিয়েনের গলায় ঢেলে দিল। খক্-খক্ করে কাশল লিয়েন। তাকে পরীক্ষা করতে গিয়ে ভয় পেয়ে গেল রানা। শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যাবে না। এই লোক কিভাবে বৈঠা চালিয়ে এসেছে সেটাই আশ্চর্য। হুইস্কি খাওয়ার পর কি ঘটেছে ধীরে ধীরে বলতে পারল লিয়েন।

লিমাকে নিয়ে নিরাপদেই গ্রামে পৌঁছায় সে। গ্রামের লোকজন জাল মেরামত করছিল। সবাইকে চুপচাপ দেখে তার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি। ক্যানু থেকে তারা মাটিতে পা দিতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একদল চীনা, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। বৃথাই, বোকার মত, ধস্তাধস্তি শুরু করে লিয়েন। রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড মার দিয়েছে ওরা। জ্ঞান ফেরার পর দেখে একটা ঘরে শুয়ে আছে সে। দরজায় কোন পাহারা ছিল না। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসে সে। কেউ ওকে দেখতে পায়নি, একটা ক্যানু নিয়ে খবরটা দিতে এসেছে।

লিয়েনের কথা ভাষান্তর করে ডয়েস আর হেগেনকে শোনাল রানা। তারপর নিজের প্ল্যানটাও ব্যাখ্যা করল। 'লিয়েন কোন শ্বেতাঙ্গকে দেখেনি শুধু একদল

চীনাকে দেখেছে। তবে চীনাদের সঙ্গে রেড ড্রাগন থাক বা না থাক, সারপ্রাইজ অ্যাটাকের এই সুযোগ আমরা ছাড়তে পারি না। এত তাড়াতাড়ি ওরা কোন হামলা আশা করছে না।' ডয়েসের দিকে তাকাল ও। 'তুমি আর আমি যাচ্ছি। একটা থম্পসন আর কয়েকটা গ্রেনেড নাও।' ডয়েস চলে যেতে হেগেনের দিকে তাকাল। 'তুমি থাকছ, হেগেন। সন্ধের মধ্যে আমরা যদি না ফিরি, তোমার প্রথম কাজ হবে আত্মরক্ষার জন্যে পালানো। সুযোগ পেলে সব সোনা জলাভূমিতে কোথাও ফেলে যেয়ো। ফেলার সুযোগ একান্তই যদি না পাও, এই সোনা নিজের কোন কাজে ব্যবহার কোরো না। আরেকটা কথা। হার্ডি বা অন্য কাউকে বিশ্বাস করা উচিত হবে না।'

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল হেগেন, রানা থামতে বোকার মত মাথা ঝাঁকাল। সাব-মেশিনগান নিয়ে বেরিয়ে এল ডয়েস, বেল্টে কয়েকটা গ্রেনেড নিয়েছে। রেইল থেকে লাফ দিয়ে ক্যানুতে নামল রানা। ক্যানুর পিছনে বসল ডয়েস। বোর কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকল লিয়েন। ডয়েস বৈঠা চালাতে শুরু করল। বোট থেকে দূরে সরে আসছে ওরা, ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল হেগেন। একটা কথাও বলেনি সে, এমন কি বিদায় জানাবার জন্যে হাতও নাড়েনি। নলখাগড়ার জঙ্গলে ঢুকল ক্যানু। বোট অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা জানে, হেগেন ভাবছে ওরা আর ফিরে আসবে না। তার দৃষ্টিতে মারা গেছে ওরা।

শিউরে উঠল রানা।

আধ ঘণ্টা বৈঠা চালাতেই ঘেমে উঠল ওরা। সিধে হয়ে বসল লিয়েন, চারদিকে চোখ বুলিয়ে জানাল, ওদের গ্রাম আর মাত্র কয়েকশো গজ দূরে। লম্বা ও খোলা একটা জলপথে চলে এল ওরা, সবুজ শ্যাওলা আর শাপলা পাতায় পুরোপুরি ঢাকা। জলপথের অর্ধেকটা পেরিয়েছে ক্যানু, সামনের নলখাগড়ার শেল্টার থেকে গর্জে উঠল একটা অটোমেটিক উইপন। কাতর একটা শব্দ করে রানার গায়ে আছাড় খেলো লিয়েন, তার বুক আর পেটে এক লাইনে এক পশলা বুলেট ঢুকেছে।

বৈঠা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল রানা, কারবাইন দিয়ে নলখাগড়ার বনে বুলেট স্প্রে করছে, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল থম্পসনের স্লিংটা মাথার ওপর দিয়ে তুলে আনছে ডয়েস। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট রানার মুখে পানি ছিটাচ্ছে, তবু কোন বিরতি না নিয়ে নলখাগড়ার জঙ্গলে ম্যাগাজিনটা খালি করল ও। থম্পসনে আরেকটা ক্লিপ পরাচ্ছে, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে সিধে হলো ডয়েস, হাত দিয়ে মুখ ঢাকল, আঙুলের ফাঁক গলে রক্ত বেরুচ্ছে। এক মুহূর্ত টলমল করল সে, তারপরই কাত হয়ে পড়ে গেল পানিতে, উল্টে যাওয়া ক্যানুটাও তার পিছু নিল।

রানার হাত থেকে খসে পড়ল কারবাইন, পানির ওপরে মাথা তুলে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে শুরু করল। এদিকের পানি নোংরা, দুর্গন্ধে বমি পাচ্ছে, কাশছে খক খক করে। চোখ মেলে তাকাতেই ডয়েসের মুখটা দেখতে পেল ও, ম্লান ও রক্তাক্ত। ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করল তাকে, কিন্তু

তার আগেই তলিয়ে গেল সে।

সেই মুহূর্তে ওর পিঠে ধাক্কা খেলো ক্যানুটা। মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে কয়েকটা চীনা মুখ দেখতে পেল রানা, সবাই ওর দিকে অস্ত্র তাক করে হাসছে। আঘাতটা দেখতে পেল ও, কিন্তু ঠেকাবার জন্যে কিছুই করতে পারল না। রাইফেলের উল্টোপিঠ দিয়ে দড়াম করে বাড়ি মারল এক চীনা ওর ঘাড়ে। চোখের সামনে রঙিন আলো বিস্ফোরিত হলো।

আধ বোজা চোখে বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওর মুখের সামনে স্থির হয়ে আছে ওগুলো। খানিক পর একটা পায়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। রানার পাঁজরে লাথি মারল লোকটা। প্রচণ্ড ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, ভয় পেল আবার না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঠাণ্ডা মাটির মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে, দেখল ঘুরে গেল বুট জোড়া, লাথি মেরে দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দম ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে বসল রানা।

মাটির একটা ঘরে, এক কোণে রয়েছে ও। বাতাসে অসহ্য দুর্গন্ধ। আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে ঘরের আরেক কোণে তাকাতে দেখল মানুষের বিষ্ঠা স্তূপ হয়ে রয়েছে, কাছাকাছি মেঝেতে পড়ে রয়েছে দু'জন লোক। ওর পিছন দিকের মাটির দেয়ালে ফাটল ধরেছে, ক্ষীণ আলো ঢুকছে ভেতরে, সরে এসে সেই আলোয় নিজেকে পরীক্ষা করল ও।

খুলির একটা দিক ফুলে বেঢপ আকৃতি পেয়েছে, জমাট রক্তের সঙ্গে আটকে গেছে চুল। অনুসন্ধানী হাতের আঙুল একঝাঁক মাছির গা স্পর্শ করতে শিউরে উঠল সারা শরীর। ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, সাবধানে হাত ও পা নাড়ল। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়েছে ও, হাত-পায়ের কোন হাড় না ভাঙলেও পাঁজরে খুব ব্যথা। কয়েক পা এগিয়ে লোক দু'জনকে পরীক্ষা করল।

দু'জনই কম্বোডিয়ান, মারা গেছে। অমানুষিক নির্যাতন করার পর এই ঘরে ফেলে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে, ওরা মারা গেছে চিকিৎসার অভাবে। লাশগুলো থেকে মাছির মেঘ উঠল। ঘুরে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করল রানা, হড়হড় করে বেরিয়ে এল পেটে যা কিছু ছিল।

টলতে টলতে আগের জায়গায় ফিরে এসে বসল রানা। দরজার কবাট অর্ধেক খোলা। ওর অবস্থা দেখে চীনারা সম্ভবত ধরে নিয়েছে আরও বহুক্ষণ নড়াচড়া করতে পারবে না ও। দাঁড়াতে ভয় করছে, মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে। ক্রল করে দরজার পাশে চলে এল। এখানকার বাতাস তাজা, কিছুক্ষণ পর সুস্থ বোধ করল। বাইরে তাকাতে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। বিকেলের তীব্র রোদে গোটা গ্রাম যেন ঘুমাচ্ছে। নলখাগড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটা দ্বীপে ত্রিশটার মত ঘর, গায়ে গায়ে ঠেকে আছে। পেটমোটা একটা মোটর লঞ্চ, চল্লিশ ফুট লম্বা হবে, কাঠের জেটির পাশে বাঁধা। জেটিটা লম্বা হয়ে আছে পানির ওপর। মোটর লঞ্চের ডেকে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাতাস নেই, পতাকাটা উড়ছে না। ওটা কোন্ দেশের পতাকা, আদৌ কোনও দেশের কিনা বোঝা গেল না। জমাট নিস্তব্ধতা অকস্মাৎ চুরমার হয়ে গেল আদিবাসি একটা মেয়ের

আর্তচিৎকারে। চিৎকারটা আশপাশের কোনও ঘর থেকে বেরিয়েছে। তারপর রানা মেয়েটিকে দেখতে পেল। একটা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠান ধরে প্রাণপণে ছুটছে। বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়েস, পরনে কিছুই নেই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উঠানে বেরিয়ে এল দু'জন চীনা। একজন মেয়েটির কব্জি ধরে ঘোরাল, তারপর ঠাস করে চড় মারল নাকে-মুখে। অবশ মেয়েটা নেতিয়ে পড়ল উঠানে। হাসতে হাসতে চীনা দু'জন তুলল তাকে, ধরাধরি করে ফিরিয়ে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর।

ঘরের ভেতর দিকে, আবছা অন্ধকারে সরে এল রানা। অসুস্থ বোধ করছে আবার। মেয়েটিকে ভাল করে দেখতে পায়নি ও। বয়েস, কাঠামো, গায়ের রঙ–সবই তো লিমার সঙ্গে মিলে যায়!

দেয়াল ধরে সিধে হলো রানা, তারপর টলতে টলতে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল। থেমে চারদিকে তাকাচ্ছে, ভাবছে কি করবে। উত্তেজিত একটা গলা ভেসে এল। চীনাদের কেউ একজন চিৎকার করছে। কোত্থেকে কে জানে তিনজন চীনা ছুটে এল। লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠল তারা, হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল।

বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে বারান্দা থেকে নামল রানা। আরও বড় ও ভাল করে লেপা একটা মাটির ঘরের সামনে আনা হলো ওকে। ওর সামনে ছ'টা ধাপ। ইতস্তত করছিল, পিছন থেকে লাথি খেলো নিতম্বে। উঁচু বারান্দায় ওঠার পর আরেকটা লাথি। ঘরের ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, শুনতে পেল ওর পিছনে কেউ জোরে দম নিচ্ছে, অর্থাৎ আবার লাথি খেতে হবে।

প্রচণ্ড রাগে অন্ধ হয়ে গেল রানা। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে পিছন দিকে বুট চালাল ও। ওর পায়ের গোড়ালি কারও হাঁটুর ওপর আঘাত করল। পিছনে গুঙিয়ে উঠল একজন চীনা। আধ পাক ঘুরেই লোকটার মাথা দু'হাতে ধরে পাশের দেয়ালে ঠুকে দিল রানা।

মৃত্যু এগিয়ে এল, একজোড়া বেয়োনেট। দুই চীনার চোখে প্রতিহিংসার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। ঠিক যখন রানার পেটে বেয়োনেটগুলো ঢুকবে, চীনা ভাষায় কেউ একজন কথা বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র নিচু করল চীনারা। অজ্ঞান সঙ্গীকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। ওই একই কণ্ঠ থেকে ইংরেজিতে বলা হলো, 'ভেতরে এসো, মাসুদ রানা। সত্যি তুমি ভয়ঙ্কর লোক!' গলাটা কর্নেল ম্যাট হিথের।

ঘরটা বিরাট। নিচু একটা টেবিলের ওপাশে বেতের চেয়ারে বসে রয়েছে রেড ড্রাগন। তার উল্টোদিকে একটা কাঠের চেয়ার, এগিয়ে এসে তাতে বসল রানা। টেবিলের ওপর জিন-এর একটা বোতল দেখে তুলে নিল, গলায় ঢালল খানিকটা। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে কর্নেল। দম নিয়ে আরও খানিকটা জিন খেলো রানা। জিনিসটা টনিক হিসেবে কাজ করবে। চেয়ারে হেলান দিল ও, বলল, 'বেশ আরামেই আছ দেখছি।'

'দুনিয়াটা কাড়াকাড়ির জায়গা, রানা,' হেসে উঠে বলল কর্নেল হিথ। 'যারা কেড়ে নিতে জানে তারা ভোগ করে, যারা কেড়ে নিতে দেয় তারা ঠকে। আমরা

ভোগী, তুমি আর আমি। আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করি, ভাগাভাগিটা সহজ হয়ে যায়।'

রানা কথা বলল না।

পাইপে আগুন ধরিয়ে সরু করে ধোঁয়া ছাড়ছে রেড ড্রাগন। 'আমি জানতাম, লিমার জন্যে অবশ্যই আসবে তুমি। তোমার মনটা সত্যি খুব নরম। জানি না এই মন নিয়ে এসপিওনাজ জগতে আজও তুমি সারভাইভ করছ কিভাবে।' হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল সে। 'সে যাক। মিস লিমার রূপ-যৌবন সত্যি আমাকেও পাগল করে তুলেছে। এরকম একটা নোংরা নরকে তার মত পদ্ম ফুটল কিভাবে তাই ভাবছি।'

রানা অপেক্ষা করছে।

'তবে, দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সাংঘাতিক গোঁয়ার,' বলল কর্নেল। রানার চেহারা কঠিন হয়ে উঠতে দেখে হাত নাড়ল সে। 'না না, ব্যস্ত হয়ো না, তার গায়ে হাত তোলা হয়নি। আমি তার কোন ক্ষতি করতে চাই না-এখুনি।'

'আমার বন্ধুর খবর বলো,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'তাকে তোমার লোকজন তুলে এনেছে?'

'ওরা তাকে খোঁজেওনি,' বলল কর্নেল। একটু পর বলল, 'ব্যাপারটা সত্যি দুঃখজনক, রানা।'

'কোনটা?'

'এই যে, আমরা একদলে নেই।' হেসে উঠল কর্নেল। 'আমি সুযোগ-সন্ধানী, তুমিও তাই, অথচ দু'জনের মধ্যে অনেক অমিল। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার অনেক জিনিসই আমার বোধগম্য হয়নি।'

পিছনে পায়ের শব্দ পেল রানা। চীনা উচ্চারণ, তবে ইংরেজিতে কথা বলছে কেউ, 'এ স্রেফ সময়ের অপচয়, কর্নেল। ইন্টারোগেশনে কোন লাভ হচ্ছে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। খাকি ইউনিফর্ম পরা একজন চীনা, মাথায় টাক, শরীরটা রশির মত পাকানো। কপাল থেকে ঘাম মুছল সে। হিথ বলল, 'মেজর ইয়াং চ্যাঙ, রানা। এই মিশনে ওই আমার ডান হাত।'

হিথের দিকে ফিরে রানা বলল, 'কথাটা ঠিক। আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি।'

পাইপে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল কর্নেল। 'তোমার বোট, রানা। নলখাগড়ার জঙ্গলের ভেতর কোথাও আছে ওটা। ধরে নিচ্ছি, সোনাও তুমি উদ্ধার করেছ। কাজেই, একটা চুক্তিতে আসার এটাই আদর্শ সময়।' হঠাৎ আবার হাসল সে। 'আগেই বলেছি, তোমার অনেক জিনিসই আমি বুঝি না। তবে আমার একটা থিওরি আছে। পরীক্ষা করে দেখা যাক।' ইয়াং চ্যাঙের দিকে তাকাল সে, বলল, 'মিস লিমাকে নিয়ে এসো।'

দ্বিতীয় দরজাটা ঘরের অন্ধকার এক কোণে। সেটা খুলে পাশের ঘর থেকে বের করে আনা হলো লিমাকে। ধীর পায়ে, ভয়ে ভয়ে, হেঁটে এল সে। চোখে ইতস্তত ভাব, রানাকে চিনতে পেরে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। হোঁচট খেলো, ছুটে এসে রানার গায়ে পড়ল। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে তাকে ধরে ফেলল রানা। 'সব

ঠিক হয়ে যাবে, লিমা! তুমি স্থির হও।'

হেসে উঠে কর্নেল বলল, 'এরকম প্রেম সাধারণত দেখা যায় না। প্রেমিকার জন্যে এত বড় ত্যাগ, সত্যি তোমার তুলনা হয় না, রানা!'

লিমার কাঁধের ওপর দিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'কি চাইছ তুমি?'

দ্রুত এগিয়ে এসে রানার পাশ থেকে হ্যাঁচকা টানে লিমাকে সরিয়ে নিল চ্যাঙ, সেই সঙ্গে কষে একটা চড় মারল রানার গালে। 'তুমি শালা দেখিয়ে দেবে বোটটা কোথায়!'

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, কর্নেলের হাতে একটা অটোমেটিক বেরিয়ে এসেছে। 'কেন দেখাব? তোমরা তো এমনিতেই খুন করবে আমাদের।'

মেজর চ্যাঙ পা তুলে লাথি মারল রানার পাঁজরে।

চেয়ার সহ মেঝেতে পড়ে গেল রানা। ব্যথায় মোচড় খাচ্ছে শরীরটা, ম্যাট হিথের গর্জন শুনতে পেল। 'ইউ ফুল! ওকে আমাদের দরকার! এই লোককে রাজি করানো এত সহজ ভেবেছ? সোনার ভাগ চাইলে গোটা ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

পিছিয়ে গেল চ্যাঙ।

'মিস লিমা,' জিজ্ঞেস করল কর্নেল, 'তুমি কি জানো, তোমার সমস্ত সোনা মাসুদ রানা মেরে দেয়ার তালে আছে?'

ধীরে ধীরে, ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লিমা। 'ওনার সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি জানি উনি কেমন মানুষ। যদি ভেবে থাকেন আমরা আপনাকে সাহায্য করব, ভুলে যান।'

লিমা থামতেই রানা বলল, 'গোটা জলা চষে ফেললেও বোটটা তুমি খুঁজে পাবে না, হিথ।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল কর্নেল। হাত দিয়ে ইশারা করল মেজর চ্যাঙকে। চ্যাঙ কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে রানা ও লিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এসো, রানা, বারান্দায় বেরোই। ওখানে আমাদের জন্যে একটা শিক্ষামূলক নাটকের দৃশ্য অপেক্ষা করছে।'

বারান্দায় বেরিয়ে এল সবাই ওরা।

উঠানে, ওদের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে, চারজন সশস্ত্র চীনা টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদিবাসী একজন জেলেকে উঠানে ব্যাঙের আকৃতিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে–ভাঁজ করা পা জোড়া শরীরের দু'পাশে, মুখটা মাটির সঙ্গে সাঁটা। লোকটা সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। দু'জন চীনা শক্ত করে মাটির সঙ্গে চেপে রেখেছে তাকে। তার কয়েক হাত পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজর চ্যাঙ, তার হাতে তিন ফুট লম্বা একটা বাঁশ, ডগাটা চেঁছে সুইয়ের মত চোখা করা হয়েছে। হতভাগ্য জেলের পাশে হাঁটু গাড়ল সে।

তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল লিমা। ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকতে যাবে, তার পথ আটকাল কর্নেল। রানার দিকে ফিরল মেয়েটা, ওর কাঁধে মুখ লুকাল।

চিৎকারটা রোমহর্ষক। দৃশ্যটা দেখে প্রচণ্ড ঘৃণা ও আতঙ্কে থরথর করে

কেঁপে উঠল রানা, তারপর হিথের দিকে তাকাল। উঠানের ঘটনাটা নির্লিপ্ত একটা ভাব নিয়ে চাক্ষুষ করছে হিথ। চেহারায় বা চোখে কোন নৃশংসতা বা বিকৃত আনন্দ নেই। ধমকের সুরে নির্দেশ দিল সে। দু'জন সৈনিক দ্রুত এগিয়ে এল বারান্দার দিকে। মুহূর্তের জন্যে রানার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। হিথ বলল, 'আমার সঙ্গে এসো, রানা।'

বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা। উঠানের কিনারা ঘেঁষে সেই আগের ঘরটার দিকে এগোচ্ছে, যেখানে রানার জ্ঞান ফিরেছিল।

বারান্দায় উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এবার কি?'

কর্নেলের চেহারা থমথম করছে। 'তোমাদের আধ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো,' বলল সে। 'মিস লিমা তোমার সঙ্গেই থাকুক। তোমার প্রতি তার আকর্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হতে পারে। আধ ঘণ্টা পর কি ঘটবে বুঝে নাও। বিশ্বাস করো, রানা, কাজটা আমি করতে চাই না। দয়া করে আমাকে বাধ্য কোরো না। ঠিক আধ ঘণ্টা পর আমার লোকজন তোমাদের একজনকে উঠানে নামিয়ে আনবে। তারপর ধরা হবে অপরজনকে।' বারান্দা থেকে নেমে গেল সে। দু'জন চীনা রানা আর লিমাকে ঠেলে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

লিমাকে নিয়ে লাশ দুটোর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে এল রানা। ওকে ধরে প্রায় ঝুলে পড়েছে লিমা, কাঁধে আর বুকে মুখ ঘষছে, আতঙ্কে ফোঁপাচ্ছে সারাক্ষণ। ঘরের কোণে তাকে বসাল ও। 'ভয় পেয়ো না, লিমা,' অভয় দিয়ে বলল। 'তোমার কিছু হবে না। আমি কথা দিচ্ছি।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল লিমা। 'বোট কোথায় আপনি বলে দেবেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রেড ড্রাগন মিথ্যে হুমকি দেয়নি। যা বলেছে তা সে করবে।'

আবার রানাকে জড়িয়ে ধরল লিমা। থরথর করে কাঁপছে সে। রানার পিছনে কোথাও থেকে আঁচড়ানোর একটা শব্দ আসছে। অস্পষ্ট, তবে শোনা যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত নড়ল না রানা। তারপর মুখ নামিয়ে লিমার কানে ফিসফিস করল, 'নড়ো না।' ঘাড় ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও। মাটির দেয়ালের নিচে মেঝের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। শব্দটা বাড়েনি, তবে থামেওনি। মেঝেতে হঠাৎ খুদে একটা গর্ত তৈরি হলো, গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ছুরির ফলা, এক পাশে ছিটকে পড়ল মাটির বড় একটা খণ্ড। গর্তটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। এক সময় সেখানে একটা মুখ দেখতে পেল রানা।

এক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নিস্তব্ধতা ভাঙল ডয়েসই। 'সারপ্রাইজ! সারপ্রাইজ!' রক্তে ভেজা ছেঁড়া শার্ট জড়ানো রয়েছে তার মাথায়, গভীর ব্যথায় চোখে কাতর দৃষ্টি। 'বুলেট শুধু ছুঁয়ে গেছে আমাকে,' আবার বলল সে। 'নলখাগড়ার আড়াল থেকে হিথ শুয়োরের বাচ্চার কাণ্ডটা দেখলাম। দেখলাম ওরা তোমাদেরকে এখানে রেখে গেল।'

কাউকে দেখে এত খুশি জীবনে কখনও হয়নি রানা। 'দরজায় দু'জন বাঁদর

আছে, তবে এখুনি তারা আমাদেরকে বিরক্ত করবে না,' বলল ও। 'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে?'

গর্ত দিয়ে একটা সাব-মেশিনগান ঢোকাল ডয়েস। 'একটু ভেজা, তবে কাজ করবে। দুটো গ্রেনেডও আছে। বাকিগুলো পানিতে হারিয়ে ফেলেছি।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে গর্তের দিকে ঝুঁকল লিমা। 'এটাই তোমার সত্যিকার পরিচয়, ডয়েস। তোমাকে লোকে চিনতে ভুল করে, সেজন্যে তোমার উল্টোপাল্টা আচরণই দায়ী। এখন আমি রানাকে গর্বের সঙ্গে বলতে পারব, তুমি সত্যি লোক খারাপ নও। তুমি কি এখনও বিশ্বাস করো, রানা আমাদের প্যাগোডার সোনা মেরে দিতে চাইছেন?'

'এখন, এই পরিস্থিতিতে, এ প্রসঙ্গ?' চাপা গলায় হেসে উঠল ডয়েস। 'এসো, আগে তোমরা বাইরে বেরোও।'

রানা ও ডয়েস হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গটাকে আরও বড় করল। ক্রল করে প্রথমে বেরোল লিমা, তার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। ঘরের গায়ে গা ঠেকিয়ে কয়েক সেকেন্ড বসে থাকল ওরা, কান পেতে আছে। ঘরের সামনে দু'জন চীনা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, অন্য কোন শব্দ নেই। হাত তুলে একটা বাঁশ ঝাড় দেখাল ডয়েস, বিশ গজ দূরে। সেদিকে দ্রুত এগোল ওরা, সবার পিছনে সাব-মেশিনগান নিয়ে রানা। বাঁশ ঝাড় থেকে কয়েক ফুট দূরে ওরা, এই সময় পিছন থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। দ্রুত ঘুরে এক পশলা গুলি করল রানা, স্রেফ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। গার্ডদের একজন গর্ত থেকে অর্ধেক বেরিয়ে এসেছে। চারপাশে বুলেট বৃষ্টি হতে আবার ভেতরে সেঁধিয়ে গেল। দ্বিতীয় লোকটা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এসে চিৎকার জুড়ে দিল। বাঁশ ঝাড়ের দিকে রাইফেল তুলছে, আরও এক পশলা গুলি করল রানা। শূন্যে উঠে পড়ল লোকটা, ঝাঁকি খেতে খেতে ফিরে গেল খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর।

দু'হাতে গাছ সরিয়ে ভেতরে ঢুকল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোনদিকে যাব?'

'ওরা আমাকে ফেলে আসার পর ক্যানুটা আবার ভাসিয়েছি। নলখাগড়ার জঙ্গলে আছে। এসো!'

ছুটছে ওরা। কেউ কথা বলছে না। চীনারা ওদের পিছু নিয়েছে, হৈ-চৈ শুনে বোঝা গেল। একবার হোঁচট খেলো লিমা, রানা তাকে ধরতে গেল। ওর হাত সরিয়ে দিয়ে আবার ছুটল সে। হঠাৎ করেই বাঁশ ঝাড় থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে খোলা জায়গা, লম্বা ঘাসে ঢাকা, পায়ের নিচে নরম কাদা হয়ে আছে মাটি। ছোটার গতি কমে এল। পা ডেবে যাচ্ছে। তবে খুব বেশি দূর যেতে হবে না। নলখাগড়ার নিরাপদ আড়াল মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ গজ দূরে।

ঝপ্-ঝপ্ করে পানিতে পড়ল ওরা, কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল। এতক্ষণে আশার আলো দেখতে পাচ্ছে রানা, শেষ পর্যন্ত হয়তো পালাতে পারবে। তারপর মনে পড়ল, ড্রাগ সম্রাট রেড ড্রাগনকে খতম করার জন্যে ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছে ওকে। সোনা উদ্ধার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার, আসল উদ্দেশ্য রেড ড্রাগনের জন্যে ফাঁদ পাতা। চীনারা ধাওয়া করছে, কাজেই ফাঁদ পাতার

সময় ও সুযোগ আরও পাওয়া যাবে।

এই সময় হোঁচট খেলো লিমা, পানিতে পড়ে গেল। তাকে তোলার জন্যে ঘুরল ডয়েস, অকস্মাৎ ভেসে এল একটা উল্লাস ধ্বনি। লিমা আর ডয়েসের মাথার মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে গেল রাইফেলের একটা বুলেট। ঝট করে ঘুরল রানা, এক পশলা গুলি করল বাঁশ ঝাড় থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা চীনাদের লক্ষ্য করে। দু'জন চীনা ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেল, বাকি সবাই আড়াল নিল।

ঘুরে ডয়েস আর লিমাকে অনুসরণ করল রানা। পানির গভীরতা বাড়ছে। তবে ওদের চারপাশে এখন নলখাগড়ার নিশ্ছিদ্র প্রাচীর।

আট

গলা পর্যন্ত উঠেছিল, নলখাগড়ার গভীর জঙ্গলে ঢোকার পর ক্রমশ কমে কোমর পর্যন্ত নেমে এল পানি। আঠাল পলিতে আটকে যাচ্ছে পা, কোথাও কোথাও দেবে যাচ্ছে হাঁটু পর্যন্ত। পিছন থেকে চীনাদের রক্ত হিম করা চিৎকার ভেসে আসছে। হাতের অস্ত্র আরও শক্ত করে ধরল রানা।

হঠাৎ করে পানির গভীরতা বাড়ল, এক নিমেষে তলিয়ে গেল লিমা। ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পিছু নিল ডয়েস। পানির নিচে ধস্তাধস্তি শুরু হলো। জাপটে ধরে লিমাকে তুলে আনল ডয়েস। কাদা-পানি খেয়ে খকখক করে কাশতে শুরু করল মেয়েটা। চোখ বুজে ডয়েসের কাঁধে মাথা রাখল সে, তার পিঠটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে। সেই পিঠে হাত বোলাচ্ছে ডয়েস, কর্কশ গলা যতটুকু সম্ভব মোলায়েম করে অভয় আর সান্ত্বনা দিচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে নতুন একটা দায়িত্ব অনুভব করল রানা। এক জোড়া কপোত-কপোতীকে যেভাবে হোক বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে পরস্পরকে ভালবেসে ফেলেছে ওরা। রানা ওদের এই ভালবাসার সফল পরিণতি দেখতে চায়।

ডয়েসের কাঁধ থেকে মুখ তুলে কপাল থেকে ভেজা চুল সরাল লিমা। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে এত কষ্ট ও বিপদের মধ্যেও রাঙা বেদানা হয়ে উঠল তার চেহারা। 'ছাড়ো আমাকে,' বিড়বিড় করল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল ডয়েসকে। 'আমার কিছু হয়নি, সত্যি বলছি! চলো, এগোই।'

আবার ওরা এগোচ্ছে। নলখাগড়ার জঙ্গল হালকা হয়ে আসছে। এদিকের আড়াল নিশ্ছিদ্র নয়। কিছুক্ষণ পর একটা হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে পড়ল ডয়েস। চারদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি বোলাল সে, চোখে সংশয় ও দ্বিধা।

'কোথায় তোমার ক্যানু?' জিজ্ঞেস করল রানা, গলার আওয়াজ নিজের অজান্তেই কর্কশ হয়ে গেল।

ক্ষীণ হলেও, ডয়েসের গলায় আতঙ্কের ছোঁয়া। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। ভেবেছিলাম সহজেই খুঁজে পাব। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জায়গাটা গ্রাম থেকে এত দূরে হবার কথা নয়।'

কাকে যেন অভিশাপ দিল রানা, হাত তুলে কপালের ঘাম মুছল। কাছাকাছি কোথাও থেকে মট মট আওয়াজ ভেসে এল, নলখাগড়া ভেঙে ছুটে আসছে চীনারা। 'চলো এখান থেকে সরে যাই,' হিসহিস করল ডয়েস। 'ওরা একেবারে কাছে চলে এসেছে!'

কখনও সাঁতরে, কখনও কাদা ভেঙে এগোচ্ছে ওরা। ধাওয়ার শব্দ থামছে না। প্রত্যেকে ওরা বারবার হোঁচট খাচ্ছে, পায়ের নিচে জমিন সিঁড়ির ধাপের মত, কখনও নেমে গেছে, কখনও উঁচু হয়েছে। একবার একটা কুয়ার ভেতর তলিয়ে গেল রানা, হাতড়ে নিজের চারপাশে দেয়াল ছাড়া কিছুই পেল না। কুয়া থেকে বেরুবার পর দেখল লিমাকে নিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে ডয়েস। রানাকে দেখেও থামল না ওরা। আবার যখন মিলিত হলো, ডয়েস বলল, 'আমি তো ভাবলাম তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি!'

'কোন কথা নয়!' ধমক দিল রানা। কারণটা বলে দিতে হয় না। চীনারা এখন এত কাছে, ওদের কথা শুনে ফেলতে পারে। আর মিনিট পাঁচেক পর হঠাৎ চওড়া একটা অগভীর জলপথে বেরিয়ে এল ওরা। মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করতে দেখা গেল ডয়েসকে। চাপা গলায় রানা বলল, 'ফর গড'স সেক, ম্যান, থেমো না!' শিরদাঁড়ায় হাতের তালু ঠেকিয়ে এত জোরে ধাক্কা দিল, প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ছিটকে পড়তে যাচ্ছিল ডয়েস। ফাঁকা জায়গাটার ওপারে নলখাগড়ার ঘন জঙ্গল। সেদিকেই যাচ্ছে ওরা। পঞ্চাশ গজের মধ্যে ওটাই একমাত্র নিরাপদ আড়াল হতে পারে।

পঁচিশ গজ এগিয়ে ওরা, চারপাশে বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ওরা। চারজন চীনা কাদার ওপর হাঁটু গেড়ে রাইফেল তাক করে আছে, মুখে তৃপ্তির হাসি। গ্রেনেডের জন্যে বেল্টে হাত দিয়ে গুঙিয়ে উঠল ডয়েস। 'মাত্র একটা। দ্বিতীয়টা কোথায় পড়ে গেছে জানি না।'

'একটাতেই যেন কাজ হয়,' বলল রানা। 'ছোঁড়ো!' কারবাইন তুলে গুলি শুরু করল ও, পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে চীনাদের দিকে এগোচ্ছে। ডয়েসের ছুঁড়ে দেয়া গ্রেনেডটা ওর মাথার ওপর দিয়ে ছুটল। অনেক ওপরে উঠল ওটা, তারপর নামতে শুরু করল। চীনারা দেখতে পেয়ে তাকিয়ে আছে, নীরব হয়ে গেছে হাতের রাইফেল। ওদের একজন অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল চীনারা, আর ঠিক তখনই গ্রেনেডটা ওদের মাঝখানে পানিতে পড়ে বিস্ফোরিত হলো। চোখ-ধাঁধানো আগুন দেখা গেল, লাল চাদর ঢেকে ফেলল চীনাদের। কয়েক মুহূর্ত আকাশ থেকে আবর্জনা বৃষ্টি হলো। তারপর ঝাঁক ঝাঁক বুনো হাঁস গোটা আকাশ ঢেকে দিল, তাদের কর্কশ কোরাসে চাপা পড়ে গেল চার মৃত্যুপথযাত্রীর আর্তনাদ।

ডয়েস আর লিমার কাছে ফিরে এল রানা। 'ক্যানুর খোঁজে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।' লিমাকে ধরে ঘুরিয়ে দিল ও। 'পুব দিকে চলো। চেষ্টা করে দেখি বোটে পৌঁছাতে পারি কিনা।'

আবার রওনা হলো ওরা, তবে সবাই জানে ক্যানু ছাড়া লঞ্চে পৌঁছানো সম্ভব নয়। ইঙ্গিতে ডয়েসকে পিছিয়ে আসতে বলল রানা, লিমাকে ঠেলে দেয়া

হলো সবার সামনে–হামলার আশঙ্কা পিছন থেকে, ফলে নিরাপদ একটা আড়াল পেল লিমা; সবার সামনে থাকায় বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে দ্রুত এগোবার একটা তাগাদাও কাজ করবে। লিমার পিছনে ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে ডয়েস। এক সময় দেখা গেল রানা সাহায্য না করলে সিধে হতে পারছে না। তার মাথার ব্যান্ডেজে তাজা রক্ত দেখতে পেল ও। 'অসুস্থ লাগছে?'

জোর করে হাসল ডয়েস। 'দুর্বল,' বিড়বিড় করল। 'মাথাটা মাঝে মধ্যে ঘুরে উঠছে। মনে হচ্ছে নক-আউট পাঞ্চ খেয়ে পড়ে গেছি, দশ গোনার আগে উঠতে পারব না।'

কারণটা পরিষ্কার, মাথার ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে।

বিশ্রামের জন্যে তবু থামল না ওরা। একটু পর এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল। লিমার গায়ে ধাক্কা খেলো ডয়েস। চাপা গলায় নির্দেশ দিল রানা। তিনজনই মাথা নিচু করে অপেক্ষা করছে।

'ওরা লঞ্চ নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে,' বলল রানা। হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত নিল ও। 'ওটার আওয়াজ অনুসরণ করব আমরা।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?' কর্কশ গলায় বলল ডয়েস। 'সরাসরি কর্নেলের হাতে পড়তে চাও?'

ধৈর্য ধরে ব্যাখ্যা করল রানা, 'লঞ্চটা নিশ্চয়ই গভীর পানিতে রয়েছে। ওটার পিছু নিয়ে আমরা যদি মেইন চ্যানেলে পৌঁছাতে পারি, বীস্টকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে না।'

'খুঁজব কিভাবে? সাঁতরে?'

উত্তর না দিয়ে এগোল রানা। পানির লেভেল ক্রমশ ওপরে উঠছে। আওয়াজ শুনে মনে হলো লঞ্চটা বেশি দূরে নয়। গলা পর্যন্ত ডুবে আছে রানা, হাতের কারবাইন মাথার ওপর তোলা। ওদের সামনে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে নলখাগড়ার বন। পানির সরু একটা বিস্তৃতি পড়ল সামনে। কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। পানির ওপরটা শ্যাওলা আর শাপলাপাতায় ঢাকা। জায়গাটা অস্পষ্টভাবে চেনা চেনা লাগল। তারপর দাঁত বের করে হাসল ডয়েস। তার গলায় আশার ছোঁয়া। 'আরে, এখানেই তো চীনারা অ্যামবুশ পেতে ছিল!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'পথটা এখন চিনতে পারবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'আমি বোধহয় পারব,' বলল লিমা। কিন্তু পরমুহূর্তে লঞ্চের আওয়াজ বেড়ে গেল।

'পিছিয়ে এসো,' সাবধান করে দিল রানা।

পিছিয়ে নলখাগড়ার ভেতর ঢুকল ওরা আবার। ধীর গতিতে গ্রামের দিকে ফিরে যাচ্ছে লঞ্চ। পানির ওপর শুধু মাথা তুলে রেখেছে ওরা, লঞ্চের ঢেউ ডুবিয়ে দিল ওদেরকে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে বোতে কর্নেলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল রানা। রাগে দিশেহারা দেখাচ্ছে তাকে। একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল লঞ্চ, ধীরে ধীরে এঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। ডয়েস জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয় ওরা হাল ছেড়ে দিয়েছে?'

'এতগুলো সোনা···হাল ছাড়বে রেড় ড্রাগন?' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, মাথা নাড়ল। 'মারা যাওয়ার আগে নয়।'

হঠাৎ কাশতে শুরু করল লিমা। তারই ফাঁকে বলল, 'দুঃখিত, ডয়েস। আমি আর পারব না।'

লিমাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানল ডয়েস। ফিসফিস করছে কানে। সাহস যোগাবার চেষ্টা।

কি করা যায় ভাবছে রানা, এই সময় শেষ বিকেলের নিস্তব্ধ পরিবেশে ছপ্ ছপ্ আওয়াজ ভেসে এল, তার সঙ্গে কয়েকজন লোকের ফিসফিসে গলা। পাখির মত কিচিরমিচির করছে চীনারা। নলখাগড়া সরিয়ে সাবধানে উঁকি দিল রানা। একজোড়া ক্যানু সরাসরি ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সামনের ক্যানুতে তিনজন, পিছনের ক্যানুতে দু'জন–দু'জনের মধ্যে একজন মেজর ইয়াং চ্যাঙ। হিংস্র হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল রানার, হাত বাড়িয়ে লিমার কাঁধ ছুঁলো ও, নিচু গলায় বলল, 'আর কয়েক মিনিট টিকে থাকো, লিমা। কথা দিচ্ছি, এই নরক থেকে ঠিকই তোমাকে উদ্ধার করব আমরা।'

'জেসাস খ্রিস্ট, ওরা পাঁচজন!' বিড়বিড় করল ডয়েস।

সাব-মেশিনগানে হাত বোলাল রানা। 'সিটিং ডাকস।'

শব্দ বলতে ওদের নিঃশ্বাস আর চীনাদের ফিসফাস। ধীরে ধীরে ক্যানু দুটো কাছে চলে আসছে। জঙ্গলের একেবারে কিনারায় সরে এসেছে রানা ও ডয়েস। রানা সম্পূর্ণ শান্ত। জানে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। কারবাইন ওপরে তুলে শক্তভাবে কাঁধে ঠেকাল স্টক। বাম চোখ বন্ধ হয়ে গেল, ডান চোখ কুঁচকে ব্যারেল বরাবর তাকিয়ে আছে। বলতে গেলে উপলব্ধি করার আগেই ওর দৃষ্টিপথ পাড়ি দিতে শুরু করল প্রথম ক্যানুটা। ট্রিগারে টান দিল ও।

এক ঝাঁক বুলেট বিঁধল তিনজনের গায়ে। ব্যারেল ঘুরিয়ে আবার ট্রিগার টানল রানা। কিন্তু এবার কোন গুলিই বেরুল না।

বিস্ময়ের ধাক্কায় পাথর হয়ে গেল রানা। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি বলে দিল জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে মাত্র এক চুল ফারাক। বৃথা ট্রিগার টানার পর এক সেকেন্ডও পেরোয়নি, অকেজো অস্ত্রটা দ্বিতীয় ক্যানুর দ্বিতীয় লোকটার মুখে ছুঁড়ে মারল ও। লোকটা চ্যাঙের সামনে বসে ছিল, চেঁচিয়ে উঠে চিৎ হলো। পিস্তল বের করেই গুলি করল চ্যাঙ, লক্ষ্যস্থির করেনি। নলখাগড়ার জঙ্গল বিস্ফোরিত হলো, ক্যানুর কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল ডয়েস। ক্যানু উল্টে যাচ্ছে, ডয়েসের কপালে পিস্তল ঠেকাবার চেষ্টা করছে চ্যাঙ। ক্যানু ছেড়ে পানিতে ডুব দিলে ডয়েস বাঁচতে পারে, কিন্তু তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে, বোকার মত তাকিয়ে আছে চ্যাঙের মুখের দিকে।

হাত বাড়িয়ে নাগাল পেয়ে গেল রানা। ডয়েসের কপাল বরাবর পিস্তল তাক করেছে চ্যাঙ, চিলের মত ছোঁ দিয়ে সেটা কেড়ে নিল রানা, শুনতে পেল ওর পিছনে ফোঁপাচ্ছে লিমা।

চ্যাঙের সঙ্গী পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, তাকে পরপর দুটো গুলি করল রানা। ডয়েস সংবিৎ ফিরে পেয়ে চ্যাঙের গলাটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বারবার

চোবাচ্ছে পানিতে। আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠল চ্যাঙের চোখ দুটো। 'সরো,' বলে ডয়েসকে ঠেলে সরিয়ে দিল রানা, চ্যাঙের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল।

আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেল পরিবেশ। সেই নিস্তব্ধতার ভেতর ধীরে ধীরে ফিরে এল আওয়াজটা। 'লঞ্চ!' বিড়বিড় করল ডয়েস।

'জলদি! আড়াল নাও!' খপ করে একটা ক্যানু ধরে ফেলল রানা।

নলখাগড়ার ভেতর ঢুকল ওরা, ঠিক তখুনি খোলা জলপথে বেরিয়ে এল লঞ্চটা। অস্পষ্ট একটা চিৎকার ভেসে এল। এঞ্জিন থেমে গেল। আরও কয়েকটা উত্তেজিত গলা ভেসে এল। অবশেষে কর্নেল ম্যাট হিথের গলা শুনতে পেল ওরা। রানা বুঝতে পারছে, অন্তত কয়েকটা লাশ ওদের চোখে পড়েছে।

লিমাকে দু'হাতে ধরে উঁচু করল রানা, ক্যানুর মাঝখানে বসিয়ে দিল। ওর ইঙ্গিতে সামনে চলে গেল ডয়েস, ক্যানুটাকে টানছে। পিছনে গার্ড দিচ্ছে রানা। একটু পর ক্যানুটাকে অনুসরণ করল ও।

আকাশ কালো হয়ে আসছে। দিগন্তে হারিয়ে যাওয়া সূর্যের উল্টোদিকে যাচ্ছে ওরা। বিশ মিনিট বিরতি না নিয়ে এগোল। কয়েকবার বাঁক ঘুরল, কাদার বিস্তৃতি পেরোল। অবশেষে বড় একটা লেগুনে পৌঁছে চেনা চেনা লাগল। ডয়েস উঠে বসল ক্যানুতে, টেনে তুলল রানাকে। আড়ষ্ট ভঙ্গি, দু'জনেই বৈঠা চালাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শব্দ বলতে শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাক। হঠাৎ লিমা আর ডয়েসকে চমকে দিয়ে হাঁক ছাড়ল রানা, 'হে-গে-ন!'

কান পাতল ওরা। সন্ধের নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে থাকল। তারপর যেন অন্য এক রাজ্য থেকে ভেসে এল আওয়াজটা, 'এদিকে, ফ্রেন্ড, এদিকে!' হেগেনের গলা।

ছপ্-ছপ্ দ্রুত পানিতে পড়ছে জোড়া বৈঠা, ওরা যেন হারানো শক্তি সবটুকু ফিরে পেয়েছে। নলখাগড়ার জঙ্গল নুয়ে নুয়ে পড়ল ক্যানুর সামনে। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, নলখাগড়া ধরে টানছে। কিছুক্ষণ পরই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ওরা। সামনে খোলা পানি। পানির ওপারের কিনারায় বীস্ট।

ঝুঁকে হাত বাড়াল হেগেন, লিমাকে ধরে তার হাতে তুলে দিল ডয়েস। ক্লান্ত, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রেইল টপকে ডেকে দাঁড়াল রানা, সামান্য টলছে। 'হেগেন, তোমার সাব-মেশিনগান নিয়ে পাহারায় থাকো,' বলল। 'রেড ড্রাগন আমাদের খুঁজছে। আমি ঘুমাতে গেলাম, মাঝরাতে তুলে দিয়ো। ডয়েস, লিমার শুশ্রূষা দরকার।'

কেবিনের দিকে এগোচ্ছে রানা, ওর দিকে টকটকে লাল চোখে তাকিয়ে থাকল লিমা ও ডয়েস।

ঘুম ভাঙার পর কয়েক মিনিট অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল রানা। বাঙ্কের কিনারা থেকে পা নামাতে যাবে, অকস্মাৎ গুঙিয়ে উঠল—টান পড়া পেশী থেকে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। মাথাটা তিন মণ ভারী মনে হচ্ছে। বাঙ্কের কিনারায় দু'মিনিট বসে থাকার পর ধীরে ধীরে মনে পড়ল সব। টেবিল ধরে

সিধে হলো ও, মনে সতর্ক হবার তাগাদা। হেগেন ওর ঘুম ভাঙায়নি কেন? ঘড়িতে একটা বেজে দশ মিনিট।

ডেকে বেরিয়ে এল রানা। চাঁদ নেই, তবে প্রচুর তারা আছে, অবশ্য পুব দিকের প্রায় গোটা আকাশই মেঘে ঢাকা। রেইলের সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বোলাল রানা, কান পাতল। পানির ওপর হালকা কুয়াশা মোচড় খাচ্ছে। পোকারাই শুধু ডাকছে, অন্য কোন শব্দ নেই। না, আছে। খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে কেউ।

ধীরে ধীরে নিচু হলো রানা, হাঁটু গাড়ল ডেকে, দেখল হুইলহাউসের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমাচ্ছে হেগেন। পাশে পড়ে আছে খালি একটা বোতল।

রাগ চেপে গ্যালিতে চলে এল রানা। স্টোভ জ্বেলে কফির জন্যে পানি গরম করতে দিল, তারপর পোর্টহোলগুলো ঢেকে আলো জ্বালল। নিঃশব্দে কাজ করছে, কেবিন থেকে সবগুলো অস্ত্র এনে জড়ো করল এক জায়গায়। প্রথমে অতিরিক্ত সাব-মেশিনগানটা রিলোড করল। খুট করে একটা শব্দ হলো। দরজায় লিমা এসে দাঁড়িয়েছে। অস্ত্র রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এসো, বসো এখানে,' একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল রানা।

ওর হাত থেকে ধূমায়িত কফির মগ নিয়ে লিমা বলল, 'ডয়েস জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।'

দেরাজ খুলে ছোট একটা বাক্স বের করল রানা। লিমার হাতে একজোড়া ক্যাপসুল ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'কফির সঙ্গে এগুলো খাইয়ে দাও। জ্বর ছেড়ে যাবে, ব্যথাও থাকবে না।'

'ও প্রলাপ বকছে,' নিচু গলায় বলল লিমা। 'বলছে...না, থাক।'

'চলো, ওকে দেখে আসি,' বলে গ্যালি থেকে বেরিয়ে দ্বিতীয় কেবিনটায় ঢুকল রানা, ওর পিছু নিয়ে লিমাও।

চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে ডয়েস। ঠোঁট জোড়া নড়ছে দেখে তার দিকে ঝুঁকল রানা। 'খুব কষ্ট হচ্ছে, ডয়েস?' লক্ষ করল, ডয়েসের মাথায় ছেঁড়া শার্টটা নেই, তার বদলে ধবধবে সাদা ব্যান্ডেজ বাঁধা। মনে মনে লিমার প্রশংসা করল ও। তারপর শুনতে পেল ডয়েস বলছে, 'ইউ বাস্টার্ড! আমি প্রথম থেকেই জানতাম এই রোগটা তোমার আছে!'

সিধে হলো রানা, লিমাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছে ও?'

হাসি চেপে লিমা বলল, 'আমি কি জানি! একটু ধৈর্য ধরুন, নিজেই বুঝতে পারবেন।'

আবার নিচু হলো রানা। ডয়েস বলছে, '...তুমি শালা সবাইকে টেক্কা দিতে চাও!'

রেগে গেল রানা, সিধে হয়ে লিমাকে বলল, 'ওর স্বভাব বদলাবার নয়। শুধু শুধু গাল দিচ্ছে আমাকে।' কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে ও।

পিছন থেকে লিমা বলল, 'গাল দিচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু আপনি ওর সম্পর্কে ভুল একটা ধারণা নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।'

'মানে?' দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়াল রানা।

'ও বলছে, ও প্রথম থেকেই জানত সবার ভাল করার একটা কঠিন রোগ আছে…'

সবটুকু না শুনেই গ্যালিতে পালিয়ে এল রানা। রেখে যাওয়া গ্রেনেডগুলো গুনল ও, আটটা। এক অর্থে রেড ড্রাগন ওর ফাঁদে ঠিকই পা দিয়েছে। ম্যাকাও থেকে এই দুর্গম জলাভূমিতে তাকে টেনে এনেছে ওরা। সে এখন সহজে হাল না ছাড়লেই হয়। পাঁচ মিনিট পর আবার এল লিমা। 'ক্যাপসুল খাওয়াবার পর জ্বর কমছে, ঘুমাচ্ছে ডয়েস। হেগেন কোথায়?'

'মদ খেয়ে পড়ে আছে,' বলল রানা। অস্ত্রগুলো দেখিয়ে বলল, 'এগুলো আমি হুইলহাউসে নিয়ে যাচ্ছি। ফিরে এসে রান্না চড়াব, তুমি ডয়েসের কাছে থাকো।'

এগিয়ে এসে স্টোভের সামনে বসল লিমা। 'আমি রান্না চড়াচ্ছি। হেগেনকে আপনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। কড়া এক মগ কফি খেলে ওর নেশা ছুটে যাবে।

হুইলহাউসে অস্ত্রগুলো রেখে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। হেগেনের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েও কোন লাভ হচ্ছে না। প্রকাণ্ড মাংসল মুখে চড় কষাল রানা। ঘুম ভাঙতে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সে। রানা তাকে শক্ত করে ধরে গ্যালিতে টেনে আনল, প্রায় হিঁচড়ে। গরম মগটা তার হাতে ধরিয়ে দিল লিমা। 'এটা খান, ভাল লাগবে।'

'তোমাকে নিয়ে আসাই আমার ভুল হয়েছে,' বলল রানা। 'কেমন লোক তুমি যাকে পাঁচ মিনিটের জন্যেও বিশ্বাস করা যায় না?'

হাসি পেলেও, রানার ভয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখল লিমা। হেগেন মাথা নিচু করে আছে, বিড়বিড় করে বলল, 'এবারের মত মাফ করে দাও, ফ্রেন্ড।'

কথা না বলে হুইলহাউসে ফিরে এল রানা। চার্ট টেবিলের ওপর ছোট্ট আলোটা জ্বালল, মন দিয়ে ক্যালকুলেশন করছে। ঘড়িতে দুটো পনেরো মিনিট, ছ'টার মধ্যে পৌঁছুতে পারলে চ্যানেলের মুখে দেখা পাওয়া যাবে হার্ডি আর তার জাহাজের। সাগরের দিকেই যাবে রানা, এই যাওয়াটাই হবে রেড ড্রাগনের জন্যে ওর পাতা ফাঁদ। চার্টটা আরেকবার দেখে নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল ও, রেইলিং ধরে পানির দিকে তাকিয়ে আছে। কুয়াশা আরও গাঢ় হয়েছে। আকাশে কমে গেছে তারা, কালো মেঘটা উঠে আসছে মাথার ওপর।

গ্যালিতে ঢুকতেই ওর হাতে একটা প্লেট ধরিয়ে দিল লিমা, তাতে সেদ্ধ ডিম আর মটরশুটি। 'আপনাকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। কি ব্যাপার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কুয়াশা বাড়ছে। আমাদের জন্যে সুবিধে হবে।'

'সুবিধে হবে? কুয়াশায় পথ চিনবেন কিভাবে?' লিমা অবাক।

'গভীর চ্যানেল হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'চার্ট ধরে ঠিকই খুঁজে নিতে পারব।'

'সেটা খুব বিপজ্জনক হবে,' বলল হেগেন। 'ওরা কাস কং নদীর মুখে আমাদের জন্যে ওত পেতে থাকবে।'

সব কথা ওদেরকে বলতে রাজি নয় রানা। 'হ্যাঁ, বিপজ্জনক। কিন্তু আর কোন উপায়ও তো নেই।'

'এলাকায় খেমাররুজদের আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল লিমা। 'ম্যাকাও ট্রাইয়্যাডের রেড ড্রাগনকে আমরা যদি এখানেই কাবু করতে পারতাম, ঝামেলা অনেক কম হত না? আমি বলতে চাইছি, এত সোনা নিয়ে উল্টোদিকে যাবার কি দরকার?'

'দরকার আছে বলেই যাচ্ছি,' বলল রানা। 'তোমরা ভুলে যাচ্ছ কেন, শুধু সোনা উদ্ধার করতে আসিনি আমরা।'

এরপর লিমা বা হেগেন কিছু বলল না।

এই সময় নক হলো ছাদে। আতঙ্কে সাদা হয়ে গেল লিমা। নক হতেই থাকল, যেন এক হাজার আঙুল টোকা মারছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো হেগেন, ছুটে বেরিয়ে এল ডেকে। তার পিছু নিয়ে রানা ও লিমাও বেরিয়ে এল। রানার কাঁধে একটা হাত রেখে খিলখিল করে হেসে উঠল লিমা। 'বৃষ্টি!'

'হ্যাঁ, আমাদের সাহায্য করবে,' বলল রানা।

নয়

চার্টগুলো নিয়ে আরও আধ ঘণ্টা কাজ করল রানা, মেইন চ্যানেল হয়ে নদীতে পৌঁছানোর রুটটা ভাল করে বুঝে নিল। সিদ্ধান্ত নিল, তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রওনা হবে ওরা। ইতিমধ্যে হাতজোড় করে আরেকবার ক্ষমা চাইতে এসেছিল গরিলাটা। রানা তাকে এঞ্জিন রুমে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সেই যে শুরু হয়েছে, তুমুল বৃষ্টি চলছেই। সত্যি উপকার হবে, বেশি দূর পৌঁছাবে না এঞ্জিনের আওয়াজ।

গ্যালিতে এসে লিমাকে পেল রানা, জায়গাটা পরিষ্কার করছে। তার হাতে রেইনকোট আর শক্তিশালী একটা ইলেকট্রিক টর্চ ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। তার আগে চলো ডয়েসকে একবার দেখে আসি।'

ডয়েস অঘোরে ঘুমাচ্ছে।

ডেকে বেরিয়ে এসে লিমাকে টর্চ জ্বালতে বলল রানা। টর্চের আলোয় কুয়াশা ও বৃষ্টি দেখল ওরা, লেগুনের দূর প্রান্তের নলখাগড়ার পাঁচিলও স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'কি কাজ?' জিজ্ঞেস করল লিমা।

'এখানে, বোর কাছে থাকবে তুমি,' বলল রানা। 'বোট খুব ধীরে ধীরে এগোবে। আমি যখন বলব, সাইড চ্যানেলগুলো খুঁজবে তুমি। চ্যানেলগুলো খুবই সরু, তবে টর্চের আলোয় দেখতে পাবে। ঠিক আছে?'

'ব্যস, এইটুকু?'

'শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, পড়ে যেয়ো না,' সাবধান করল রানা।

তখন প্রায় চারটে বাজে, জ্যান্ত হয়ে উঠল এঞ্জিন। নলখাগড়ার পাঁচিল লক্ষ্য করে এগোচ্ছে ওরা। জঙ্গল পার হয়ে বড় লেগুনে চলে এল বোট। বাঁক ঘুরে সাগরের দিকে মুখ করল ওরা। কুয়াশা এদিকে আরও গাঢ়।

হুইলহাউসের জানালা খুলে দিল রানা, মুখে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। একটু পর সাগরের দিক থেকে বাতাস শুরু হলো। নলখাগড়ার বন কাত হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন আকৃতি পাচ্ছে কুয়াশা। বোটের গতি মন্থর, যেন অত্যন্ত সাবধানে অন্ধকারে নাক গলাচ্ছে। এঞ্জিনের আওয়াজ ভোঁতা। কিছুক্ষণ পর পর চার্টে চোখ বুলাচ্ছে রানা। সামনে এবার একটা সাইড চ্যানেল পড়ার কথা। জানালার দিকে ঝুঁকে গলা চড়িয়ে বলল, 'বাম দিকে নজর রাখো, লিমা।'

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। টর্চের আলোয় লিমার চোখে কিছু ধরা পড়ছে না। তারপর রানাকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লিমা, 'বাঁয়ে!'

দ্রুত হুইল ঘোরাল রানা, বোটের বো নলখাগড়ার পাঁচিলে ঘষা খেলো। একটু পরই বোট সিধে করে নিল ও। নতুন কোর্স ধরে আবার এগোচ্ছে বীস্ট।

বড় ধরনের কোন অঘটন ছাড়াই এভাবে আরও তিনবার বাঁক ঘুরল ওরা। একবার অবশ্য নলখাগড়ার ভেতর নাক গুঁজে দিল বোট, বাধ্য হয়ে এঞ্জিন রিভার্স করতে হলো হেগেনকে। সময় কিছুটা নষ্ট হলো, তবে তাতে কিছু আসে যায় না। ধীরে ধীরে ম্লান আলো ফুটল আকাশে। কুয়াশা আর বৃষ্টি চেনা যাচ্ছে। জানালার দিকে ঝুঁকে লিমাকে বলল রানা, 'আমি এখন দেখতে পাচ্ছি। তুমি ডয়েসের কাছে ফিরে যাও।'

বৃষ্টি আর কুয়াশা বাধা সৃষ্টি করায় বিশ গজের বেশি দেখা যাচ্ছে না। তবে নলখাগড়ার বন পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে, দ্রুত চওড়া হচ্ছে চ্যানেল। চ্যানেলের পানিতে এখন ঢেউ দেখা যাচ্ছে। বাতাসের গতিও বাড়ছে। রানার মনে কোন সন্দেহ নেই, মেইন চ্যানেলে পৌঁছেছে ওরা। ওদের এক মাইল সামনে খোলা সাগর।

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। খানিক দূর ভেসে এসে থেমে গেল বোট। জানালা বন্ধ করছে, এই সময় হাতে মগ নিয়ে ভেতরে ঢুকল লিমা। 'কেমন দেখলে ডয়েসকে?' মগটা নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'জ্বর কমে গেছে তো, ঘুমটা তাই খুব ভাল হচ্ছে।'

'ওর কিছু খাওয়া দরকার।'

'রোদ উঠুক, তারপর,' বলল লিমা। 'বোট থেমে আছে কেন?'

চার্টটা লিমাকে দেখাল রানা। 'নলখাগড়ার বন পিছনে ফেলে এসেছি আমরা, এটা মেইন চ্যানেল। চ্যানেলের মুখে সারি সারি স্যান্ডবাঙ্ক আছে। নদীতে বেরুবার শেষ পথটুকু অত্যন্ত সরু। হিথ যদি আমাদের সামনে চলে গিয়ে থাকে, ওখানে অপেক্ষা করছে সে।'

'তাহলে আমরা সাগরে বেরুব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'বেরুতেই তো চাইছেন আপনি, তাই না?'

'হ্যাঁ, যদি সম্ভব হয়,' বলল রানা। 'হিথের মোটর বোটের চেয়ে বীস্টের স্পীড বেশি। আমি চাই হিথ আমাদেরকে ধাওয়া করুক।'

'কিন্তু সে যদি এরই মধ্যে সামনে চলে গিয়ে থাকে…'

'সেক্ষেত্রে অন্য পথ ধরতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'সে কোথায় আছে জানার জন্যে বোট থামিয়েছি। কয়েক সেকেন্ড পর লিমার দিকে তাকাল ও। 'এখানে আমার কাছে না থেকে, তুমি বরং ডয়েসের কাছে যাও।'

ঠোঁট ফোলাল লিমা। 'আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন!' তারপরই হেসে ফেলল, ছুটে বেরিয়ে গেল হুইলহাউস থেকে।

ঘড়ির ওপর চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা। আরও মিনিট পনেরো কান পেতে থাকল। মোটর বোটের কোন সাড়া নেই। এঞ্জিন স্টার্ট দিল ও।

খক্ খক্ করে কেশে উঠে জ্যান্ত হলো এঞ্জিন, তারপরই থেমে গেল। নিস্তব্ধতা রীতিমত আতঙ্কিত করে তুলল ওকে। ছুটে বেরিয়ে এল ডেকে। দ্বিতীয় কেবিনটাকে পাশ কাটাচ্ছে, ভেতর থেকে গলা বের করে লিমা জানতে চাইল, 'কি হলো?'

'কি করে বলি!' হাত নেড়ে তাকে কেবিন থেকে বেরুতে নিষেধ করল রানা, তারপর মই বেয়ে নেমে এল এঞ্জিনরুমে।

এক কোণে হাঁটু গেড়েছে হেগেন। তার পাশে এসে ঝুঁকল রানা। বিড়বিড় করল হেগেন, 'ফুয়েল পাইপের একটা।'

রানাও দেখতে পেল। পাইপটা কয়েক ইঞ্চি ফেটে গেছে। 'টেপ দিয়ে বাঁধো,' নির্দেশ দিয়ে ডেকে উঠে এল ও।

মুখ থেকে বৃষ্টির পানি সরিয়ে লিমা জিজ্ঞেস করল, 'খারাপ কিছু?'

জবাব দেয়ার আগেই রানা লক্ষ করল, বোট নিজে থেকেই ঘুরে যাচ্ছে। শুধু ঘুরছে না, স্রোতের টানে কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা একটা বালির চর লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। ছুটে হুইলহাউসে ঢুকল রানা; হুইল ঘুরিয়ে বোট সিধে করল। একটু পরই মৃদু ঝাঁকি খেলো বোট, তারপর স্থির হয়ে গেল। কোন সন্দেহ নেই, বালিতে ঢুকে গেছে বো।

ডেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'চিন্তা কোরো না, এঞ্জিন স্টার্ট নিলে বেরিয়ে আসতে কোন সমস্যা হবে না। স্রোতের টানে ভেসে যাওয়ার চেয়ে এখানে আটকে থাকা তবু ভাল।'

ঘুরে এঞ্জিনরুম হ্যাচের দিকে এগোল রানা। মইয়ে একটা পা রেখেছে, পিছন থেকে লিমা বলল, 'স্টপ!' অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল ও।

লিমা বলল, 'মনে হলো কি যেন শুনলাম।'

রেইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, কান পেতে আছে। ধীরে ধীরে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো রানার কাছে। কুয়াশা আর বৃষ্টি ভেদ করে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আসছে আওয়াজটা। অস্পষ্ট, তবে চিনতে ভুল করল না। ওর দিকে ফিরে কিছু বলতে গেল লিমা, ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করল ও। এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ কাছে চলে আসছে। এক সময় মনে হলো ওদের একেবারে মাথার ওপর উঠে আসছে শব্দটা। তারপর কমতে শুরু করল, সম্ভবত অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে মোটর লঞ্চ। কুয়াশা ভেদ করে ছুটে এল কয়েকটা ঢেউ, হালকাভাবে ধাক্কা খেলো বীস্টের খোলে। আটকে রাখা দম ছেড়ে রানা বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে

গেছি! আরেকটু হলেই গায়ের ওপর উঠে আসত।' জবাবে লিমা কিছু বলার আগেই মোটর লঞ্চের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। আকস্মিক নিস্তব্ধতা স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে।

লিমা বলল, 'এর মানে কি? ওরা থামল কেন?'

ওখানে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর হুইলহাউসে ঢুকে চার্টগুলো আরেকবার পরীক্ষা করল। কিছুক্ষণ পর গা থেকে জ্যাকেট খুলল, বলল, 'ভেবেছিলাম আউটলেটের একবারে কাছে চলে এসেছি, কিন্তু না, তা আসলে আসিনি।'

পিছন থেকে লিমা জিজ্ঞেস করল, 'জ্যাকেট খুললেন কেন? কি করতে চান?' জুতো খুলে লিমাকে পাশ কাটিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। 'কি ব্যাপার, কথা বলছেন না কেন!'

ডেক বরফের মত ঠাণ্ডা। কাঁপুনি ধরে গেল রানার। 'একটু সাঁতরে আসি,' বলল ও। 'চিন্তা কোরো না। যা করছি বুঝেই করছি।' রেইল টপকে পানিতে নামল। ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। পায়ে বালির স্পর্শ পাচ্ছে। লিমার দিকে মুখ তুলে হাসল ও, তারপর ঘুরে গেল।

পানি কেটে স্যান্ডব্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছে রানা। ওটার পুরোটা দৈর্ঘ্য পার হয়ে এল। পিছন ফিরে তাকিয়ে আর বীস্টকে দেখতে পেল না, কুয়াশায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। এরপর দৌড়াতে শুরু করল। একটু পরই গরম হয়ে উঠল শরীর। দু'বার পানির গভীরতা বেড়ে যাওয়ায় সাঁতরাতে হলো। কখনও হেঁটে, কখনও সাঁতরে ছয় কি সাত মিনিট এগোল রানা, তারপর চীনাদের গলা শুনতে পেল। শুধু আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে, কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না। এবার আরও সাবধানে এগোল ও। আওয়াজ হলে এগোচ্ছে, না হলে নড়ছে না। কুয়াশার ভেতর এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটু বাঁ দিকে ঘুরে গেল ও। ওদিক থেকেই আসছে আওয়াজটা। আবার গভীর পানিতে নামতে হলো। সাঁতরে এগোচ্ছে।

ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে রানা। স্রোতও বেশ জোরাল, অসতর্ক হলে আরেক দিকে টেনে নিয়ে যাবে। বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাচ্ছে। ফেরার জন্যে ঘুরতে যাবে, সামনের কুয়াশায় ঝুলে থাকতে দেখল একটা আকৃতি। রেড ড্রাগনের মোটর লঞ্চ। কয়েক মুহূর্ত ভেসে থাকল রানা, খুঁটিয়ে দেখল, তারপর ঘুরে ফিরতি পথ ধরল।

স্রোতের টান উপেক্ষা করে সাঁতার কাটতে দম ফুরিয়ে আসছে রানার। একবার মনে হলো দিক নির্ণয়ে ভুল করে বসেছে। তবে একটু পরই অগভীর পানিতে চলে এল, ওর সামনে উঁচু হলো স্যান্ডবাঙ্ক। ছুটতে শুরু করল ও। কয়েক মিনিট পর ফেলে যাওয়া নিজের পায়ের ছাপ খুঁজে পেল। বিশ্রামের জন্যে থেমেছে, অকস্মাৎ সগর্জনে জ্যান্ত হলো মোটর লঞ্চ। এঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে সাগরের দিকে সরে গেল। আবার ছুটল রানা, পা দুটো পানি ছিটাচ্ছে, জোয়ার শুরু হওয়ায় ডুবে যাচ্ছে স্যান্ডবাঙ্ক।

বোটে ফিরে আসতে হিসেবের চেয়ে বেশি সময় লেগে গেল। কুয়াশা

আগের চেয়ে একটু গাঢ় হয়েছে। আশপাশেই কোথাও আছে বোট, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। একবার ভাবল চিৎকার করে। তবে ঝুঁকিটা নিল না। একটু পর হেগেন আর লিমার গলা পেল। সেদিকে দশ গজ এগোতেই কুয়াশার ভেতর দেখতে পেল বোট। ওরা দু'একজন মূর্তির মত স্থির হয়ে আছে ডেকে।

ওদেরকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে হুইলহাউসে ঢুকল রানা, চার্টের ভাঁজ খুলে ঝুঁকে পড়ল। হঠাৎ কাঁধ দুটো ঢাকা পড়ল একটা কম্বলে। ঘাড় ফিরিয়ে লিমাকে দেখে হাসল একটু। 'উফ, পানি যে কি ঠাণ্ডা!'

'ওদের বোটটা দেখতে পেলেন?'

'হ্যাঁ। তবে কেন থেমেছিল বুঝতে পারিনি।'

'কোথায় গেল?'

'এখন ও আমাদের জন্যে নদীর মুখে অপেক্ষা করবে।'

'আমাদের জন্যে দুঃসংবাদ,' হুইলহাউসের দরজা থেকে বলল হেগেন।

ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডাকল রানা। তারপর চার্টে একটা আঙুল রেখে বলল, 'এখানে একটা চ্যানেল আছে। কোথাও কোথাও পানি খুব কম, তবে জোয়ার শুরু হওয়ায় অসুবিধে হবে না। আরও একবার পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে আমাকে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'আপনার তো নিউমোনিয়া হয়ে যাবে!'

'পানিতে নেমে গভীরতা মাপতে হবে,' বলল রানা। 'এই চার্টের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না। তাছাড়া, বালির চর প্রায়ই জায়গা বদল করে।'

'নতুন এই চ্যানেল ধরে গেলে আমরা কি কর্নেলকে পুরোপুরি এড়াতে পারব?' জানতে চাইল হেগেন।

'সাগরের যেখানে আমরা বেরুব, মেইন চ্যানেল সেখান থেকে বেশি দূরে নয়,' বলল রানা। ঘুরিয়ে উত্তর দিচ্ছে, ওদেরকে জানাতে চাইছে না যে ম্যাট হিথকে এড়াবার কোন ইচ্ছেই ওর নেই।

হেগেন বলল, 'পাইপটা জোড়া লাগিয়েছি। কিন্তু কতক্ষণ টিকবে বলা কঠিন। যেখানেই যেতে চাই, তাড়াতাড়ি রওনা হওয়াই ভাল।'

'হুইল ধরো, হেগেন,' তার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল রানা। 'আমি পানিতে থাকছি, তুমি আমাকে অনুসরণ করবে। যাই ঘটুক, স্পীড যতটা সম্ভব কমিয়ে রাখবে, আর আমার ওপর থেকে চোখ সরাবে না। স্যান্ডবাঙ্কের এই গোলকধাঁধায় আমরা যদি আটকা পড়ি, কুয়াশা সরে গেলে হিথের জন্যে সহজ টার্গেট হয়ে যাব।'

লিমাকে নিয়ে গ্যালি হয়ে দ্বিতীয় কেবিনে ঢুকল রানা। ডয়েসের ঘুম ভেঙেছে দেখে তাড়াতাড়ি কফি করতে চলে গেল লিমা। ফিরে এল একটা ট্রে নিয়ে। ডিম আর মটরশুঁটি খেলো ডয়েস। কফির সঙ্গে তাকে আরও দুটো ট্যাবলেট খেতে দিল রানা।

'আমরা কি সাগরের দিকে যাচ্ছি?' সরাসরি রানাকে প্রশ্ন করল ডয়েস।

'হ্যাঁ।'

মুচকি একটু হাসল ডয়েস, ঠোঁটের কোণে আবার সেই পুরানো শ্লেষাত্মক

ভঙ্গিটা ফিরে এল। 'আমি জানতাম, তোমার উদ্দেশ্য ভাল নয়। জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ে আছি, সুযোগটা ভালই কাজে লাগাচ্ছ। লিমাকে নিশ্চয়ই নয়-ছয় কিছু একটা বুঝিয়ে বোকা বানিয়ে রেখেছ, তাই না?'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে অসহায় ভঙ্গি করল রানা। লিমা তাড়াতাড়ি রানাকে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। ও ঠাট্টা করছে।' ডয়েসের দিকে ফিরল সে, কৃত্রিম চোখ রাঙিয়ে বলল, 'এই বাজে স্বভাবটা তুমি কি ছাড়তে পারবে না? মিছিমিছি মানুষকে খোঁচা মারো কেন?'

'মিছিমিছি?' ডয়েস কপালে তুলল চোখ। 'তুমি দেখো, লিমা, তোমার সব সোনা নিয়ে কেটে পড়বে রানা।'

লিমা হেসে ফেলল।

'তুমি হাসছ?' ডয়েসকে আহত মনে হলো।

'তাহলে বলি জ্বরের মধ্যে কি বলছিলে?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'বলছিলে মাসুদ রানা মহৎপ্রাণ, শুরু থেকেই জানি, সবার ভাল করার একটা কঠিন রোগ আছে ওর...'

'এ-সব কথা আমি বলেছি? অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল ডয়েস। 'আর যদি বলেও থাকি, নিশ্চয়ই বেহুঁশ অবস্থায় প্রলাপ বকেছি। আমার সন্দেহ যে মিথ্যে, রানাকে তুমি প্রমাণ করতে বলো। আমার প্রশ্নের জবাব দিক। কি কারণে সাগরের দিকে যাচ্ছে ও?'

রানা জবাব দিল, 'হিথকে মারার সুযোগ করে দেব তোমাকে, তাই সাগরের দিকে যাচ্ছি।'

শরীর দুর্বল, তা সত্ত্বেও হেসে উঠল ডয়েস। 'বাহ্, ভালই গল্প ফেঁদেছ দেখা যাচ্ছে! কিন্তু এ গল্প লিমাকে বিশ্বাস করাতে পারলেও, আমাকে বিশ্বাস করাতে পারবে না। লিমা, আমার হাত খালি, যে-কোন একটা অস্ত্র এনে দাও। সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওর পিছু নিয়ে লিমাও, ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলছে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, প্লীজ! ও এইরকমই! বিশ্বাস করুন, আসলে সত্যি ঠাট্টা করছিল...'

'ওকে একটা রিভলভার এনে দাও,' বলল রানা। 'হুইলহাউসে পাবে।' কাঁধ থেকে কম্বলটা ফেলে রেইল টপকে পানিতে নেমে গেল ও।

যে স্যান্ডবাঙ্কের ওপর হেঁটেছিল, চ্যানেলটা সেখান থেকে একশো গজ পিছনে। খুঁজে বের করার পর বোটের কাছে আবার ফিরে এল রানা। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে বালি থেকে বীস্টকে বের করে আনল হেগেন, ধনুকের মত বাঁক নিয়ে রানার সঙ্গে সমান্তরাল একটা কোর্স ধরল। পানির নিচে তলিয়ে আছে স্যান্ডবাঙ্ক, সারফেসের নিচে বুক পর্যন্ত না ডোবা পর্যন্ত সাবধানে হাঁটল ও। হাত তুলে নাড়ল, দিক নির্দেশনা পেয়ে ধীরে ধীরে চ্যানেলে ঢুকল বোট।

বোটের সামনে সাঁতরাচ্ছে রানা, কয়েক গজ এগিয়েই পরীক্ষা করছে পায়ের নিচে তল পায় কিনা। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে চ্যানেল, ওর পিছু নিয়ে সাবধানে আসছে বোট। বিশ মিনিট পর ঠাণ্ডায় সারা শরীর অবশ হয়ে এল।

এক সময় মনে হলো, ওর মাথা আর চোখও কাজ করছে না। প্রবল ইচ্ছাশক্তি এগিয়ে নিচ্ছে ওকে, জানে এখানে আটকে পড়ার অর্থ বেঘোরে প্রাণ হারানো অকস্মাৎ বাঁক ঘুরতে গিয়ে একবার একটা স্যান্ডবাঙ্কে উঠে পড়ল বোট। তবে হেগেন নিজের চেষ্টাতেই আবার ভাসতে পারল। এটাই ওদের জন্যে শেষ ঝামেলা ছিল। চ্যানেলের বাকি অংশ যথেষ্ট গভীর। বোটে উঠে পড়ল রানা।

'ফুল স্পীড অ্যাহেড!' নির্দেশ দিল ও, ওর কাঁধে কম্বলটা আবার জড়িয়ে দিচ্ছে লিমা। 'শব্দ হয় হোক, গ্রাহ্য করার দরকার নেই।'

'ইয়েস, বস্—থুড়ি, ফ্রেন্ড!' বলে স্যালুট করল হেগেন।

কেবিনে ফিরে কাপড় পাল্টাল রানা, গায়ে সোয়েটার চড়াল। 'নিন, ধরুন,' ভেতরে ঢুকে ওর হাতে কফির মগ ধরিয়ে দিল লিমা। 'কিভাবে যে এখনও বেঁচে আছেন, সেটাই আশ্চর্য!'

গোটা বোট থরথর করে কেঁপে উঠল। ফুল পাওয়ারে ছুটছে। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসির রেখা।

এঞ্জিন রুমে নেমে এসে হেগেনকে এক কোণে হাঁটু গেড়ে থাকতে দেখল রানা। বাতাসে তেল পোড়ার গন্ধ। হেগেনের প্রকাণ্ড মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ভয়ে। 'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

তেল চিটচিটে ন্যাকড়া দিয়ে কপালের ঘাম মুছল হেগেন। 'ফাটলটা আরও লম্বা হয়েছে,' ম্লান গলায় বলল সে। 'এঞ্জিনের ভাইব্রেশনের কারণে। আমি জানতাম এরকম ঘটবে।'

ন্যাকড়া দিয়ে পাইপটা পরিষ্কার করল রানা, উদ্দেশ্য ফাটলটা পরীক্ষা করা। ডেকের ওপর বসে পড়ল ও। 'এ তো দেখছি সিরিয়াস অবস্থা!'

হেগেনকে দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে। 'তুমিই বলে দাও কি করব এখন।'

হ্যাচের ভেতর মাথা গলিয়ে লিমা বলল, 'ডয়েস জিজ্ঞেস করছে, ত্রুটিটা কি তাড়াতাড়ি মেরামত করা সম্ভব?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'এখুনি বলা যাচ্ছে না। আশপাশে কিছু ঘটছে?'

মাথা নাড়ল লিমা। 'নাহ্। মোটর লঞ্চের শব্দও শুনছি না।'

দ্রুত একটা সিদ্ধান্তে এল রানা। 'পাইপ খুলে ঝালাই করতে কতক্ষণ লাগবে?'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল হেগেন। 'খুলতেই তো বেরিয়ে যাবে দশ মিনিট। ঝালাই করি বা জোড়া লাগাই, আরও বিশ মিনিট। দশ মিনিট লাগবে ফিট করতে।'

'চল্লিশ মিনিট। ঠিক আছে, তাই করো।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল হেগেন, থামিয়ে দিল রানা। 'সময় নষ্ট কোরো না, হেগেন। হাত চালাও।'

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল ও। লিমা বলল, 'শুনুন! মনে হলো কি যেন শুনলাম!'

ঢেউয়ের মাথায় চড়ল বোট, বো থেকে পানির কলকল আওয়াজ আসছে। রেইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল রানা কান খাড়া। আওয়াজটা অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে, এখনও অস্পষ্ট। সন্দেহ নেই, এঞ্জিনেরই শব্দ।

হুইলহাউসের দিকে এগোল রানা! 'হেগেনকে যতটা সম্ভব কম শব্দ করতে বলো।' হুইলহাউসে ঢুকে সাব-মেশিনগানটা বের করল। আবার ডেকে ফিরে এসে রেইলের সামনে দাঁড়াল। এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ কাছে সরে আসছে।

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল লিমা। 'ম্যাট হিথ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'সম্ভবত। নিশ্চয়ই আমাদের আওয়াজ পেয়েছে।'

'না পাবার তো কোন কারণ নেই,' বলল লিমা। 'কি করবে সে?'

চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'ও জানে দুটোর একটা ঘটেছে–হয় আমরা অচল হয়ে পড়েছি, নয়তো কারও জন্যে অপেক্ষা করছি। তবে আমরা কোথায় আছি সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই তার। কুয়াশার ভেতর বারবার আসা-যাওয়া করতে হবে, তা না হলে আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

ঘাড় ফিরিয়ে কুয়াশায় ঢাকা সাগর দেখার চেষ্টা করল লিমা। মোটর লঞ্চের আওয়াজ বাড়ছে তো বাড়ছেই। উত্তেজিত রানা ভাবল, হিথকে রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া যাবে। এঞ্জিনের আওয়াজ পাল্টে গেল। স্পীড বেড়েছে। কুয়াশা ভেদ করে সোজা ছুটে আসছে ওটা। রেইলের সামনে নিচু হলো রানা, লিমার হাত ধরে টান দিল।

লঞ্চটা সোজা ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে দিক বদলে বীস্টের পিছন দিকটাকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল। মাথা সামান্য উঁচু করে লক্ষ্যস্থির করল রানা, দ্রুত এক পশলা গুলি করে শুয়ে পড়ল ডেকে। লঞ্চের পিছন দিকে একটা মেশিনগান ফিট করা হয়েছে, অপারেট করছে দু'জন লোক। রানা ও লিমার মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে গেল। মাথা তুলে আরেক পশলা গুলি করল রানা। ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো, যেন বিষম খেয়েছে কেউ। কুয়াশার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে লঞ্চ, পিছনের পানিতে আলোড়ন দেখা গেল। মেশিনগান অপারেটরদের একজন গুলি খেয়ে পড়ে গেছে সাগরে। রানার ঠোঁটে হাসি।

লঞ্চের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। 'নিচে যাও!' লিমাকে বলল রানা। 'এরপর ওরা আরও কাছে চলে আসবে।' ছুটে হুইলহাউসে ঢুকল ও, গ্রেনেডের বাক্সটা বের করে আনল।

চওড়া একটা বৃত্ত তৈরি করে চক্কর দিচ্ছে লঞ্চ। অধৈর্য রানা অপেক্ষা করছে, সচেতন ওর পাশে হাতে কারবাইন নিয়ে উবু হয়ে বসে আছে লিমা। তাকে কেবিনে ঢোকাতে হলে তর্ক করতে হবে, সুযোগটা পাওয়া গেল না–কুয়াশার ভেতর থেকে ছুটে এল লঞ্চ, আবার সরাসরি ওদের দিকেই আসছে। মেশিন গানের পিছনে এখন অন্য দু'জন লোক দেখা গেল। এবারও রানাই প্রথমে গুলি করল, টার্গেট হুইলহাউস, অন্ধ প্রত্যাশা, ওখানে রেড ড্রাগন আছে। এক পশলা গুলি করেই ডাইভ দিয়ে ডেকে শুয়ে পড়ল ও। মেশিনগান গর্জে উঠল, বীস্টের রেইল ছিন্নভিন্ন করে দিল এক ঝাঁক বুলেট। এবারও শেষ

মুহূর্তে দিক বদলে ফিরে যাচ্ছে লঞ্চ, তবে বোর সামনে দিয়ে। এই সুযোগের অপেক্ষাতেই যেন ছিল রানা। ডেকে হাঁটু গেড়ে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল ও, লঞ্চের রেইল টপকে হুইলহাউসের কাছাকাছি পড়ল। লঞ্চ কাত হতে শুরু করায় গড়িয়ে রেইলের কাছে ফিরে এল সেটা, তবে রেইল গলে পানিতে পড়ার আগেই বিস্ফোরিত হলো। লঞ্চের পিছন থেকে বিশাল এক ঢেউ উঠল, সেটা মাথা নত করার পর দেখা গেল মেশিনগান ও অপারেটররা গায়েব হয়ে গেছে। কুয়াশার ভেতর হারিয়ে গেল লঞ্চ। আবার জমাট নিস্তব্ধতা নেমে এল মোহনায়।

মুখ থেকে রক্ত মুছল লিমা, বলল, 'সম্ভবত স্প্লিন্টার লেগেছে।'

ঝট করে ঘুলল রানা। 'কই, দেখতে দাও আমাকে।' ঠোঁটের কোণ থেকে এক ইঞ্চি দূরে ক্ষতটা। 'হুইলহাউসে এসো, প্লাস্টার লাগিয়ে দিই।'

এঞ্জিন রূমের হ্যাচ আর কেবিনের দরজা থেকে একযোগে মাথা বের করল ডয়েস ও হেগেন। হেগেনই প্রথম কথা বলল, 'আমরা অক্ষত আছি তো, ফ্রেন্ড?'

'নিজের কাজ করো, যাও,' ধমক দিল রানা। হ্যাচের ভেতর নেমে গেল প্রকাণ্ড মাথাটা। 'এই যে, তুমি,' ডয়েসকে বলল রানা, 'কে তোমাকে বাঙ্ক থেকে নামতে বলেছে?'

'কি হয়েছে ওর?' ডয়েসের চোখে উদ্বেগ।

'তেমন কিছু না, স্প্লিন্টার লেগেছে।' ডয়েসের দিকে ভাল করে তাকাল রানা। 'প্লাস্টার লাগাতে হবে, পারবে?'

টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে এল ডয়েস। তিনজনই হুইলহাউসে ঢুকল ওরা। সদ্য ভাঙা একটা দেরাজ থেকে সার্জিকাল টেপ-এর বাক্সটা বের করে ডয়েসের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। একটা স্ট্রিপ কেটে লিমার ক্ষতটায় লাগিয়ে দিল ডয়েস। তার হাত কাঁপছে দেখে শঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল লিমা।

'তোমরা দু'জনেই কেবিনে থাকো,' বলল রানা। 'আমি একাই সামলাতে পারব।'

মাথা নাড়ল ডয়েস। 'তা হয় না।' কোমরে গোঁজা রিভলভারটা বের করল সে। 'লিমা, কারবাইনটা আমাকে দাও, তুমি এটা রাখো।'

ডয়েসের কপালে একটা হাত রাখল লিমা। 'তুমি প্রলাপ বকছ। আবার তো জ্বর এসে গেছে।'

ওদেরকে হুইলহাউসে রেখে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। দু'মিনিট পর ডয়েস আর লিমাও বেরুল। 'আবার ওরা হামলা করবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'তা করবে, তবে এবার সরাসরি আসবে বলে মনে হয় না,' জবাব দিল রানা। 'প্রথম কারণ, গ্রেনেডটা নিশ্চয়ই ভয় পাইয়ে দিয়েছে। আরও বড় কারণ, বীস্টকে ডুবিয়ে দেয়ার ঝুঁকি সে নেবে না। বীস্ট নেই তো সোনাও নেই।'

'এতক্ষণে বোঝা গেল, সাগরে কেন আপনি বেরুলেন!' হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল লিমার মুখটা। 'আপনি রেড ড্রাগনের জন্যে একটা ফাঁদ তৈরি করেছেন!' ডয়েসের দিকে তাকাল সে। 'কি বলছি, বুঝতে পারছ? রেড ড্রাগনকে উনি উভয়

সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন।'

'ওর মাথায় আরও কত কুমতলব আছে, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না,' বলে লিমার হাত ধরে টান দিল ডয়েস। 'চলো, আমরা কেবিনে যাই।'

'হ্যাঁ, তাই যাও, দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে,' বলল রানা, শেষাংশ নিচু গলায়। 'হিথের পরবর্তী মুভ কি হয় দেখি। আশা করছি তার আগেই পাইপটা মেরামত করতে পারবে হেগেন।'

কেবিনে ঢুকল ডয়েস, লিমা তার হাত ধরে আছে।

দৃষ্টিসীমা এখনও ত্রিশ গজের মত। বৃষ্টি একটু ধরে এসেছিল, আবার বাড়ল। চমকে দেয়ার জন্যে পরিবেশটা আদর্শই বলতে হবে। নিজের নাম শুনে রীতিমত ঝাঁকি খেলো রানা। চিৎকারটা কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। 'মেজর রানা! তুমি বোকা নাকি? এখনও হার মানছ না কেন? পালাতে যে পারবে না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

ডয়েস নয়, একা লিমা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। রানা বলল, 'হিথ লাউড হেইলার ব্যবহার করছে।' নিঃশব্দে হাসছে ও। 'সম্ভবত কোন ফন্দি আঁটছে।' একহাত দিয়ে মুখের সামনে চোঙ বানাল ও। 'তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছ, হিথ!'

কয়েকটা মুহূর্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। রানার সন্দেহ হলো, ওর জবাব হয়তো শুনতে পায়নি হিথ। তারপর হঠাৎ তার গলা ভেসে এল। 'বোকামি করে নিজে মরতে চাও, মরো। কিন্তু তোমার বোকামির জন্যে অল্প বয়েসী মেয়েটা কেন ভুগবে?'

লিমাকে রানা বলল, 'খারাপ কিছু একটা ঘটছে। কি কারণে জানি না সময় পাবার চেষ্টা করছে হিথ।'

একটু পর আবার শুনতে পেল ওরা, 'মাথা খাটাও, রানা!' গলার সুরে অসহিষ্ণুতা। 'এসো, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করি। তোমাদেরকে আমার দরকার নেই। আমার শুধু সোনা দরকার। তোমরা যদি জান নিয়ে পালাতে চাও, আমি আপত্তিও করব না, বাধাও দেব না।'

বীস্টের খোলে হালকাভাবে কিছু একটা বাড়ি খেলো। বন করে আধ পাক ঘুরেই চেঁচিয়ে উঠল লিমা। 'আপনার পিছনে!'

পায়ের ওপর ভর দিয়ে ঘুরল রানা, গুলি করল নিতম্ব থেকে। লোকটা ডেকে উঠে এসেছিল, তপ্ত এক ঝাঁক সীসা শূন্যে তুলে নিল তাকে, রেইলের ওপর দিয়ে ফেরত পাঠাল পানিতে। হাতের অস্ত্র হঠাৎ নীরব হয়ে গেল, দাঁতে দাঁত চেপে সেটা ফেলে দিল রানা, ছুটল দ্বিতীয় চীনার দিকে—রেইল টপকে ডেকে নামতে গিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। ডিগবাজি পুরো করে ডেকে পড়ল লোকটা, ঝুঁকে দু'হাতে ধরে তুলল রানা, রেইলের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল সাগরে। পানিতে দোল খাচ্ছে ছোট একটা ডিঙ্গি, এক প্রস্থ রশি দিয়ে সেটাকে রেইলের সঙ্গে বাঁধল।

সিধে হচ্ছে, কুয়াশার ভেতর আবার গর্জে উঠল লঞ্চের এঞ্জিন। ছুটে এসে লিমার হাত ধরে টানল রানা, দু'জন একসঙ্গে ডেকে পড়ল। বীস্টের বোর

সামনে দিয়ে আড়াআড়িভাবে চলে যাচ্ছে লঞ্চ, আড়াল থেকে স্মল আর্মস দিয়ে গুলি করছে চীনারা। লঞ্চের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যেতে লিমাকে নিয়ে সিধে হলো ও। 'কোথাও লাগেনি তো?'

'না। কিন্তু আমার সাংঘাতিক ভয় করছে!'

সাব-মেশিনগান রিলোড করার জন্যে হুইলহাউসে ঢুকল রানা। ভেতরের সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়ল। দেয়ালে বুলেটের গর্ত। হুইলটা ফেটে গেছে। ইনস্ট্রুমেন্টাল প্যানেল বিধ্বস্ত। এত ভয় পেয়েছে, নড়তে পারছে না। দোরগোড়া থেকে লিমার গলা শুনে সংবিৎ ফিরল। 'সব ঠিক আছে তো?'

কন্ট্রোল পরীক্ষা করল রানা। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'স্টিয়ার মেকানিজম এখনও কাজ করছে। আর কিছুর দরকার নেই।'

রিলোড করে ডেকে বেরিয়ে এল ও। লিমা বলল, 'এভাবে কতক্ষণ?'

কিছু বলতে যাবে রানা, লাউড হেইলার আবার জ্যান্ত হয়ে উঠল। 'এখনও কি তুমি গোয়াতুর্মি করবে, রানা?' রানা জবাব দিচ্ছে না। 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, অচল হয়ে পড়েছ তোমরা। তবে আমি উদারতার পরিচয় দিতে চাই। চিন্তা করার জন্যে পনেরো মিনিট সময় পাচ্ছ, রানা। মাত্র পনেরো মিনিট সময়, মাই ফ্রেন্ড। তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও।'

সাগরে শুধু তুমুল বৃষ্টিপাতের শব্দ।

হ্যাচের কাছে এসে গলা চড়াল রানা, 'আর কতক্ষণ?'

সিধে হলো হেগেন, হাতে একটা ফ্লেয়ারিং টর্চ। খালি হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'এখনও ঝালাই করছি,' বলল সে। 'প্রায় শেষ করে এনেছি। পনেরো কি বিশ মিনিট।'

ধীরে ধীরে রেইলের দিকে ঘুরল রানা। মাথার ভেতর দ্রুত চিন্তা চলছে। 'এখন একটাই উপায়,' আপন মনে বিড়বিড় করল। লিমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'হেগেনের কাছ থেকে স্পেয়ার ওয়ায়্যার কেবলের কয়েলটা চাও।'

লিমা কিছু বলার আগেই ছুটে কেবিনে ঢুকল রানা, ফিরে এল একটা বাক্স নিয়ে, ভেতরে ডাইভিং গিয়ার আছে। বাক্সটা খুলছে, কেবল নিয়ে এঞ্জিন রূম থেকে বেরিয়ে এল লিমা। 'এটা?' মাথা ঝাঁকিয়ে সোয়েটারটা খুলে ফেলল রানা। 'কি করছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'আপনি কি সত্যি মরতে চান?'

হাতে অ্যাকুয়া-লাঙের স্ট্র্যাপ গলাল রানা। 'আর কোন উপায় নেই, লিমা।'

রানার মনে হলো, তর্ক করবে লিমা। দেখল, ঢিল পড়ল পেশীতে। 'ঠিক আছে। আপনার যা ভাল বোঝেন তাই করুন।' স্ট্র্যাপগুলো বাঁধতে শুরু করল লিমা।

তৈরি হবার পর রানা বলল, 'কি করতে হবে বলে দিচ্ছি। সময় নেই, রিপিট করতে পারব না। কেবলের একটা প্রান্ত কব্জিতে বাঁধব, আমি রওনা হলে ধীরে ধীরে ছাড়বে। আমার সঙ্গে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ আছে, রেড ড্রাগনকে চিরকালের জন্যে ঘুম পাড়াতে যাচ্ছি।'

'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,' বিড়বিড় করল লিমা।

কেবলে ডিটোনেটর আটকে কব্জিতে জড়াল রানা, এক্সপ্লোসিভ সহ বেল্টটা কোমরে পরল। পানিতে নেমে লিমার দিকে তাকাল একবার। শিউরে উঠল লিমা, জোর করে হাসল একটু। ভাল্‌ভ্ অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে পানির নিচে তলিয়ে গেল রানা।

লঞ্চটা কোনদিকে সঠিক জানা নেই, শুধু জানে বেশি দূরে নয়। সম্ভবত দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে। পানির তলায় ঘন ঘন রাবার ফ্লিপার আছড়ে দ্রুত সাঁতার কাটছে রানা। দু'মিনিট পর পানির ওপর মাথা তুলল। কিন্তু কুয়াশার ভেতর লঞ্চটা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্যটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল। খুব কাছ থেকে ভেসে এল ম্যাট হিথের গলা। 'আর মাত্র আট মিনিট, রানা। মাত্র আট মিনিট।'

আবার ডুব দিল রানা, দিক বদলে সাঁতরাচ্ছে। একটু পরই লঞ্চের খোল দেখতে পেল, নাক বরাবর সামনে ঝুলে আছে। ওটার পাশ ঘেঁষে স্টার্ন-এর দিকে চলে এল ও। অ্যাঢেসিভ প্লাস্টিক ফিট করল খোলের গায়ে, প্রপেলারের ঠিক নিচে। রাডার-এর চারধারে কেবল জড়াল, তারপর এক্সপ্লোসিভের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ডিটোনেটর। কাজটা শেষ করতে দুই কি আড়াই মিনিট লাগল। কেবল অনুসরণ করে বীস্টে ফিরছে।

বীস্টের গায়ে ধাক্কা খেলো রানা, কেবল নাগালের বাইরে উঠে গেছে। রেইলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওকে ধরার চেষ্টা করল লিমা, রানা বলল, 'না! আগে ডিটোনেট করো!'

রেইল টপকে ডেকে নামছে রানা, দ্রুত হাতে কেবল কেটে শেষ প্রান্তগুলো ডিটোনেটিং বক্সে ঢোকাচ্ছে লিমা। এই সময় আবার হিথের গলা ভেসে এল। 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা। আমার ধৈর্যে আর কুলাল না।'

অকস্মাৎ জ্যান্ত হলো লঞ্চের এঞ্জিন। সেই মুহূর্তে প্লাঞ্জারে চাপ দিল লিমা। বৃষ্টির ভেতর প্রতিধ্বনি তুলল বিস্ফোরণের আওয়াজ, চীনাদের আর্তচিৎকার বেশিরভাগই চাপা পড়ে গেল। দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত ধরে জঞ্জাল বৃষ্টি হলো। তারপর আর কোন নড়াচড়া বা শব্দ নেই। হ্যাচ গলে ডেকে বেরিয়ে এল হেগেন। চোখ কপালে তুলে বলল, 'মাই গড, ফ্রেন্ড! নিশ্চয়ই তুমি লঞ্চটাকে ডুবিয়ে দিয়েছ!'

অ্যাকুয়া-লাঙের স্ট্র্যাপগুলো খুলল রানা। 'অন্তত স্টার্ন বলে কিছু না থাকারই কথা,' বলল ও। ফ্লিপার খুলে হেগেনের দিকে তাকাল। 'নিচের খবর বলো।'

নিঃশব্দে প্রসারিত হলো হেগেনের কালো, মোটা ঠোঁট। 'আমার কাজ শেষ।'

ক্লান্ত রানা। মাথাটা তুলোর মত হালকা লাগছে। নিচে নেমে সোয়েটার পরল। হঠাৎ লিমার গলা শোনা গেল। 'তাড়াতাড়ি আসুন!'

ডেকে উঠে এসেছে রানা, শুনতে পেল অস্পষ্ট ভাবে কেউ একজন ওর নাম উচ্চারণ করছে। রেইলের সামনে এসে দাঁড়াতে দেখতে পেল ম্যাট হিথকে, কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসছে। সবাই ওরা রেইল ধরে দাঁড়িয়ে থাকল, হিথকে

দেখছে। ভাসতে ভাসতে কাছে চলে এল সে, ধাক্কা খেলো বীস্টের খোলে। ভেজা মুখ হলদেটে দেখাচ্ছে। ঠাণ্ডায় যেন অর্ধেক জমে গেছে সে। রানার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসল। 'কোথায় ভুল করেছি জানো? শত্রুকে আমি ছোট করে দেখেছি।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বড় করে দেখলেও এই একই পরিণতি হত তোমার, রেড ড্রাগন। দুনিয়া জুড়ে অশুভশক্তি, তোমরা পাল্লায় ভারী; কিন্তু তারপরও চিরন্তন সত্য মিথ্যে হয়ে যায়নি—শেষ পর্যন্ত শুভশক্তিই জিতবে।'

মুখ খুলে খানিকটা পানি খেলো কর্নেল হিথ। কথা বলতে দম বেরিয়ে যাচ্ছে তার। 'রানা, প্লীজ, তুমি এভাবে আমাকে ডুবিয়ে দিতে পারো না!'

'তুমিও তোমার অবৈধ ব্যবসার গোপন তথ্যগুলো না বলে মরতে পারো না।'

'কি জানতে চাও বলো, প্লীজ…'

'তোমার অবর্তমানে ড্রাগ ব্যবসাটা কে সামলাবে? আমদানী করা হেরোইন কোথায় জমা করা হয়? বাংলাদেশের কারা তোমাকে অ্যাডভান্স করেছে?'

'সব বলব, আগে তুমি আমাকে বোটে তুলে নাও, প্লীজ…'

মাথা নাড়ছে রানা, ওর বাহু স্পর্শ করল লিমা। 'লোকটা মারা যাচ্ছে, তাই না? জেরা যদি করতেই হয়, আগে ওকে বোটে তুলে নিন!' তার চোখে মিনতি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ঝুঁকল রানা, হিথের বাড়ানো হাতটা ধরে টেনে নিল বোটে।

ডেকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল কর্নেল, খকখক করে কাশছে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। 'ধন্যবাদ,' কোন রকমে বলতে পারল। 'এই উপকারের জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে না।'

তিক্ত হেসে ঘুরে দাঁড়াল রানা। হুইলহাউসের দিকে যাচ্ছে।

ওর পিছনে আকস্মিক নড়াচড়ার শব্দ হলো, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে লিমা চেঁচিয়ে উঠল, 'সাবধান!' চিৎকার দিয়েই রানার গায়ে ধাক্কা দিয়েছে সে, ও যাতে ডেকের ওপর ছিটকে পড়ে।

পড়েই সিধে হলো রানা, ঝট্ করে ঘুরে গেছে। লিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর আর হিথের মাঝখানে। টলছে। হেলে পড়ছে পিছন দিকে। লাফ দিয়ে এগোল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে ঠেকাল পতনটা। তার বুকে রক্ত দেখল ও। হিথ দাঁড়িয়ে আছে, ডান হাতে ছুরি, পিছিয়ে গেল দু'পা। শান্ত গলায় বলল, 'আমার কপালটাই খারাপ, রানা। এত চেষ্টা করেও তোমার নাগাল পেলাম না!'

রানার বুকে নেতিয়ে পড়েছে লিমা। ও নড়ার আগেই কেবিনের দরজায় দেখা গেল ডয়েসকে। জ্বরে ঠক ঠক করে কাঁপছে সে, লক্ষ্যস্থির করার জন্যে হাতের রিভলভারটা তুলল। 'এদিকে তাকা, শুয়োরের বাচ্চা!' হিসহিস করে বলল সে। হিথ তাকাতেই ট্রিগার টেনে নিল। একটা বুলেট হিথের হাঁ করা মুখে ঢুকল, দ্বিতীয়টা কপালে। দড়াম করে রেইলিঙে বাড়ি খেলো সে।

হ্যাচ গলে ডেকে উঠে এল হেগেন। 'দেখো দেখি কাণ্ড, বেজন্মা কুত্তাটা আমার বোট নোংরা করে ফেলছে!' ঝুঁকল সে, লাশটা দু'হাতে ধরে তুলল; ফেলে দিল সাগরে।

লিমাকে বুকে তুলে নিয়ে কেবিনের দিকে হাঁটছে রানা, ওকে অনুসরণ করল ডয়েস আর হেগেন। বাঙ্কে শোয়ানো হলো লিমাকে। ডয়েস একটা বালিশ গুঁজে দিল মাথার পিছনে। রানা বলল, 'হেগেন, ফার্স্ট-এইড বক্স!'

কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হেগেন। হঠাৎ বালিশের এক দিকে কাত হয়ে গেল লিমার মাথা। পিছন থেকে রানার কাঁধ খামচে ধরল ডয়েস।

'এত উতলা হয়ো না তো!' ধমক দিল রানা। 'ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।' কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল ডয়েস, বাঙ্কের শেষ প্রান্তে এসে হাঁটু গেড়ে বসল, লিমার পা দুটোয় হাত বোলাচ্ছে।

সার্জিকাল কাঁচি দিয়ে লিমার সোয়েটার কেটে ফেলল রানা। শার্টটাও কাটতে হলো, অত্যন্ত সাবধানে। ধীরে ধীরে রক্ত ভেজা কাপড়ের আবরণ সরানো হলো। ক্ষতটা উন্মোচিত হতেই আঁতকে উঠল হেগেন। তুলো দিয়ে রক্ত মুছে ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। 'ও আসলে লাকি,' ঘাড় ফিরিয়ে ডয়েসকে বলল। 'ছুরিটা কলার-বোনে লেগে সরে গেছে অন্যদিকে।' ক্ষতটা লম্বা, বাম কাঁধ থেকে স্তন পর্যন্ত।

লিমার পা ছেড়ে রানার পাশে চলে এল ডয়েস। ক্ষতটা দেখে চোখ বন্ধ করল, দরদর করে ঘামছে।

'হেগেন, এঞ্জিন স্টার্ট দাও,' বলল রানা। 'আমি আসছি।' হেগেন ছুটল। ব্যস্ত হাতে ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বাঁধল রানা, লূপটা বগলের তলা দিয়ে ঘাড়ে পরাল। অনড় পড়ে আছে লিমা, একচুল নড়ছে না। 'নজর রাখো,' ডয়েসকে আদেশ দিয়েই কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

ডেকে পা দিয়েছে, বীস্টের এঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল। সাগরে প্রবল বাতাস, ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা দেখা যাচ্ছে। প্রবল আলোড়ন উঠেছে ঘন কুয়াশায়, প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হচ্ছে দৃষ্টিসীমা। তবে বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই।

হুইলহাউসে ঢুকে হেগেনকে সরিয়ে নিজের হাতে হুইল নিল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোথাও নোঙর ফেলতে হবে,' বলল ও। 'নাহলে রক্তক্ষরণে মারা যাবে মেয়েটা।'

'কি করতে চাও তুমি?'

থ্রটল খুলে ফুল স্পীড দিল রানা, ঝাঁকি খেয়ে ছুটল বীস্ট। 'সিকি মাইল দূরে একটা পাথুরে দ্বীপ আছে। নিরাপদ ইনলেট। ওখানে নোঙর ফেলে লিমার চিকিৎসা করতে হবে।'

দিক সামান্য বদলাতে দূরে দেখা গেল দ্বীপটা, হালকা কুয়াশা আর তুমুল বৃষ্টির ভেতর অস্পষ্ট। এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। ধীর গতিতে ভাসতে ভাসতে দ্বীপের গায়ে ঠেকল বোট। লাফিয়ে তীরে নামল হেগেন, বড় একটা বোল্ডারে লাইন জড়াল। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে নিচে নামল রানা।

গ্যালিতে এসে চুলোয় পানি গরম করতে দিল ও। তারপর লিমাকে দেখতে এল। ব্যান্ডেজটা এরই মধ্যে রক্তে ভিজে গেছে দেখে মুখ শুকিয়ে গেল ওর। তাড়াতাড়ি আবার ফিরে এল গ্যালিতে—বলা যায়, ডয়েসের সামনে থেকে পালিয়ে এল। এক সময় ফুটতে শুরু করল কেটলির পানি।

গরম পানি নিয়ে আবার কেবিনে ঢুকল রানা। হাত দুটো দু'বার ধুলো, একবার গরম পানি দিয়ে, আরেকবার ডিজইনফেক্ট্যান্ট দিয়ে। লিমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেগেন, পায়ের কাছে ডয়েস। 'কি করবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল ডয়েস।

'সেলাই,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। বাঙ্কের কিনারায় বসে ব্যান্ডেজ কাটতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চোখ মেলল লিমা, দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ডয়েস কোথায়?'

'তুমি ওকে চিনতে ভুল করেছ,' বলল রানা। 'ওটা একটা কাপুরুষ। কাঁদছে।'

মাথা নাড়ল লিমা। 'আপনিও ওর মত শুরু করলেন?' হাসতে চেষ্টা করল লিমা। 'আপনি খুব ভাল করেই জানেন ডয়েস কাপুরুষ নয়। ও আমার জন্যে কাঁদছে।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'কাঁদার কি প্রয়োজন আছে? কি হয়েছে আমার? সত্যি কথা বলুন। আমি বাঁচব না?'

লিমার হাতটা ধরে রেখা পরীক্ষা করার ভান করল রানা। 'এখানে দেখতে পাচ্ছি এক ডজন ছেলেপুলে হবে তোমাদের…' তারপর চোখ রাঙাল। 'একটুও নার্ভাস হবে না। সব আমার ওপর ছেড়ে দাও। ঠিক আছে?'

হেগেন বলল, 'খানিকটা দাগ অবশ্য থেকেই যাবে।' ডয়েসের দিকে তাকাল সে। 'এই ছোকরা, মন খারাপ করে না! জানোই তো, চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে।'

ডয়েস দু'হাতে মুখ ঢেকে বাঙ্কের গোড়ায় কপাল ঠেকিয়ে রেখেছে।

লিমা বলল, 'সেলাই করার সময় ওকে সরিয়ে দেবেন।'

হেগেন জানতে চাইল, 'এই গরিলারই বা কি কাজ এখানে?'

রানা বলল, 'হাত ধোও, তারপর আমার পাশে দাঁড়াও। আমি যখন সেলাই শুরু করব, তুমি রক্ত মুছবে।'

'ডয়েসকে ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়নি,' মনে করিয়ে দিল লিমা।

'হয়েছে,' বলল রানা। 'ডয়েস, যাও, তুমি পাশের কেবিনে গিয়ে শুয়ে থাকো।'

কিন্তু ডয়েস নড়ল না, কথাও বলল না।

ব্যান্ডেজ সবটুকু খুলে ক্ষতটা পরিষ্কার করল রানা। গ্লাস অ্যামপুল ভেঙে ডিসপজিবল সিরিঞ্জ বের করল। একটা ইঞ্জেকশন দিল রানা। ক্ষত থেকে দর দর করে রক্ত বেরুচ্ছে। 'মোছো।'

দ্রুত হাতে রক্ত মুছল হেগেন।

কপাল থেকে ঘাম মুছে কাজ শুরু করল রানা। সুই বিঁধতেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল লিমা। হাঁ করা ক্ষতটা জোড়া লাগাতে পনেরোটা সেলাই লাগল। কাজটা শেষ হতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল রানা। সেলাইয়ের ওপর আবার ব্যান্ডেজ বাঁধতে হলো।

'সত্যি সেরে উঠবে তো?' এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ডয়েস।

'অবশ্যই,' বলল রানা। 'তবে প্রচুর রক্ত গেছে, হাঁটাচলা করতে সময়

নেবে।' নিজের বিনকিউলার বের করল ও, বেরিয়ে এল ডেকে।

বীস্টের বো থেকে লাফ দিয়ে বোল্ডারে নামল রানা, ছড়িয়ে থাকা পাথরের মাঝখান দিয়ে বেশ উঁচু একটা জায়গায় চলে এল। সাগর আর উপকূল রেখার ওপর চোখ বোলাচ্ছে। ইতিমধ্যে কুয়াশা প্রায় পুরোটাই কেটে গেছে। জেমস হার্ডির জাহাজটাকে বহু দূর থেকে আসতে দেখল রানা। ম্যাট হিথের মোটর লঞ্চ যেখানে ডুবেছে, ধীর গতিতে ঠিক সেই পজিশনটার দিকে আসছে ওটা। রানার বিনকিউলারে রাশি রাশি আবর্জনা ধরা পড়ল, মোটর লঞ্চের অবশিষ্টাংশ। জাহাজের রেইলিঙে নাবিকরা দাঁড়িয়ে আছে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা, সবাই তারা তাকিয়ে আছে সাগরে ছড়ানো আবর্জনার দিকে। দিক না বদলে বা না থেমে চলে যাচ্ছে জাহাজ, থামবে একেবারে সেই ম্যাকাওয়ে পৌঁছে। দৃষ্টিসীমার মধ্যে যতক্ষণ থাকল ওটা, তাকিয়ে থাকল রানা। কিছুক্ষণ পর খুক করে কাশল কেউ। 'ওটা কি জেমস হার্ডির জাহাজ ছিল?' হেগেনের গলা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। বোল্ডার থেকে নামল ও। ওর পিছু নিল হেগেন।

'ফ্রেন্ড, একটা প্রশ্ন,' বলল সে।

'বলো।'

'আমরা কি ম্যাকাওয়ে ফিরে যাচ্ছি?'

'ম্যাকাওয়ে? হ্যাঁ। আমি আর তুমি। ম্যাকাওয়ে আরও কিছু কাজ আছে আমার।'

'আর ওরা?' জিজ্ঞেস করল হেগেন। 'লিমা আর ডয়েস?'

'ওদেরকে লিয়েনের গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে,' বলল রানা। 'ওখানে কয়েক দিন থাকলে সুস্থ হয়ে উঠবে লিমা, তারপর ডয়েসকে নিয়ে নিজের গ্রামে ফিরে যাবে।'

কিছুক্ষণ পর আবার মুখ খুলল হেগেন। 'আর সোনা?'

'ওগুলো লিয়েনদের গ্রামে নামিয়ে দেব আমরা,' বলল রানা। 'পুরোহিতদের ডেকে সব বুঝিয়ে দেবে লিমা।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেগেন। 'ভেরি গুড, ফ্রেন্ড। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'তোমার জন্যে একটা সুখবর আছে, হেগেন,' বলল রানা। 'ম্যাকাওয়ে রেড ড্রাগনের অনেকগুলো জাহাজ আর স্টীমার আছে। একটু হয়তো সময় লাগবে, তবে আশা করছি সবগুলোই গভর্নরকে দিয়ে দখল করাতে পারব। আমি সুপারিশ করব ওরা যেন অন্তত একটা জাহাজ পুরস্কার হিসেবে দেয় তোমাকে।'

'পুরস্কার?'

'রেড ড্রাগনকে খতম করার পিছনে তোমার অবদানও কম নয়, হেগেন,' বলল রানা। 'যতই তুমি মদ খাও!'

কিছুক্ষণ কল্পনায় দেখল হেগেন জাহাজটা। আবার ফিরে পেয়েছে সে নিজের জাহাজ! তারপর বিব্রত সুরে বলল, 'আমি কিন্তু টাকা বা পুরস্কারের লোভে তোমার সঙ্গে আসিনি, ফ্রেন্ড। মিসেস পাটনায়েক বললেন, তুমি একজন সৎ লোক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে চাও, সাহায্য দরকার, অমনি আমি রাজি

হয়ে গেলাম…'

'ধন্যবাদ, হেগেন।'

'আরেকটা প্রশ্ন, রানা।'

'বলো।'

'হয়তো অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে, তবু প্রশ্নটা না করে পারছি না। এই লোভ দমন করা কোথায় শিখলে বলো তো? ইচ্ছে করলেই সমস্ত সোনা আর পাথর মেরে দিতে পারো তুমি, আমি বা ডয়েস ঠেকাতে পারব না। অথচ…তুমি এমন কি লেদার ব্যাগ খুলে ভেতরে কি আছে তা-ও দেখোনি!'

হেসে উঠল রানা, জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। বোটে ফিরে নিচে নেমে এল, নামার আগে হেগেনকে হুইলের দায়িত্ব নিতে বলল।

ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে এসেছে লিমার। বাঙ্কের কিনারায় বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ডয়েস। ফিসফাস করে কথা বলছে ওরা। 'এখন কেমন লাগছে, লিমা?' জানতে চাইল রানা।

'মরফিন দেয়ার পর ব্যথাটা নেই,' বলল লিমা, ঠোঁটে দুর্বল হাসি।

'ইঞ্জেকশনটা ইচ্ছে করেই দিয়ে যাইনি,' বলল রানা। 'পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলাম, ডয়েস ব্যাপারটা লক্ষ করে কিনা। এখন বোঝা গেল, ও সত্যি তোমাকে ভালবাসে।'

'যতই নরম নরম কথা বলো আর পটাও,' বলল ডয়েস। 'সোনার কথা আমি ভুলছি না! বলে ফেলো দেখি, তোমার পরবর্তী মুভ কি হতে যাচ্ছে?'

এই সময় স্টার্ট নিল এঞ্জিন। ঢেউ ভেঙে রওনা হলো বীস্ট।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? নিশ্চয়ই ম্যাকাওয়ে? নাকি ব্যাংককে?'

'তুমি থামো তো!' ডয়েসকে ধমক দিয়ে চুপ করাল লিমা। 'রানা, জেমস হার্ডির জাহাজটা দেখেছেন?'

'খানিক আগে আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ওরা,' বলল রানা। 'মোটর লঞ্চের আবর্জনা দেখে ধরে নিয়েছে ওগুলো আমাদের ধ্বংসাবশেষ।'

'লিয়েনদের গ্রামে কি আপনি আমাদের সঙ্গে দিন কয়েক থাকবেন?' হঠাৎ জানতে চাইল লিমা।

মেয়েটার দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর মাথা নাড়ল। 'না। ম্যাকাওয়ে আমার জরুরী কাজ আছে।' একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানলে কিভাবে বোট নিয়ে আমরা লিয়েনদের গ্রামে যাচ্ছি?'

লিমার হাসি গোপন করার চেষ্টা সফল হলো না। 'ডয়েস বলেছে।'

'আমি বলেছি? কি আশ্চর্য! কই, না! তুমি ভুল করছ, লিমা! আমি বরং বলেছি, ওই লোককে তুমি চেনো না! তোমার সমস্ত সোনা ও একা হজম করার তালে আছে…'

'আমার কথা বাদ দাও,' বলল রানা। 'নিজেদের সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিলে তোমরা?'

'গ্রামে কিছুদিন থাকার পর ব্যাংককে চলে যাব,' বলল লিমা। 'রিঙে ওখানে যদি ভাল করে ডয়েস, কোন দিনই আর ম্যাকাওয়ে ফিরব না আমরা।'

'আসল কথাটা বলছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বিয়েটা কবে হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে?'

'ডয়েস তো বলছে লিয়েনদের গ্রামেই হওয়া উচিত, তা না হলে তোমাকে আমরা পাব না।'

হেসে উঠে রানা বলল, 'আইডিয়াটা মন্দ নয়। পরে হলে সত্যি হয়তো অ্যাটেন্ড করতে পারব না আমি।' এক মুহূর্ত চিন্তা করল ও। 'তবে ব্যাংককে থেকে যাবার সিদ্ধান্তটা আমার ভাল লাগল না, লিমা। ব্যাংকক বা ম্যাকাও নয়, ডয়েসের মত দুর্দান্ত বক্সার দাম পাবে নিউ ইয়র্ক বা লাস ভেগাসের মত শহরে। বাড়িয়ে বলছি না, যতটুকু বুঝেছি, ও আরও অনেক ভাল বক্সার হতে পারবে। শক্তিতে ওর তুলনায় আমি কিছুই না।'

'কিন্তু স্বভাবটা?' হাসি চেপে বলল লিমা। 'এরকম খোঁচা মারার স্বভাব যদি বদলাতে না পারে…'

'লাস ভেগাসে ওর এই স্বভাব বাড়তি আকর্ষণ হয়ে দেখা দেবে,' বলল রানা। 'ওখানে আমার পরিচিত লোকজন আছে। তোমরা যদি চাও, তাদেরকে বলে দেব আমি। পাসপোর্ট, ভিসা, সব তারাই ব্যবস্থা করে দেবে।'

লিমার চোখে পানি বেরিয়ে এল। 'চোখে কি যেন পড়েছে,' বলল সে। 'কিন্তু, রানা, আপনি কেন এত কষ্ট করতে যাবেন?'

'দু'চোখেই?' বলে তার একটা হাত ধরল রানা। 'কষ্ট করতে যাব, কারণ, আমার কোন ছোট বোন নেই। আরেকটা কথা, লিমা। তোমার সিদ্ধান্তে আমি খুশি। আচরণ দেখে যাই মনে হোক, ডয়েস সত্যিই ভাল ছেলে। ও তোমাকে সুখী করবে।'

'এ-সব কথার নিশ্চয়ই অন্য কোন অর্থ আছে,' বাঙ্ক থেকে নেমে সিধে হলো ডয়েস। 'লিমা রাগ করবে, তাই কিছু বলছি না।' কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

'আপনি সত্যি মনে করেন, আমরা সুখী হব?' জিজ্ঞেস করল লিমা। 'পাগলটাকে আমি সামলাতে পারব তো?'

'মরফিন তো বলে, অবশ্যই সুখী হবে,' জবাব দিল রানা। 'কেউ যদি তোমাকে ভালবাসে, তাকে সামলানো কোন ব্যাপার নাকি?'

'আপনার ঋণ আমরা…'

লিমার ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'একদম চুপ, বোকা মেয়ে!' পকেট থেকে রুমাল বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল ও।

***